আহলে বায়ত ও আসহাব এর প্রতি

ভক্তিতে মুক্তি

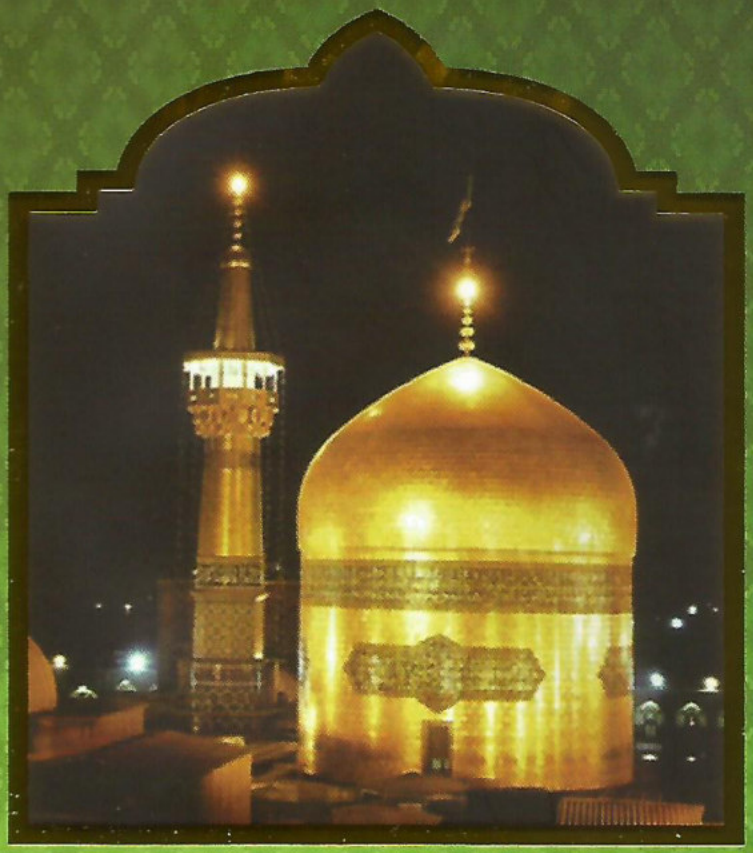

আল্লামা হুসাইন হিলমী ইশীক তুর্কী রহমাতুল্লাহি আলাইহি

আহলে বায়ত ও আসহাব-এর প্রতি
ভক্তিতে মুক্তি

মূল
আল্লামা হুসাইন হিলমী ইশিক (তুরস্ক)

অনুবাদ
কাজী সাইফুদ্দীন হোসেন

সম্পাদনায়
আবু আহমদ জামেউল আখতার চৌধুরী

সনৃজরী পাবলিকেশন
৪২/২ আজিমপুর ছোট দায়রা শরীফ, ঢাকা-১২০৫
৮১, শাহী জামে মসজিদ সুপার মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০

আহলে বায়ত ও আসহাব-এর প্রতি ভক্তিতে মুক্তি
মূল : আল্লামা হুসাইন হিলমী ইশিক (তুরস্ক)

ভাষান্তর
কাজী সাইফুদ্দীন হোসেন

সম্পাদনায়
আবু আহমদ জামেউল আখতার চৌধুরী

প্রকাশক :
মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী,

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
© সনজরী পাবলিকেশনের পক্ষে নূরে ফেরদৌস লিসা

প্রকাশকাল :
৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৭, ০৯ মহররম ১৪৩৯, ১৫ আশ্বিন ১৪২৪।

প্রকাশনায় :
সনজরী পাবলিকেশন
৪২/২ আজিমপুর ছোট দায়রা শরীফ, ঢাকা- ১২০৫, মোবাইল : ০১৮৪২-১৬০১১১
৮১, শাহী জামে মসজিদ মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম, মোবাইল : ০১৬১৩-১৬০১১১
E-mail : Sanjarypublication@gmail.com
FB Page : Sanjarypublication – সনজরী পাবলিকেশন

পরিবেশনায় : সনজরী বুক ডিপো

মূল্য : ২৫০ [দুইশত পঞ্চাশ] টাকা মাত্র

Ahal-i Bayat and the Ashaab; By: Allama Husayn Hilmi, Translate By: Kazi Saifuddin Hossain, Edited By: Abu Ahmad Jameul Akhtar Chowdhury. Published By: Mohammad Abu Tayub Chowdhury. Price: Tk: 250/- $ 10.00

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا
عَلٰى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ
مُحَمَّدٌ سَيِّدُ الْكَوْنَيْنِ وَالثَّقَلَيْنِ
وَالْفَرِيْقَيْنِ مِنْ عُرْبٍ وَّمِنْ عَجَمِ

﴿صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ﴾

উৎসর্গ

আমার পীর ও মুরশীদ সৈয়দ মওলানা এ.জেড.এম. সেহাবউদ্দীন খালেদ সাহেব কেবলা রহমতুল্লাহি আলাইহির পুণ্য স্মৃতিতে উৎসর্গিত।– অনুবাদক

প্রকাশকের কথা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোষণা– 'আমার উম্মত তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে।' এই তিয়াত্তরটির মধ্যে বাহাত্তরটি বাতিলপন্থী। একটিমাত্র দল নাজাতপন্থী– আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত। আর ভ্রান্ত দলগুলোর মধ্যে ইসলামের প্রায় শুরু থেকে যে দলটি ইসলামের ঘোর শত্রু হয়ে অন্যতম ভূমিকা পালন করছে, সেটি হচ্ছে শিয়া সম্প্রদায়। যারা জলিলুল কদর সাহাবীদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করে না।

বর্তমান বিশ্বে তাদের আকীদা ও কর্মকাণ্ড বিপুল হারে প্রচারনা-সম্প্রচার চলছে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে। পক্ষান্তরে ক্ষীন হচ্ছে আহলে বায়াত ও সাহাবা-ই কেরামের প্রতি ভক্তি ও সম্মান। আর তাদের অপতৎপরতার ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশেও এই সম্প্রদায়ের অনুসারী হচ্ছে ওই সব ব্যক্তিবর্গ যারা তাদের সম্পর্কে সঠিক ইতিহাস জানে না। তাই 'শিয়া' সম্প্রদায়ের আকীদা ও গোস্তাখী সরলমনা বাংলা ভাষাভাষী মুসলমান উম্মাহর সামনে তুলে ধরা এবং আহলে বায়াত ও সাহাবা-ই কেরামের সম্মান-মর্যাদা সম্পর্কে আলোচনা করা সময়ের দাবি হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'শিয়া'দের সঠিক ইতিহাস ও আকীদার গূঢ় নির্জাস তুলে ধরে বাংলা ভাষা-ভাষিদের জন্য এ কাজের আঞ্জাম দিয়েছেন বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক শ্রদ্ধেয় জনাব কাযী সাইফুদ্দীন হোসেন।

'আহলে বায়ত ও আসহাব-এর প্রতি ভক্তিতে মুক্তি' নামক গুরুত্বপূর্ণ এ পুস্তকটি রচনা ও সংকলন করায় তাঁর শুকরিয়া আদায় করছি। কোথাও ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে বিজ্ঞ পাঠক আমাদেরকে অবহিত করলে আগামী সংস্করণে সংশোধনে সচেষ্ট থাকব, ইনশাআল্লাহ।

মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী
সন্‌জরি পাবলিকেশন

সূচীপত্র

◆ মুখবন্ধ/ ০১

◆ হুরুফী শিয়াদের অপপ্রচার/ ০২

১. জামাল ও সিফফীনের যুদ্ধ কুরআনের ব্যাখ্যাগত ইজতেহাদী পার্থক্য/ ০৫

২. প্রথম দুই খলীফার প্রতি অপবাদ/ ০৭

৩. হযরত আবু বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক ফাদাক বাগান অধিগ্রহণ প্রসঙ্গ ও এর পক্ষে যুক্তি-প্রমাণ/ ১১

৪. হযরত উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক মা ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)-এর হাত ভাঙ্গার অপবাদ ও তার খণ্ডন/ ১৯

৫. হযরত উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর প্রতি স্বজনপ্রীতির অপবাদ ও তার খণ্ডন/ ২৪

৬. হযরত মা আয়েশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)-এর প্রতি অপবাদ ও তার রদ/ ৪৩

৭. হযরত আমীরে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ও তাঁর পূর্বপুরুষদের কুৎসা রটনা এবং তার রদ/ ৫৭

৮. হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু) প্রথম খলীফা বলে দাবি উত্থাপন ও তার রদ/ ৬৩

৯. হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর সাথে সাহাবাবৃন্দের বিরোধ ছিলো এজতেহাদী পার্থক্য হতে/ ৭৭

১০. বিরোধিতাকারী সাহাবাবৃন্দ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) ধর্মত্যাগী ছিলেন না/ ৮০

১১. খলীফা হারুনুর রশীদের দরবারে এক জারিয়্যা তরুণীসম্পর্কিত বানোয়াট কাহিনী/ ৮২

১২. আবদুল্লাহ ইবনে সাবা' ও তার অনুসারী শিয়াদের ষড়যন্ত্র/ ৮২

১৩. শিয়াদের ষড়যন্ত্রের ইতিহাস/ ৮৩

১৪. হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর শাহাদাতের পরে খেলাফতের যোগ্য ছিলেন আমীরে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)/ ৮৪

১৫. আমিরে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর অধীনস্থদের অযোগ্যতার অভিযোগ ও তার রদ/ ৮৬

১৬. হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত সাহাবাবৃন্দ কি কাফের?/ ৮৮

১৭. সাহাবাবৃন্দ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে লা'নত দেয়া যায় না/ ৯২

১৮. সুন্নী মুসলমান সমাজ আহলে বায়ত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-এর শত্রু নন/ ৯৩

১৯. জামাল ও সিফফীনের যুদ্ধ খলীফা উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর হত্যার বিচার চাওয়ার কারণেই/ ৯৫

২০. জামাল ও সিফফীনের যুদ্ধের পেছনে ইহুদী কালো হাত/ ৯৭

২১. আরেক শিয়া পত্রিকার ধোকাবাজি/ ৯৭

২২. হযরত আয়েশা (রাদ্বিঃ আনহা) নিজ এজতেহাদের জন্যে অনুতপ্ত হননি/ ৯৮

২৩. আসহাব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-বৃন্দ নিজেদের এজতেহাদের জন্যে অনুতপ্ত হননি/ ৯৮

২৪. আসহাব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-বৃন্দ ঈমানদার হিসেবেই বেসালপ্রাপ্ত হন/ ৯৯

২৫. আমিরে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) আল-কুরআনেই প্রশংসিত/ ১০১

২৬. হযরত আবূ সুফিয়ান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) নৈকট্যপ্রাপ্ত/ ১০২

২৭. সিফফীনের যুদ্ধে ষড়যন্ত্রের হোতা ইবনে সাবা' ও তার দল/ ১০৩

২৮. সর্ব-হযরত তালহা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ও যুবায়র (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এজতেহাদ প্রয়োগ করেননি/ ১০৪

২৯. হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে যাওয়া সাহাবাবৃন্দ মূলতঃ সন্ধি করতে চেয়েছিলেন/ ১০৪

৩০. মা আয়েশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)-এর সন্ধি উপলক্ষে বাইরে বেরোনো নিয়ে কূটতর্ক ও তার জবাব/ ১০৫

৩১. আমিরে মুআবিয়া (রাদ্বিঃ আনহু) বাগী/ বিদ্রোহী নন, বীর মোজাহিদ/ ১০৬

৩২. মুহাম্মদ বিন আবী বকরের ঘটনা নিয়ে ধোকাবাজি ও তার জবাব/ ১১৫

৩৩. হযরত আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর সন্তানদের কাল্পনিক হত্যাকাণ্ড ও আসল ইতিহাস/ ১১৮

৩৪. আমিরে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) লা'নত প্রথা চালু করেননি/ ১১৯

৩৫. আমিরে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ইমাম হাসান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর স্ত্রীকে তাঁর হত্যাকাণ্ডে প্ররোচিত করেননি/ ১২১

৩৬. আমিরে মুআবিয়া (রাদ্বিঃ আনহু) কারবালার ঘটনার জন্যে দায়ী নন/ ১২৬

৩৭. হযরত আমর ইবনে আস (রাদ্বিঃআনহু) মিসরীয় অর্থ আত্মসাৎ করেননি/ ১৩৯

৩৮. আমিরে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর উত্তরসূরী নির্বাচন খেলাফতের বৈধ প্রক্রিয়ায় হয়েছিলো/ ১৪৩

৩৯. ইমাম হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর প্রতি অত্যাচারের জন্যে আমিরে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) দায়ী নন/ ১৪৭

৪০. আমিরে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর শাসন ছিলো গৌরবোজ্জ্বল/ ১৫০

৪১. আসহাব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-বৃন্দের শ্রেষ্ঠ ও নিখুঁত হওয়ার প্রমাণ/ ১৫৫

৪২. আহলে সুন্নাতের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা ও মওদূদীর মতো গোমরাহদের খণ্ডন/ ১৬৬

৪৩. মিসরীয় মুহাম্মদ কুতুব, আবদুহু, রশীদ রেযা গংয়ের রদ/ ১৮২

মুখবন্ধ

মহান আল্লাহ তা'আলার প্রতি সমস্ত প্রশংসা। অতঃপর তাঁর প্রিয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি জানাই সালাত ও সালাম। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর খাঁটি, নির্মল আহলে বায়ত (পরিবার সদস্যবৃন্দ) এবং ন্যায়পরায়ণ ও বিশ্বস্ত আসহাবে কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-এর প্রতিও জানাই আমাদের সালাম।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন,

وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوا وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي.

–আমার উম্মত (মুসলমান সম্প্রদায়) তিয়াত্তর দলবিভক্ত হবে, যার বাহাত্তরটি-ই জাহান্নামে প্রবেশ করবে; শুধু একটি দল তাদের সঠিক আকীদা-বিশ্বাস পোষণের কারণে দোযখে প্রবেশ করবে না। অতঃপর তাঁকে জিজ্ঞেস করা করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারা কারা? তিনি বলেন, যারা আমি এবং আমার সাহাবীদের পথ ও মতের অনুসারী।[১]

ইমামে রব্বানী (মোজাদ্দেদে আলফে সানী) এরই পরিপ্রেক্ষিতে নিজ 'মকতুবাত' গ্রন্থে জানান, ওই বাহাত্তরটি ভ্রান্ত ফেরকাহ তথা দলের মধ্যে সবচেয়ে বদমায়েশ হচ্ছে তারাই, যারা আসহাবে কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-এর প্রতি কলঙ্ক লেপন করে থাকে। এই সব লোক হুযূর পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অধিকাংশ সাহাবা (রিদওয়ানুল্লাহি তা'আলা আলাইহিম আজমাঈন)-এর প্রতি অন্তরে বিদ্বেষভাব লালন করে এবং তাঁদের প্রতি কটাক্ষ বা কটূক্তি করে। এরা কারা, কখন ও কীভাবে তাদের আবির্ভাব ঘটলো, কী কী পন্থা তারা গ্রহণ করেছে, আর ইসলামের কী ক্ষতি তারা করেছে, আমাদের এই বইতে আমরা তা বিস্তারিত আলোকপাত করবো।

---

১. ক) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু মা জা'আ ফী ইফতিরাকি হাযিহিল উম্মাহ, ৯:২৩৫, হাদিস নং : ২৫৬৫।
খ) তাবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবুল ই'তিসাম বিল কিতাব ওয়াস্ সুন্নাহ, পৃ. ৩৭, হাদিস নং : ১৭১।
গ) হাকেম : মুসতাদ্‌রাক আলাস্ সহীহাইন, বাবু আম্মা হাদিসি আবদিল্লাহ ইবনে ওমর, ১:৪৩০, হাদিস নং : ৪০৮।

এই ধর্মদ্রোহী লোকেরা যারা এক দ্বীনী ভাইয়ের বিরুদ্ধে অপর দ্বীনী ভাইকে লেলিয়ে দিয়েছে এবং ইসলামের ইতিহাসে অনেক রক্তারক্তির উসকানিদাতা হয়ে সময়ে সময়ে পৈশাচিক বর্বরতার সূত্রপাত করেছে, তারা তৈমুর খান (লং) ও এয়াভুজ সুলতান সেলিম খানের মতো ইসলামী শাসকদের সময়োচিত হস্তক্ষেপে দমিত হয়েছিল; মুসলমান শাসকবৃন্দ তাদেরকে এমন শাস্তি দেন, যার দরুন তারা আর তাদের বৈরী কার্যক্রম এগিয়ে নেয়ার মতো শক্তি বজায় রাখতে পারেনি। তথাপিও প্রবাদ আছে, *'পানি স্থির হয়ে যেতে পারে, কিন্তু শত্রু ঘুমোয় না; অতএব, শত্রুর ওপর নজর রেখো।'*

বহু শতাব্দী যাবত আমাদের এই আশীর্বাদধন্য দেশ তুরস্কে আমরা শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ইবাদত-বন্দেগী পালন করে আসছি। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে উক্ত দলগুলোর লোকেরা ভিন্ন ভিন্ন নতুন নামে এখানে সেখানে আবারও আবির্ভূত হয়েছে, আর তারা বক্তব্য-বিবৃতি-ভাষণ দিচ্ছে এবং বইপত্রও লিখছে। তারা মানুষকে বিভ্রান্ত এবং চোরা-গোপ্তাভাবে গোটা তরুণ প্রজন্মের নিষ্কলুষ ঈমান হরণ করতে অপতৎপর। তাদের কর্মকাণ্ড একেবারেই বিচ্ছিন্নতাবাদী দর্শনের ওপর প্রতিষ্ঠিত। অথচ আমাদের ধর্ম আমাদেরকে আদেশ করে পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা পোষণ করতে এবং সব মানুষের প্রতিও দয়াশীল হতে।

হুরুফী শিয়াদের অপপ্রচার

আমাদের দ্বীনী ভাইয়েরা যে বইপত্র ও খবরের কাগজ আমাদের কাছে পাঠিয়েছিলেন, তার মধ্যে দুটি ছিল সবচেয়ে উদ্বেগজনক। এগুলোতে সন্নিবেশিত ছিল অশ্রাব্য কুৎসা রটনা ও মিথ্যাচার, যা হুরুফী নামের একটি গোষ্ঠী কর্তৃক ছড়ানো হয়েছিল; বস্তুতঃ এরা ইয়েমেন দেশের আবদুল্লাহ ইবনে সাবা' নামের এক ইহুদী হতে ধর্মান্তরিত ব্যক্তিরই অনুসারী। আমরা এসব লেখা পড়ে বিচলিত হই। মুসলমান সমাজ, বিশেষ করে আমাদের তরুণ ও অনভিজ্ঞ সন্তানেরা, এই হীন ও নিচু কুৎসা-অপবাদগুলো পড়লে তাদের নির্মল অন্তর কলুষিত এবং তাদের আকীদা-বিশ্বাস বিনষ্ট হতে পারে ভেবে আমরা অনেক বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করেছি। এমতাবস্থায় আমরা এই ক্ষতিকর লেখাগুলো প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেই, আর এর সাথে সাথে সবচেয়ে মূল্যবান ইসলামী বইপত্র থেকে শক্তিশালী ও নির্ভরযোগ্য দালিলিক প্রমাণসমূহ পেশ

করে ওগুলোকে খণ্ডন করার বিষয়টিও মনস্থ করি। এরই ফলশ্রুতিতে ৪৩ প্যারাগ্রাফের এই বইটি অস্তিত্ব পায়।

আমরা দৃঢ়ভাবে আশা করি, আমাদের এ বইটি পড়ে জ্ঞান-পিপাসু, বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ তরুণ প্রজন্ম তাদের বিবেকের পবিত্র উপদেশ গ্রহণ করবে এবং ওই সব বিচ্ছিন্নতাবাদীকে বিশ্বাস করবে না। আবদুল্লাহ ইবনে সাবা'র নাশকতামূলক ও ধ্বংসাত্মক ধ্যান-ধারণার ফাঁদে যে লোকেরা পড়েছিল, তাদের সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস পেয়েছিল। কিন্তু ফযলুল্লাহ নামের এক ইরানী গোমরাহ লোক ওই গোমরাহ মতবাদের সাথে আরও কিছু গোস্তাখিমূলক মতবাদ সন্নিবেশিত করে সেটিকে হুরুফী সম্প্রদায় নাম দিয়ে আবারও প্রচার আরম্ভ করে; আর এই বিচ্যুতির ধারাকে সমর্থন করে শাহ ইসমাঈল সাফাভী। সৌভাগ্যবশতঃ সুন্নী ও আলাভী শিয়া মুসলমান সম্প্রদায় এগুলোতে বিশ্বাস করেন না।

আল্লাহ পাক আমাদেরকে আহলে সুন্নাতের উলামা (রাহমতুল্লাহি তা'আলা আলাইহিম আজমাঈন)-বৃন্দের শেখানো সহীহ আকীদা-বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরার এবং ওই সকল মহান ব্যক্তিত্বের আলোকোজ্জ্বল পথের ওপর সুদৃঢ় থাকার তৌফিক দান করুন! তিনি আমাদের রক্ষা করুন সেসব গণ্ডমূর্খ লোকের মিথ্যে ও কুৎসা থেকে, যারা আমাদের পবিত্র ধর্মকে দুনিয়ার সুবিধা আদায়ের মাধ্যম হিসেবে কাজে লাগাতে চায়। তিনি আমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত হবার সৌভাগ্য নসীব করুন, আমাদের ধর্ম ও আইন-কানুন অনুযায়ী একযোগে কাজ করার তৌফিক দিন, যাতে আমাদের এই আশীর্বাদধন্য দেশে সবাই সুখ-শান্তি ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ পরিবেশে বসবাস করতে পারি, আমীন॥

আহলে বায়ত ও আসহাব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-এর প্রতি ভক্তিতে মুক্তি

আমরা একটি ম্যাগাজিন পত্রিকা ও একখানি বই পেয়েছি। পত্রিকাটি ১৯৬৭ সালের হেমন্তে প্রকাশিত হয়। এতে সন্নিবেশিত রয়েছে রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক নানা প্রবন্ধ। এগুলো আশ্চর্যের কিছু ছিল না, কেননা তাতে মুক্তচিন্তা প্রকাশ পেয়েছিল। কিন্তু এর কয়েকটি পৃষ্ঠায় খলীফা হযরত উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর সমসাময়িক ইয়েমেন দেশীয় এক ইহুদী হতে ধর্মান্তরিত ব্যক্তির আরোপিত মিথ্যে ও কুৎসা স্থান পেয়েছিল। এই সব কুৎসা আসহাবে কেরাম (রিদওয়ানুল্লাহি তা'আলা আলাইহিম আজমাঈন)-এর দিকে পরিচালিত ছিল। এই অসৎ উদ্দেশ্যপূর্ণ অভিযোগসমূহ, যা মুসলমানদের অন্তরে চালানো বিষমাখা ছোরার মতোই ছিল, তাতে স্রেফ চিন্তার খোরাকসম্পন্ন বিবৃতির চেয়ে মূলতঃ ধ্বংসাত্মক, ক্ষতিকর ও নিন্দাসূচক প্রচার-প্রপাগান্ডা-ই ছিল বেশি। এগুলো ছিল প্রকাশ্য অপরাধকর্ম, যা 'নেকড়ে বাঘ কর্তৃক ভেড়ার লোমের ছদ্মবেশ' ধারণের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এগুলোর উদ্দেশ্য ছিল তরুণ প্রজন্মকে বিভ্রান্ত করা, যারা এগুলো পড়ে সত্য বলে বিশ্বাস করবে এবং ফলশ্রুতিতে মুসলমান ভাইয়ে ভাইয়ে শত্রুতার সূত্রপাত ঘটবে। আমরা বুঝতে পারলাম আমাদের বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিতজনেরা কতোটুকু সঠিক ছিলেন আমাদেরকে এই বিষয়ের গুরুত্ব অনুধাবনের চেষ্টা করার বেলায়। আমরা জানতে পারি, আমাদের প্রিয় দেশবাসীকে জাগ্রত করার এবং মিথ্যে হতে সত্যকে পৃথক করার গুরুদায়িত্ব আমাদের কাঁধেই বহনের জন্যে রয়েছে অপেক্ষায়।

বইটির ব্যাপারে বলতে হয়, এটি সেরা মানের কাগজে ছাপা হয়েছিল, যার ওপর ছিল কাপড়ের বাঁধাই; আর এর শিরোনামটি ছিল সোনালী অক্ষরে ছাপা, বেশ কৌতূহলোদ্দীপকও। এটি ইস্তাম্বুলে ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত হয়। বইটি সম্পর্কে এর সূচিপত্রে কোনো তথ্যই ছিল না। তাই আমরা এর পৃষ্ঠাগুলো উল্টে দেখি। এটি ছিল একখানি 'এলম-এ-হাল পুস্তক (মানে ইসলাম ধর্মবিষয়ক বই যেটি ধর্মের আকীদা-বিশ্বাস, এবাদত-বন্দেগী ইত্যাদি শিক্ষা দেয়)। আর এতে কিছু সূক্ষ্ম বিষয়ও নিহিত ছিল। এ সব বিষয়ের কী সমাধান বইতে রয়েছে তা দেখার কৌতূহল জাগে আমাদের। আর অমনি অকস্মাৎ প্রকৃত বিষয়বস্তু আমাদের চোখে ধরা পড়ে যায়। এগুলো আবারও খলীফা উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর সমসাময়িক ইহুদী হতে ধর্মান্তরিত ব্যক্তির সেই পুরোনো অভিযোগসমূহ! আর এবার সেগুলোকে এমনভাবে ছদ্মবেশের আড়ালে

লুকোনো হয়েছে যে, কেউই তা শনাক্ত করতে পারবেন না। বস্তুতঃ অন্তর্ঘাতী আবরণেই সেগুলোকে সাজানো হয়েছিল। হে প্রভু! এ যে কী বীভৎস হত্যাকাণ্ডের নীল-নকশা! যেন বিষ-মাখানো মিষ্টির পরিবেশন। এর বিস্তৃত ছক আঁকা হয়েছে সর্বাত্মক শ্রম ব্যয় করেই। তবু বিষের যে 'ডোজ' দেয়া হয়েছে, তা মাত্রায় অনেক বেশি। আমাদের মনে হলো এগুলোর জবাব দেয়া জরুরি। বস্তুতঃ তা ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা বলেই বিবেচিত হয়েছে। কেননা, 'সাওয়াইক্ব আল-মোহরিক্বা' শিরোনামের কিতাবে লিপিবদ্ধ একটি হাদিস শরীফে রাসূলে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ ফরমান,

ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.

–যখন ফিতনা ও ফাসাদ (বিবাদ-বিসম্বাদ, গণ্ডগোল-হট্টগোল) সর্বত্র প্রসার লাভ করবে, আর মুসলমান সম্প্রদায়কে বিভ্রান্ত করা হবে, তখন যারা সত্য জানে তারা যেন তা সবার কাছে প্রকাশ করে দেয়। নতুবা আল্লাহ তা'আলা, ফেরেশতাকুল ও মানবজাতির লা'নত তথা অভিসম্পাত তাদের ওপর পতিত হবে।[১]

এমতাবস্থায় মহান আল্লাহ তা'আলার ওপর আস্থা রেখে আমরা হেমন্তের সেই ম্যাগাজিন পত্রিকা হতে ওর হুরুফী লেখকের পরিবেশিত মিথ্যের জবাব দেয়া আরম্ভ করছি।

[এক]

জামাল ও সিফফীনের যুদ্ধ কুরআনের ব্যাখ্যাগত ইজতেহাদী পার্থক্য

"মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যেমন (একদিকে) আবূ সুফিয়ানের মতো ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে এবং অপর দিকে মক্কার অধার্মিক কর্তা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন, ঠিক তেমনি হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাজুল করীম)-ও তাঁর সমসাময়িককালের অনুরূপ অধার্মিক লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

---

১. ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু মা ইয়াক্‌রাহু মিনাত্ তা'মিকি ওয়াত্..., ২২:২৭০, হাদিস নং : ৬৭৫৬।
খ) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু ফদ্বলিল মদিনাতি ওয়াদ্ দোয়ায়িন নবী, ৭:১০৭, হাদিস নং : ২৪৩৩।
গ) আবু দাউদ : আস্ সুনান, বাবু ফী তাহরীমিল মদীনা, ৫:৪১০, হাদিস নং : ১৭৩৯।
ঘ) তাবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবু হার্‌রামুল মদিনাতি হিরসুহা..., পৃ. ০২।
ঙ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবু মুসনাদি আলী ইবনে আবী তালেব, ২:৪৯২, হাদিস : ৯৮৬।

করেন। বস্তুতঃ তথাকথিত প্রাথমিক যুগ হতেই হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাজুল করীম)-এর প্রতি অবিশ্বাসীরা আক্রোশ ও শত্রুতাভাব পোষণ করে এসেছিল।" [হুরুফী লেখকের বক্তব্য]

ইসলামী জ্ঞান বিশারদমণ্ডলী হুরুফীদের এসব কুৎসার প্রতি মূল্যবান উত্তর লিপিবদ্ধ করে অসংখ্য বইপত্র প্রণয়ন করেছেন। এগুলোর মধ্যে একটি হলো ভারত উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেম শাহ ওলীউল্লাহ মোহাদ্দীসে দেহেলভী সাহেবের লিখিত 'এযালাতুল খাফা আন্ খিলাফাতিল খুলাফা' গ্রন্থ। পারসিক ও উর্দূ সংস্করণ মিলে এতে দুটি বই রয়েছে। পাকিস্তানে ১৩৮২ হিজরী মোতাবেক ১৯৬২ সালে এগুলো পুনর্মুদ্রিত হয়। আসহাবে কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-এর প্রত্যেকেই যে কতো উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন, তা এতে সাবলীল ও বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আমরা ওপরের বক্তব্যের জবাব দেবো শাহ আবদুল আযীয মোহাদ্দীসে দেহেলভী সাহেবের লেখা পারসিক 'তোহফা-এ-এসনা আশারিয়্যা' গ্রন্থটির উদ্ধৃতি দিয়ে। এই আলেম শাহ ওলীউল্লাহ মোহাদ্দীসে দেহেলভীর পুত্র। তিনি ১২৩৯ হিজরী মোতাবেক ১৮২৪ সালে দিল্লীতে ইন্তেকাল করেন। 'তোহফা' পুস্তকটি তুরস্কের ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠাগারে ৮২০২৪ কোড নম্বরে সংরক্ষিত আছে। এর উর্দূ সংস্করণ পাকিস্তান হতে প্রকাশিত হয়। শাহ আবদুল আযীয বলেন–

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)'র বর্ণিত এক হাদিসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাজুল করীম)কে বলেন,

> –আমি যেমন আল-কুরআনের নাযিল (অবতীর্ণ) হওয়ার বিষয় নিয়ে সংগ্রামরত, ঠিক তেমনি তোমাকেও এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ (তাফসীর) নিয়ে সংগ্রাম করতে হবে।

এই হাদিস শরীফ প্রমাণ করে যে সুন্নী মুসলমানবৃন্দ-ই সঠিক। কেননা, জঙ্গে জামাল (উটের যুদ্ধ) ও সিফফিনের যুদ্ধে যে কুরআন মাজীদের তাফসীর তথা ব্যাখ্যা নিয়ে (সাহাবীদের মধ্যে) ইজতেহাদী মতপার্থক্য দেখা দেবে, তার আগাম সংবাদ এই হাদিসে দেয়া হয়েছিল। শিয়াদের দ্বারা সুন্নীদেরকে রদ করার উদ্দেশ্যে এই হাদিস শরীফটির উদ্ধৃতি দেয়া তাদের চরম মূর্খতারই পরিচয় বহন করে। কারণ এই হাদিস শরীফটি প্রমাণ করে যাঁরা হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাজুল করীম)-এর বিরুদ্ধে (জামাল ও সিফফিনে) যুদ্ধ

করেছিলেন, তাঁরা কুরআনুল করীমের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে (ইজতেহাদী) ভুল করেছিলেন। আর এই বাস্তবতা শিয়া মতাবলম্বীরাও স্বীকার করেন যে আল-কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে ভুল এজতেহাদ (গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত) কুফরী তথা ইসলাম ধর্মে অবিশ্বাস নয়।[১]

[দুই]
প্রথম দুই খলীফার প্রতি অপবাদ

হুরুফী লেখক বলে, "তাদের একজন যখন নিজের বৃদ্ধ বয়সকে দেখিয়ে খেলাফতের পদের জন্যে প্রতিযোগিতা করছিলেন, ঠিক তখন-ই আরেকজন অন্যদেরকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করার জন্যে যুদ্ধরত ছিলেন।"

'বৃদ্ধ বয়স' ও 'খেলাফতের পদের জন্যে প্রতিযোগিতা' অভিব্যক্তিগুলো দ্বারা সে হযরত আবূ বকর সিদ্দিক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর দিকে ইশারা করেছে। হযরত আবূ বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) যে সমস্ত সাহাবা-এ-কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-এর সর্বসম্মতিতে খলীফা নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাজুল করীম) যে তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন 'আমি জানি আবূ বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) আমাদের মধ্যে সবার শ্রেষ্ঠ', এই জাজ্বল্যমান বাস্তবতা সকল উলেমা-এ-কেরামের বইপত্রে বিস্তারিত লিপিবদ্ধ আছে। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বহুবার হযরত আবূ বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)কে আমীর (আদেশদাতা) নিযুক্ত করেন। উহুদের জেহাদের পরে বিভিন্ন সূত্রে খবর আসে যে আবূ সুফিয়ান মদীনা মোনাওয়ারা আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত আবূ বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)কে পাল্টা আক্রমণের জন্যে পাঠান। হিজরী ৪র্থ বর্ষে সংঘটিত বনী নাদেরের জিহাদে তিনি হযরত আবূ বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)কে সেনাপতি নিযুক্ত করেন এবং তিনি স্বয়ং তাঁর নিজ ঘরে পুণ্যময় অবস্থান বহাল রেখে ঘরকে ধন্য করেন। হিজরী ৬ষ্ঠ বছরে হুযূর পূর নূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত আবূ বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)কে আমীর নিযুক্ত করে কুরা' গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্রেরণ করেন। তাবুকের জেহাদে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রথমে আদেশ দেন এই মর্মে যেন মুসলমান বাহিনী মদীনার বাইরে সমবেত হয়। তিনি হযরত আবূ বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)কে বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করেন। খায়বারের যুদ্ধে

---

১. তোহফা-এ-এসনা আশারিয়্যা।

মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শির মোবারকে ব্যথা ছিল। এমতাবস্থায় তিনি তাঁরই প্রতিনিধিত্ব করার জন্যে হযরত আবূ বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাতে সেনাপতি এবং দুর্গ জয়ের দায়িত্বভার অর্পণ করেন। ওই দিন হযরত আবূ বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করেন। হিজরী ৭ম বর্ষে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত আবূ বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর সেনাপতিত্বের অধীনে এক বাহিনীকে বনী কিলাব গোত্রের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধশেষে তিনি বহু অবিশ্বাসীকে হত্যা করেন এবং অনেককে বন্দী করেন। তাবুকের জিহাদ শেষে বিভিন্ন সূত্রে খবর আসে যে মদীনায় ঝটিকা আক্রমণের উদ্দেশ্যে কুফ্ফারবর্গ 'রামল' উপত্যকায় জড়ো হয়েছে। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইসলামী বাহিনীর ঝাণ্ডা হযরত আবূ বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাতে দেন এবং তাঁকে সেনাপতির দায়িত্ব দেন। হযরত আবূ বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) সফলভাবে দায়িত্ব পালন করেন এবং শত্রুবাহিনীকে পরাভূত করেন। বনী আমর গোত্রের ভিতরে বিদ্রোহের গোপন সংবাদ পাওয়ার পর সেই রাতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর পবিত্র উপস্থিতি দ্বারা ওই স্থানকে আশীর্বাদধন্য করেন। তিনি হযরত বেলাল হাবাশী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)কে বলেন,

فَقَالَ: مُرُوا أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ.

–আমার যদি নামাযে উপস্থিত হতে দেরি হয়, তাহলে আবূ বকরকে বলবে আমার সাহাবাদের জন্যে (জামাআতে) নামায পড়াতে।[১]

হিজরী ৯ম বছরে বিশ্বনবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর সাহাবা-এ-কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)কে হজ্জে পাঠান, আর তাঁদের জন্যে আমীর নিযুক্ত করেন হযরত আবূ বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)কে। আর এ বাস্তবতা কারোরই অজানা নয় যে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র বেসাল (পরলোকে আল্লাহর সাথে মিলনপ্রাপ্তি)'র আগ মুহূর্তে তিনি হযরত আবূ বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে তাঁর সাহাবা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-বৃন্দের জন্যে (নামাযের) ইমাম নিযুক্ত করেন, যে দায়িত্ব তিনি বৃহস্পতিবার রাত থেকে আরম্ভ করে সোমবার সকাল পর্যন্ত পালন করেছিলেন।

১. ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবুর রজুলি ইয়াতাম্মু বিল ঈমান, ৩:১৩৫।
খ) তাবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবু মা আলাল মা'মুমি মিনাল মুতাবিয়া, পৃ. ২৫২, হাদিস নং: ১১৪০।

রাসূলে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে সময়গুলোতে হযরত আবূ বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)কে আমীর নিযুক্ত করতেন না, তাঁকে অন্ততঃ তখন পরামর্শক অথবা সেনা অধিনায়কের দায়িত্ব দিতেন। তিনি হযরত আবূ বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)'র পরামর্শ ছাড়া কখনোই ধর্মীয় বিষয়াদি সম্পন্ন করতেন না। মোহাদ্দীস (হাদিস বিশারদ) হাকিম হযরত হুযায়ফা ইবনে এয়ামান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন; তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ ফরমান, "হযরত ঈসা (আলাইহিস্ সালাম) যেমন তাঁর হাওয়ারী (বার্তাবাহক)-বৃন্দকে দূর-দূরান্তে পাঠিয়েছিলেন, তেমনি আমিও আমার আসহাব (সাথীবৃন্দ)কে দূরবর্তী দেশগুলোতে পাঠাতে চাই, যাতে তারা সেখানে ইসলাম ও এর বিধি-বিধান শিক্ষা দিতে পারে।" আমরা যখন বললাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! এ কাজ সমাধা করার সামর্থ্যবান হযরত আবু বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ও হযরত উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর মতো সাহাবীবৃন্দ আছেন', তখন তিনি এরশাদ ফরমান, "আমি তাদের ছাড়া চলতে পারি না। তারা আমার দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তির মতোই।"

অপর এক হাদিসে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ ফরমান,

مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا لَهُ وَزِيرَانِ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ وَوَزِيرَانِ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَأَمَّا وَزِيرَايَ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ فَجِبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ وَأَمَّا وَزِيرَايَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ.

–আমার দুজন মন্ত্রী রয়েছে আসমানে এবং দুজন জমিনে। আসমানের মন্ত্রী হলো জিবরিল ও মিকাইল এবং জমিনের মন্ত্রী আবু বাকার ও ওমর।[১]

যদি ঘন ঘন আমীর নিযুক্ত না হওয়া ইমাম হবার শর্ত পূরণে অযোগ্যতার ইঙ্গিত বহন করে থাকে, তবে (এ মাপকাঠিতে) ইমাম হাসান এবং ইমাম হোসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-ও ইমাম হবার যোগ্য হতে পারতেন না। হযরত আলী (কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুল করীম) তাঁর খেলাফত আমলে

১. ক) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু ফী মানাক্বিবি আবি বকর ওয়া ওমর, ১২:১৩৯, হাদিস নং : ৩৬১৩।
খ) তাবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবু মানাক্বিবি কুরাইশ, পৃ. ৩২১, হাদিস নং : ৬০৫৬।

কখনোই তাঁদেরকে কোনো অভিযানে বা যুদ্ধে (আমীরের) দায়িত্ব দিয়ে পাঠান নি। পক্ষান্তরে, তিনি ঘন ঘন তাঁদের বৈমাত্রেয় ভাই মুহাম্মদ বিন হানাফিয়্যা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কেই আমীর নিযুক্ত করতেন। যখন ইবনে হানাফিয়্যা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে এর কারণ জিজ্ঞেস করা হয়, তখন তিনি বলেন, 'তাঁরা আমার পিতার নয়নের মতো, আর আমি তাঁর হাত ও পায়ের মতো।'

মুহাম্মদ বিন উকায়ল বিন আবি তালেব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন, একদিন আমার চাচা খলীফা হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহুল করীম) খুতবা পাঠকালে জিজ্ঞেস করেন,

> 'ওহে মুসলমান সম্প্রদায়! সাহাবা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-দের মধ্যে কে সবচেয়ে বেশি সাহসী (তা তোমরা জানো কি)?' আমি জবাবে বলি, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি-ই (সর্বাধিক সাহসী)। তিনি বলেন, 'না, হযরত আবূ বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-ই আমাদের মাঝে সবচেয়ে সাহসী। বদরের জ্বিহাদের সময় আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্যে ডালপালার একটি (অস্থায়ী) বিশ্রামকেন্দ্র নির্মাণ করেছিলাম। ওই কেন্দ্রের সামনে আমাদের মধ্য থেকে কে পাহারায় দাঁড়াবে এবং অবিশ্বাসীদের আক্রমণ প্রতিহত করবে, এ বিষয়ে আমরা একে অপরকে যখন প্রশ্ন করছিলাম, তখন হযরত আবূ বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এমন ক্ষিপ্রতার সাথে উঠে দাঁড়িয়ে সেখানে অবস্থান নেন যে আমাদের কেউই আর এর জন্যে উঠে দাঁড়াবার সুযোগ পাইনি। তিনি তরবারি বের করে তা ঘুরাতে থাকেন এবং ওই বিশ্রামকেন্দ্রের ওপর শত্রুদের কেন্দ্রীভূত সমস্ত আক্রমণ-ই ফিরিয়ে দেন। তাঁর সামনে যে-ই এসেছে নিহত হয়েছে, নতুবা হয়েছে আহত।'

অপর দিকে, 'আরেকজন অন্যদেরকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করার জন্যে যুদ্ধরত ছিলেন', ধর্ম সংস্কারকের এই বক্তব্য দ্বারা সে হযরত উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কেই ইঙ্গিত করেছে। কিন্তু হযরত আবূ বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর খলীফা নির্বাচনে হযরত উমর ফারুক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) প্রভাবশালী হলেও তিনি তা তরবারির জোরে নয়, বরং কার্যকর ভাষণ দ্বারা অর্জন করেন। ফলশ্রুতিতে তিনি মুসলমান সমাজকে মহা বিপদের কবল থেকে রক্ষা করেন। পরবর্তীকালে হযরত আবূ বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর অসিয়ত (উইল) ও

মুসলমানদের সর্বসম্মত সমর্থন দ্বারা তিনিও খলীফা নির্বাচিত হন, যদিও তিনি এ দায়িত্ব গ্রহণে অনিচ্ছুক ছিলেন।

[তিন]

হযরত আবূ বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক ফাদাক বাগান অধিগ্রহণ প্রসঙ্গ ও এর পক্ষে যুক্তি-প্রমাণ

হুরুফী লেখক বলে, "ওই দুজনের একজন ফাদাক নামের খেজুরের বাগান সংক্রান্ত বিষয়ে সর্ব-হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহুল করীম), ইমাম হাসান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু), ইমাম হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ও সালমান ফারিসী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর বক্তব্যের শুনানি গ্রহণের পর আহলে বায়তের প্রদত্ত সমস্ত সাক্ষ্য সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করে হযরত ফাতেমাতুয্ যাহরা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)-এর কাছ থেকে বাগানটি অধিগ্রহণ করেন।"

ওপরের এই মন্তব্য হযরত আবূ বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে আক্রমণের উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে। সূর্যকে কি কাদা দিয়ে ঢেকে দেয়া সম্ভব? হুরুফীদের এই কুৎসাপূর্ণ মিথ্যাচার ও অপবাদ *'তোহফা-এ-এসনা আশারিয়্যা'* গ্রন্থে কী সুন্দরভাবে খণ্ডন করা হয়েছে, তা দেখুন–

> 'কোনো নবী (আলাইহিস্ সালাম) যখন বেসালপ্রাপ্ত তথা আল্লাহর সাথে পরলোকে মিলিত হন, তখন তিনি যে সম্পত্তি রেখে যান তার কোনো উত্তরাধিকারী স্বত্ব আর কেউই পান না। এই সত্যটি শিয়া বইপত্রেও লিপিবদ্ধ আছে। তাই উত্তরাধিকারের অযোগ্য কোনো সম্পত্তির বেলায় ওসিয়ত (উইল) করা একেবারেই অযৌক্তিক হতো। এরই আলোকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত মা ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)-কে খেজুর বাগানটি 'উইল' স্বরূপ দান করে গিয়েছিলেন বলা মারাত্মক ভুল হবে। কেননা, তিনি ভুল কোনো কাজ করতে পারেন না।'

একটি হাদিস শরীফে তিনি এরশাদ ফরমান, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ.

–আমরা (আম্বিয়াবৃন্দ) যা (উত্তরাধিকারস্বরূপ) রেখে যাই, তা দান-সদকাহ হিসেবে পরিণত হয়।[১]

এই হাদিস শরীফের পরিপ্রেক্ষিতে ওসিয়ত সংক্রান্ত তথাকথিত ওই অভিযোগটি সত্য হতে পারে না। যদি এ রকম কোনো 'উইল' হয়ে থাকতো এবং হযরত আবূ বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) তা না জানতেন, তাহলে তাঁকে এর জন্যে দায়ী করা যেতো না, যদি না সাক্ষ্যে তাঁকে দায়ী সাব্যস্ত করা সম্ভব হতো। আর যদি এ রকম কোনো ওসিয়ত হয়ে থাকতো এবং হযরত আলী (ক:) সে সম্পর্কে জানতেন, তাহলে তাঁর পক্ষেও তাঁরই খেলাফত আমলে তা পূরণ করা জরুরি ও অনুমতিপ্রাপ্ত হতো। কিন্তু তিনি তাঁর খেলাফত আমলে হযরত আবূ বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর নীতিরই অনুসরণ করেন এবং ওই সম্পত্তির রাজস্ব গরিব-দুঃস্থ ও বিপদ-আপদগ্রস্ত মানুষের মাঝে বিতরণ করেন। কেউ যদি বলে যে তিনি কেবল তাঁর অংশই বিতরণ করেছিলেন, তাহলে এর উত্তর হচ্ছে সর্ব-ইমাম হাসান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ও হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর যে উত্তরাধিকার তাঁরা তাঁদের পুণ্যবতী মায়ের সম্পত্তি থেকে পাওয়ার কথা, তা হতে হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহুল করীম) কেন তাঁদেরকে বঞ্চিত করলেন? শিয়ারা এই প্রশ্নের জবাব চারভাবে দিয়ে থাকে:

(১) শিয়ারা বলে, "আহলে বায়ত তথা মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পরিবারের সদস্যবৃন্দ তাঁদের কাছ থেকে কেড়ে নেয়া কোনো সম্পত্তি ফেরত নেন না। বস্তুতঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন মক্কা বিজয় করেন, তখন তিনি তাঁর কাছ থেকে ইতিপূর্বে মক্কাবাসীদের দ্বারা জবরদখলকৃত সম্পত্তি ফেরত নেননি।"

শিয়াদের এই জবাব নড়বড়ে। কেননা, হযরত উমর ফারুক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর খেলাফত আমলে খলীফা ওই ফাদাক খেজুর বাগানটি (আহলে বায়তের সদস্য) হযরত ইমাম মুহাম্মদ বাক্কের (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাছে হস্তান্তর করেন এবং তিনি তা গ্রহণও করেন। অতঃপর সেটি ইমাম পরিবারের কাছেই ছিল; আব্বাসীয় খেলাফত আমলেই তা আবারও রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণপ্রাপ্ত হয়। এরপর হিজরী ২০৩ সালে খলীফা মা'মূন তাঁর (প্রাদেশিক) কর্মকর্তা

[১]. ক) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু হুকমিল ফাই, ৯:২০৪, হাদিস নং : ৩৩০২
খ) তাবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবু ফাদ্বায়িলি সায়্যিদিল মুরসালীন, পৃ. ৩০০।
গ) বায়হাকী : সুনানুল কুবরা, ৬:২৯৮।

কুসাম বিন জা'ফরকে রাষ্ট্রীয় আজ্ঞাসম্বলিত একখানি পত্র মারফত ওই খেজুর বাগানটি ইমামদের উত্তরাধিকারী ইমাম আলী রেযা (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)কে হস্তান্তরের ব্যবস্থা করেন। একই বছর হযরত ইমামের বেসালের পরে ইমাম হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর পৌত্র ইমাম যায়দ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর পৌত্র ইমাম ইয়াহইয়া (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর কাছে তা হস্তান্তরিত হয়। এই হযরত যায়দ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর নামের খাতিরে তাঁকে অপর এক আহলে বায়ত-সদস্য ইমাম হাসান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর পুত্র হযরত যায়দ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু), যিনি সাইয়্যেদাহ নাফিসা (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর পিতামহ ছিলেন, তাঁর সাথে মেলানো যাবে না। খলীফা মা'মুনের পৌত্র মোতাওয়াক্কিল আবারও খেজুর বাগানটি অধিগ্রহণ করেন তার শাসনামলে। পরবর্তী সময়ে খলীফা মো'তাদেদ তা পুনরায় ফিরিয়ে দেন। অধিগ্রহণ হওয়া সম্পত্তি যদি আহলে বায়ত ফেরত না নিয়ে থাকেন, তাহলে এর সদস্য এই ইমামবৃন্দ কেন তা ফেরত নেন? শিয়ারা ধারণা করে যে হযরত আবূ বকর সিদ্দিক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) খেলাফত জবরদখল করেছিলেন, যা ছিল হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহুল করীম)-এর হক্ক। তাহলে একই সূত্রবলে হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহুল করীম) কেন তাঁর হক্ক বা অধিকার হিসেবে খেলাফতকে ফেরত নিলেন? অধিকন্তু, ইমাম হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) কেন ইয়াযীদের কাছ থেকে তার কেড়ে নেয়া খেলাফতের অধিকার ঐকান্তিকভাবে ফেরত নেয়ার চেষ্টা করেছিলেন, যার পরিণতিতে তাঁকে শাহাদাত পর্যন্ত বরণ করতে হয়েছিল?

(২) শিয়ারা বলে, "হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহুল করীম) হযরত মা ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)-কে অনুকরণ করে ফাদাক খেজুরের বাগান হতে কোনো অংশ নেননি।"

শিয়াদের এই জবাবটি আরও বেশি দুর্বল। তাহলে কেন (আহলে বায়তের) ইমামবৃন্দ যাঁরা পরবর্তীকালে ফাদাক হতে (রাজস্বের) অংশ নিয়েছিলেন, তাঁরা মা ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)-কে অনুসরণ করেননি। তাঁকে অনুকরণ যদি ফরয হতো, তবে তাঁরা কেন এই ফরযকে তরক তথা অবজ্ঞা করলেন? আর যদি তা ফরয না হয়ে নফল হয়ে থাকে, তাহলে হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহুল করীম) কেন ফরয তরকের বিনিময়ে একটি নফল এবাদত পালন করলেন? কেননা, প্রত্যেককে তার পাওনা পরিশোধ করা ফরয। অধিকন্তু,

কারো ঐচ্ছিক আচরণ অনুকরণ করা হয়তো যৌক্তিক হতে পারে। কিন্তু এই আচরণ যদি হয় কোনো ভয়ভীতি প্রদর্শনের ফলশ্রুতিতে সৃষ্ট, তবে তা অনুকরণ করা উচিত নয়। হযরত মা ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক ফাদাক বাগানের সদ্ব্যবহার না করা যদি কারো নিপীড়নের কারণে হয়ে থাকতো, তাহলে তাঁকে নিজ অধিকার ছেড়ে দিতে হতো; কেননা তাঁর আর কোনো উপায়-ই ছিল না। এ ক্ষেত্রে তাঁকে অনুকরণ করা অর্থহীন হতো।

(৩) শিয়ারা বলে, "ফাদাক বাগানটি যে মা ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)-এর কাছে (উত্তরাধিকারস্বরূপ) বণ্টন করা হয়েছিল, এই ঘটনার সাক্ষী ছিলেন হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহুল করীম)। এই সাক্ষ্য যে আল্লাহর ওয়াস্তে এবং দুনিয়াবী স্বার্থে নয়, তা দেখাতেই তিনি ফাদাক বাগান হতে কোনো স্বার্থ আদায় করেননি।"

শিয়াদের এই যুক্তিও দুর্বল। কারণ যাঁরা হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহুল করীম)-এর এই সাক্ষ্য সম্পর্কে জানতেন এবং তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, তাঁরা তাঁর খলীফা হবার সময় ইতোমধ্যেই বেসালপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। উপরন্তু, (আহলে বায়তের) কয়েকজন ইমামের দ্বারা ফাদাকের (রাজস্ব) গ্রহণের দৃষ্টান্ত থাকায় খারেজী দলটি এই দৃষ্টিভঙ্গি নেয় যে হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহুল করীম) হয়তো এই সাক্ষ্য দেন যাতে তাঁর বংশধরবৃন্দ এ থেকে বৈষয়িক সুবিধা পেতে পারেন। বস্তুতঃ জমি-সম্পত্তি, বাড়ি-ঘর, ফলের বাগান ইত্যাদির ক্ষেত্রে মানুষেরা নিজেদের চেয়ে আপন সন্তান-সন্ততির কথাই চিন্তা করেন আগে। হয়তো হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহুল করীম) তাঁর সন্তানদেরকে ফাদাকের অংশ না নেয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকতে পারেন, যাতে তাঁর সাক্ষ্য নাকচ না হয়ে যায়। আর তাঁর সন্তানদের দ্বারা হযরত মা ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)-এর অনুকরণ ও এই গোপন উপদেশ পালনের উদ্দেশ্যেই হয়তো ফাদাকের অংশ নেয়ার বেলায় অস্বীকৃতি ব্যক্ত হয়েছিল। এটি-ই এই বিষয়ে উলেমাবৃন্দের মতামত।

(৪) শিয়ারা বলে, "ফাদাক বাগানটি হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহুল করীম) কর্তৃক গ্রহণ না করার উদ্দেশ্য ছিল তাকিয়্যা। তাকিয়্যা মান্য করা শিয়াদের জন্যে জরুরি।" [তাকিয়্যা হলো পছন্দ নয় এমন কারো সাথে নিজ মনোভাব গোপন রেখে সদ্ভাব বজায় রাখা]

শিয়াদের এই বক্তব্যও সমর্থিত নয়। কেননা, তাদের মতে, "কোনো ইমাম যখন যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন এবং তাতে রত হন, তখন তাঁর পক্ষে তাকিয়্যা মেনে চলা হারাম। এই কারণেই ইমাম হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) তাকিয়্যা গ্রহণ করেননি।" এমতাবস্থায় হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহুল করীম) তাঁর খেলাফত আমলে তাকিয়্যা গ্রহণ করেছিলেন বলার মানে হলো তিনি হারাম সংঘটন করেছিলেন। (নাউযুবিল্লাহ)

জনৈক শিয়া পণ্ডিত ইবনে মোতাহ্‌হের হুল্লী নিজ 'মিনহাজুল কারামা' শিরোনামের পুস্তকে লেখেন, "হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) যখন খলীফা হযরত আবূ বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে জানান যে ফাদাক বাগানটি তাঁর কাছে উত্তরাধিকারস্বরূপ দান করা হয়েছে, তখন খলীফা সাক্ষী চেয়ে পত্র লেখেন। কোনো সাক্ষী হাজির না করায় তিনি আরজি খারিজ করে দেন।" এই ঘটনা যদি সত্য হয়, তাহলে উত্তরাধিকার, উপহার (হেবা) বা দানের অন্য যে কোনো দৃষ্টান্তের মতোই ফাদাক বাগানের বিষয়টি হতে হযরত আবূ বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) দায়মুক্ত হবেন। অতএব, তাঁকে এ ক্ষেত্রে দোষারোপ করার কোনো কারণ-ই আর নেই। এই পর্যায়ে দুইটি প্রশ্নের উদ্ভব হয়:

(ক) হযরত মা ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক উত্থাপিত উত্তরাধিকার, দান ও অসিয়ত (উইল)-এর আরজিটিকে খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দিক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) যথাযথ হিসেবে পাননি; কিন্তু তিনি কেন তাঁকে খুশি বা সন্তুষ্ট করার জন্যে ওই বাগানটি দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন না? উভয় পক্ষের ছাড় দ্বারা এই সমস্যাটির একটি সমাধান বা নিষ্পত্তি তাতে হয়ে যেতো, আর এতো গুজবও ছড়াতো না।

আসলে এই বিষয়টি খলীফা হযরত আবূ বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর জন্যে গভীর ভাবনা ও ভারি বেদনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আর তিনিও মূলতঃ ওপরে উদ্ধৃত উপায়ে বিষয়টির সমাধান করতে চাননি। তিনি যদি মা ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)-এর আশীর্বাদধন্য অন্তরকে খুশি করার সিদ্ধান্ত নিতেন, তবে দ্বীন ইসলামের মধ্যে দুইটি মারাত্মক জখম হানা হতো। মানুষেরা খলীফা সম্পর্কে গুজব রটাতো, "তিনি ধর্মীয় বিষয়েও পক্ষপাতিত্ব করেন; ন্যায়বিচারের পরিবর্তে স্বজনপ্রীতির চর্চা করেন। খারিজ হয়ে যাওয়া আরজির বেলায়ও তিনি তাঁর বন্ধুবান্ধবের ইচ্ছাকে পূরণ করেন। অথচ শ্রমিক ও কৃষকের কোনো মামলা জেতার ক্ষেত্রে তিনি দলিল-দস্তাবেজ ও সাক্ষী পেশের বোঝা চাপিয়ে থাকেন।"

এ ধরনের গুজব ছড়িয়ে পড়লে পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত ফিতনা-ফাসাদ জিইয়ে থাকতো। অধিকন্তু, কাজী তথা বিচারকবৃন্দও খলীফার উদাহরণ অনুসরণ করে স্বজনপ্রীতি ও পক্ষপাতিত্ব বজায় রাখতেন। দ্বিতীয় জখমটি সম্পর্কে বলতে হয়, খলীফা হযরত আবূ বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হযরত মা ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)-কে ফাদাক বাগানটি দান করলে তা হতো হাদিসের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন, যা'তে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছিলেন, আম্বিয়া (আলাইহিমুস্ সালাম)-দের রেখে যাওয়া সম্পত্তি তাঁদের উত্তরাধিকারী বংশধরবৃন্দ পান না, বরং তা দান-সদকাহ হয়ে যায়। মা ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)-কে তিনি ওই বাগানের মালিকানা ফিরিয়ে দিলে হুযূর পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে মালিকানা স্বত্ব নাকচ করেছিলেন, সেই আদেশের খেলাফ হতো। তিনি এ কাজ করেননি, কেননা তিনি জানতেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরও এরশাদ করেছিলেন,

مَثَلُ الَّذِي يَسْتَرِدُّ مَا وَهَبَ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ فَيَأْكُلُ قَيْئَهُ.

–যে ব্যক্তি (পূর্বে) দানকৃত কোনো বস্তু ফেরত নেয়, সে নিজ বমি ভক্ষণকারী কুকুরের মতোই।[১]

খলীফা এ রকম একটি জঘন্য কাজ ইচ্ছাকৃতভাবে করতে পারেন না। ইসলাম ধর্মে এই দুটি জখম হওয়া ছাড়াও বেশ কিছু দুনিয়াবী বা পার্থিব সমস্যা দেখা দিতো। হযরত আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এবং হুযূর পূর নূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পবিত্র স্ত্রীবৃন্দও তাঁদের নিজ নিজ অধিকার হিসেবে অনুরূপ ফলের বাগান বা ভূ-সম্পত্তি দাবি করে বসতেন। এ সকল সমস্যা অন্যান্য জটিল সমস্যার জন্ম দিতো এবং ফলশ্রুতিতে হযরত আবু বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর পক্ষে তা সমাধান করা কঠিন হতো। এমতাবস্থায় তিনি এ সব জটিল সমস্যার ঝুঁকি না নিয়ে হযরত মা ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)-কে খুশি না করতে পারার দুঃখ বেছে নেন। একটি হাদিস শরীফে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ ফরমান,

"কোনো মু'মিন ব্যক্তি যখন উভয় সংকটে পড়েন, তখন তিনি যেন সেই বিকল্পটি গ্রহণ করেন যেটি কম অপছন্দনীয়।"

---

১. ক) আবু দাউদ : আস্ সুনান, বাবুর রুজুয়ি ফিল হেবা, ৯:৪২২, হাদিস নং : ৩০৭৩।
খ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবু মুসনাদি আবদিল্লাহ ইবনে আমর, ১৩:৩৭৮, হাদিস নং : ৬৩৪০।
গ) বায়হাকী : সুনানুল কুবরা, ৬:১৮১।

খলীফা হযরত আবূ বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) তা-ই করেছিলেন। আর এই সমস্যার প্রতিকারও তিনি করেছিলেন। কিন্তু অপর বিকল্পটি গ্রহণ করলে নিরাময়ের অযোগ্য জখম সৃষ্টি হতো। ধর্মীয় বিষয়াবলী জটিল হয়ে পড়তো।

(খ) দ্বিতীয় প্রশ্নটি হলো, সুন্নী ও শিয়া উভয়ের বইপত্রে লেখা হয়েছে খলীফা হযরত আবূ বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ও হযরত মা ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)'র মধ্যকার মতপার্থক্য নিষ্পত্তি করা হয়েছিল। তাহলে মা ফাতেমাতুয্ যাহরা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) কেন চাননি হযরত আবূ বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর জানাযায় শরীক হন? আর কেনই বা তিনি তাঁর শেষ অসিয়তে (উইলে) চেয়েছিলেন হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহুল করীম) তাঁকে রাতের অন্ধকারে দাফন করেন?

আমাদের জবাব নিম্নরূপ: হযরত মা ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)-এর রাতে দাফন হবার ইচ্ছাটি তাঁরই অত্যধিক হায়া (শরম) থেকে নিঃসৃত হয়েছিল। বস্তুতঃ জীবন সায়াহ্নে তিনি বলেছিলেন, "আমি লজ্জা পাই এ কথা ভেবে যে আমার বেসালের পরে মানুষেরা আমাকে পর্দা ছাড়াই অনেক পুরুষ মানুষের সামনে নিয়ে যাবে।" সেই যুগে ইন্তেকালপ্রাপ্ত মহিলাদের মরদেহে শুধু একটি কাফনের কাপড় জড়ানোর প্রথা ছিল; ওই অবস্থায় পর্দা ব্যতিরেকেই মরদেহ কফিন থেকে বের করা হতো। হযরত আসমা বিনতে উমাইর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণনা করেন, "একদিন আমি হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)-কে বললাম যে আবিসিনিয়ায় আমি দেখেছি মানুষেরা খেজুর গাছের ডালগুলো পরস্পর বিজড়িত করে থাকে, যেমনটি তাঁবু বুননের ক্ষেত্রে করা হয়। তিনি বললেন, 'তুমি তা আমায় করে দেখাও।' আমি যখন তা করলাম, তখন তিনি এটি খুব পছন্দ করলেন এবং স্মিত হাসলেনও। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বেসালের পরে তিনি একেবারেই হাসতেন না। অতঃপর তিনি আমাকে অসিয়ত করেন, 'আমি বেসাল হবার পর তুমি আমায় গোসল দেবে। আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহুল করীম)-কেও উপস্থিত থাকতে দেবে। আর কাউকেই প্রবেশাধিকার দেবে না'।" এই কারণেই হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহুল করীম) হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)-এর জানাযায় কাউকে আসতে বলেননি। এক বর্ণনা অনুসারে জানা যায়, হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহুল করীম), হযরত আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ও আহলে বায়তের আরও কয়েকজন সদস্য জানাযার নামায শেষে তাঁকে রাতে দাফন করেন।

অন্যান্য বর্ণনা অনুযায়ী, পরের দিন হযরত আবূ বকর সিদ্দিক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু), হযরত উমর ফারূক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এবং অন্যান্য অনেক সাহাবী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) অন্তরের শুভাকাঙ্ক্ষা জানাতে হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহুল করীম)-এর গৃহে আসেন। যখন তাঁরা জানতে পারেন যে মা ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) ইতোমধ্যেই বেসালপ্রাপ্তা হয়েছেন এবং তাঁকে দাফনও করা হয়েছে, তখন তাঁরা আফসোস করে বলেন, 'আপনি আমাদের খবর দিলেন না কেন যাতে আমরা জানাযায় এসে শরীক হতে পারতাম এবং শেষকৃত্যে অংশ নিতে পারতাম?' হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহুল করীম) দুঃখ প্রকাশ করেন এবং বলেন যে তিনি তাঁর স্ত্রীর অসিয়ত মেনে তাঁকে রাতে দাফন করেছেন, যাতে অন্যান্য পুরুষেরা তাঁকে দেখতে না পান। *'ফাসলুল হিতাব'* পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে, সর্ব-হযরত আবূ বকর সিদ্দিক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু), উসমান যিন্‌-নুরাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু), আবদুর রহমান বিন আউফ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ও যুবাইর বিন আউয়াম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এশা'র নামাযের জন্যে মসজিদে অবস্থান করছিলেন। এমন সময় তাঁরা শুনতে পান হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) মাগরিব ও এশা' ওয়াক্তের মধ্যবর্তী কোনো এক সময়ে বেসালপ্রাপ্তা হয়েছেন। সেটি ছিল পবিত্র রমযান মাসের ২য় দিবস এবং পরের দিন ছিল মঙ্গলবার। বেসালের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ২৪ বছর; এই ঘটনার মাত্র ৬ মাস আগে তাঁর পিতা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বেসালপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহুল করীম)-এর অনুরোধে খলীফা হযরত আবূ বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) চার তাকবীরের সাথে হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)-এর জানাযার নামাযে ইমামতি করেন।

খলীফা হযরত আবূ বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক দাফন অনুষ্ঠানে উপস্থিত না হওয়ার কারণ ওপরে ব্যাখ্যা করা হলো। খলীফা ও মা ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর মাঝে মতপার্থক্য থাকলে হযরত আবূ বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) নামাযে জানাযায় ইমামতি করতেন না। সুন্নী বইপত্রের পাশাপাশি শিয়া পুস্তকাদিতেও একটি বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে, যাতে জানা যায়, ইমাম হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) মদীনায় আমীরে মুয়াবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)'র প্রাদেশিক শাসনকর্তা হযরত সাঈদ বিন আস্‌ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে ডেকে ইমাম হাসান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর নামাযে জানাযা পড়াতে বলেন এবং তাঁকে আরও বলেন, 'আমীর কর্তৃক নামাযে জানাযা পড়ানো যদি আমার নানা (রাসূলুল্লাহ)'র

সুন্নাত না হতো, তবে আমি আপনাকে তাতে ইমামতি করতে দিতাম না।' অতএব, এ থেকে বোঝা যায়, হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) তাঁর শেষ উইলে এমন কোনো শর্তারোপ করেননি যে খলীফা হযরত আবূ বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর নামাযে জানাযায় ইমামতি করতে পারবেন না। যদি তিনি তা করতেন, তাহলে ইমাম হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর মায়ের উইলের পরিপন্থী কোনো কাজ করতে পারতেন না। এ কথা নিশ্চিত যে ইমামতির ক্ষেত্রে হযরত সাঈদ ইবনে আস্‌ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) খলীফা হযরত আবূ বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)'র চেয়ে হাজার হাজার গুণ কম যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন। মাত্র ছয় মাস আগে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বেসালের সময় হযরত আবূ বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)কে তিনি সমস্ত মোহাজির ও আনসার সাহাবী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-দের সামনে জামা'আতে নামায পড়াবার দায়িত্বে নিযুক্ত করেছিলেন। এই ছয় মাসের সামান্য সময়ে মা ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)-এর তা ভুলে যাবার কথা নয়।

[৪]

হযরত উমর (রা) কর্তৃক মা ফাতেমা (রা)'র হাত ভাঙ্গার অপবাদ ও তার খণ্ডন

হুরুফী লেখক বলে: "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রিয় এই সন্তানের পাঁজর ও বাহু ওদের (ওই দুজনের) একজন ভেঙ্গে দেন। শুধু তাই নয়, আমাদের মা ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) তার কালো মুখ দেখতে অস্বীকার করেছিলেন এবং তার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করতে চেয়েছিলেন বলে তিনি তাঁকে আঘাত করে বলেন, 'আমি তোমার ঘরে আগুন দিয়ে ধ্বংস করে দেবো, যদি তুমি আনুগত্য স্বীকার না করো।' আত্মরক্ষায় অসমর্থ ওই সন্তানসম্ভবা মাকে দরজা ও দেয়ালের মাঝখানে চেপে ধরে তিনি গর্ভের নিরপরাধ ও মা'সূম শিশুটি, যার নাম ইতোমধ্যেই মোহসিন রাখা হয়েছিল, তাকে মেরে ফেলেন।"

ইমাম হাসান কুরতুবী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) এই সকল মিথ্যা অপবাদ *'নাজমুল কুলূব'* ও *'কোমরু'* নামের দুটি পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে বলে জানান। এগুলো দিশখ হাসান আফেন্দী নামের এক লোকের দ্বারা লেখা হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। এ সব কুৎসার মাধ্যমে সে আমীরুল মো'মিনীন খলীফা হযরত উমর ফারূক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর প্রতি মহব্বত ও শ্রদ্ধা পোষণকারীদের অন্তরে প্রচণ্ড আঘাত হানতে চেয়েছে। এই সেই খলীফা উমর

(রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু), যাঁকে মুসলমান সর্বসাধারণ ভীষণ ভালোবাসেন, বিভিন্ন আয়াতে করীমায় যাঁর ভূয়সী প্রশংসা বিদ্যমান, অনেক হাদিস শরীফে যাঁকে বেহেশ্‌তী হবার খোশ-খবরী দেয়া হয়েছে এবং বিশ্বের ইতিহাসের বিশাল এক অধ্যায় জুড়ে যাঁর ন্যায়পরায়ণতা, সম্মান ও খ্যাতি বিরাজমান। হুরুফী লেখক যেহেতু এমন এক লোকের হাওয়ালা দিয়েছে যার অবস্থান সুন্নী বা শিয়া উলামাদের মধ্যে নয়, আর যেহেতু সে যে দুটি বইয়ের নাম উল্লেখ করেছে সেগুলোর অস্তিত্ব শুধুমাত্র তারই তথ্যভাণ্ডারে রয়েছে, সেহেতু আমরা আমাদের কলমকে ওই দুটি বইয়ের দ্বারা কলঙ্কিত করবো না। এই সব নোংরা মিথ্যাচার সম্পর্কে 'তোহফা' পুস্তকটি কী বলে তা আমরা এখন শুনবো:

হুরুফীদের এই মিথ্যাচার কেবল আহলুস্ সুন্নাহ দ্বারাই তৎক্ষণাৎ প্রত্যাখ্যাত হয়নি, শিয়া মতাবলম্বীরাও তা প্রত্যাখ্যান করেছে, যারা স্বীকার করে যে কতিপয় নিচু জাতের হীন প্রকৃতির হায়া-শরমহীন গোমরাহ-পথভ্রষ্ট লোক এ সব কুৎসা রটনা করেছে। তবে শিয়ারা নিজেদের বিচ্যুত ধর্মমত বহাল রাখতে বলে, "তিনি (হযরত উমর) ঘরটি জ্বালিয়ে দেয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন কিন্তু তা করার চেষ্টা করেননি।" অথচ, ইচ্ছা একটি অনুভূতি যা অন্তরেরই ক্রিয়া বটে। আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কেউই এ সম্পর্কে জানতে পারেন না। যদি এই গোমরাহ লোকেরা ওই কথা বলে বোঝাতে চায় যে 'তিনি (হযরত উমর) তাদেরকে সতর্ক করতে ঘরটি জ্বালিয়ে দেবেন বলেছিলেন', তাহলে বলবো, হ্যাঁ, তিনি কিছু লোককে সতর্ক করতে ওই কথা বলেন। এ লোকেরা হযরত মা ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)'র ঘরের চারপাশে জড়ো হয়ে বলছিল, 'আমাদের ক্ষতি কেউই করতে পারবে না, যতোক্ষণ আমরা এখানে আছি।' তাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল খেলাফত নির্বাচনকে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টির মাধ্যমে বানচাল করা। তাদের শোরগোল ও চিৎকার-চেঁচামেচিতে হযরত মা ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)-ও তিক্ত-বিরক্ত ছিলেন। তবু তাঁর অত্যধিক লাজ-শরমের কারণে তিনি কঠোরভাবে তাদেরকে চলে যেতে বলতে পারেননি। এমনি এক সময়ে হযরত উমর ফারূক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ওই এলাকা অতিক্রম করছিলেন। তিনি এই লোকদেরকে দেখেই চিনতে পারেন এবং বুঝতে পারেন সেখানে কী ঘটছে। তাদেরকে সরিয়ে দেয়ার জন্যে তিনি সতর্ক করে বলেন, 'আমি তোমাদের ওপর ঘরটি টেনে নামাবো।' এ ধরনের ধমক তদানীন্তন আরবে প্রচলিত ছিল। বস্তুতঃ যারা জামা'আতে নামায আদায় করতো না, তাদেরকে সতর্ক করার জন্যে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ ফরমান,

مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللهِ وَرَسُولِهِ.

–যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত নামায ত্যাগ করে, তার থেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র জিম্মাদারী মুক্ত হয়ে যায়।[১]

জামাআতে নামায পড়ানোর জন্যে আমাদের হুযূর পূর নূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক হযরত আবূ বকর সিদ্দিক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ইমাম নিযুক্ত হন। কিছু লোক তাঁকে অনুসরণ না করার কথা চিন্তা করে জামা'আতে শরীক হয়নি। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদেরকে এভাবে সতর্ক করেন। অতএব, হযরত উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর ওই কথা সূক্ষ্ম অভিব্যক্তি ছিল। অধিকন্তু, মক্কা বিজয়ের দিনটিতে ইবনে হাতাল নামের এক অবিশ্বাসী মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে কটাক্ষ করে কবিতার ছত্র আবৃত্তি করছিল। শাস্তি থেকে বাঁচতে সে কা'বা শরীফের ভেতরে আশ্রয় নেয় এবং ওর (কাপড়ের) ছাউনির নিচে লুকিয়ে থাকে। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আদেশ দেন, "ইতস্তত করো না, তাকে ওখানেই এক্ষুনি হত্যা করো!" আল্লাহর ধর্মের বিরোধিতাকারী শত্রুরা আল্লাহর ঘরেই যদি আশ্রয় পেতে না পারে, তাহলে হযরত মা ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)-এর ঘরের দেয়ালের পেছনে তারা কীভাবে আশ্রয় পেতে পারে? তারা ওখানে আশ্রয় নিলে মা ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)'র পক্ষে কীভাবে চিন্তিত না হয়ে থাকা সম্ভব ছিল? কেননা, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এই নির্মল আত্মার কন্যা যে নিজেকে আল্লাহরই (আদিষ্ট) আখলাক তথা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছিলেন। উপরন্তু, নির্ভরযোগ্য (বিশুদ্ধ) বর্ণনায় জানা যায়, তিনিও ওই লোকদেরকে স্থানত্যাগ করার জন্যে বলেছিলেন।

খলীফা হযরত উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর শাহাদাতের পরে হযরত আলী (কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুল করীম) যখন খলীফা নির্বাচিত হন, তখন কিছু লোক ফিতনা সৃষ্টির দুরভিসন্ধি নিয়ে মক্কা মোয়াযযমা থেকে মদীনা মোনাওয়ারায় গমন করে। ঈমানদারদের মা হযরত আয়েশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)-এর ঘরে আশ্রয় নিয়ে তারা হযরত উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা দাবি করতে থাকে এবং বলে যে তারা যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত। কিন্তু তাদের মাঝে কোনো সাহাবী-ই ছিলেন না। এই ব্যাপারে হযরত

---

১. আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবু হাদিসি উম্মে আইমন, ৫৫:৩৬৯, হাদিস নং : ২৬০৯৮।

আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহুল করীম)-কে যখন খবর দেয়া হলো, তৎক্ষণাৎ তিনি সৈন্য পাঠিয়ে এই লোকদেরকে হত্যা করেন। তিনি ওই সময় এ কথা বিবেচনা করেননি যে তাঁর এই কাজটি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পুতঃপবিত্র বিবির প্রতি গোস্তাখি বা বে-আদবিমূলক হবে। এ ধরনের কাজ ধর্মের প্রতি অসম্মানজনক আচরণের মাপকাঠি বলে বিবেচিত হলে হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহুল করীম) কর্তৃক হুযূর পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পুণ্যবতী স্ত্রী হযরত আয়েশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)-এর ঘরে সৈন্য প্রেরণের তুলনায় হযরত উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)'র উচ্চারিত ওই কথা তো একেবারেই নগণ্য বলে সাব্যস্ত হয়। হ্যাঁ, হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহুল করীম)-এর কাজটি যথাযথ ছিল। যে ফিতনা মুসলমানদেরকে ভবিষ্যতে গ্রাস করতে পারে, তা আগেভাগে দমনকালে তাঁর পক্ষে এ ধরনের তাৎপর্যহীন সূক্ষ্ম বিষয়ের দিকে নজর দেয়ার ব্যাপারটি আশাও করা যায় না। যদি তিনি ফিতনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট না করার পরিবর্তে ওই সূক্ষ্ম বিষয়ের দিকে নজর দিতেন, তবে সকল ধর্মীয় ও বৈষয়িক বিষয় এলোমেলো হয়ে যেতো। সম্মান শুধু মা ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)-এর ঘরকেই নয়, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পবিত্র স্ত্রীর ঘরকেও দেখাতে হবে। হযরত উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) যা করেছেন, তা শুধু কিছু নিবৃত্ত করার উক্তির মধ্যেই সীমিত ছিল। তিনি কোনো ব্যবস্থা-ই গ্রহণ করেননি। পক্ষান্তরে, হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহুল করীম) চরম ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। যেহেতু হযরত উমর ফারূক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর মন্তব্য হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহুল করীম)-এর নেয়া ব্যবস্থার চেয়ে কম গুরুতর ছিল, সেহেতু তাঁকে তাঁর ওই মন্তব্যের জন্যে বিষোদগার করা স্রেফ গোঁড়ামি ও একগুঁয়েমি ছাড়া আর কিছু নয়। আহলে সুন্নাতের উলেমাবৃন্দ বলেন, হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহুল করীম) খলীফা ছিলেন এবং তাই মানুষের ভবিষ্যৎ সংকটাপন্ন বিধায় তিনি হযরত আয়েশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)-এর প্রতি প্রাপ্য সম্মান দেখাননি। তাঁরা খলীফা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর সমালোচনাকে যুক্তিযুক্ত মনে করেন না। তবে অপর দিকে, হুরুফী শিয়াদের প্রচারিত মিথ্যা অনুযায়ী, যেহেতু হযরত আবূ বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর খেলাফত হক্ক বা সঠিক ছিল না, সেহেতু মা ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)'র ঘরের প্রতি অসম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে তাঁর খেলাফতের পক্ষ নেয়া মহাপাপ ছিল। হুরুফীদের এই ধারণাটি প্রকৃতপক্ষে তাদের চরম অজ্ঞতা ও আহাম্মকিরই বহিঃপ্রকাশ। কেননা,

আহলে সুন্নাতের দৃষ্টিতে উভয় খেলাফত-ই হক্ক তথা সঠিক ছিল। অধিকন্তু, হযরত উমর ফারূক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) জানতেন হযরত আবূ বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর খেলাফত সঠিক ছিল এবং কেউই এর বিরোধী ছিলেন না। ইসলাম ধর্মের জন্যে এই সময় ছিল প্রাথমিক যুগ এবং ধর্মের এই বৃক্ষটি তখন সবেমাত্র পুষ্পপল্লবে বেড়ে উঠছিল। ফিতনা সৃষ্টির মাধ্যমে এই সত্য ও সঠিক খেলাফত ব্যবস্থার ক্ষতিসাধনে যারা-ই অপতৎপর হতে চাইছিল, তাদেরকেই হত্যা করা বিহিত ছিল। অথচ হযরত উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) কেবল মৌখিকভাবে সতর্ক করার মাধ্যমে তাদেরকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা-ই করেছিলেন মাত্র। তাহলে কেন তাঁকে এর জন্যে দোষারোপ করা হবে? মর্মাহত হবার মতো আরেকটি সত্য হচ্ছে কতিপয় শিয়া পণ্ডিতের অভিযোগ এই মর্মে যে, হযরত উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক সতর্ককৃত তরুণদের মাঝে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ফুপাতো ভাই যুবায়র ইবনে আউয়ামও ছিল। এই সব লোক কি চিন্তা করতে অক্ষম? যুবায়র ইবনে আউয়াম, যে ব্যক্তি পরবর্তী সময়ে হযরত উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর শাহাদাতের ঘটনায় নিজ বন্ধুদের সাথে নিয়ে ওই হত্যাকাণ্ডের বিচার দাবি উত্থাপনকালে কঠোর কথাবার্তা বলার কারণে (হযরত আলী কর্তৃক) নিহত হয়, সে কীভাবে (পূর্ববর্তী মা ফাতেমার ঘরের ঘটনায়) বিদ্রোহীদের একজন হবার দোষ থেকে রেহাই পেতে পারে? মা ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)-এর ঘরে তার ফিতনা সৃষ্টির অপপ্রয়াসকে (শিয়াদের দ্বারা) সহ্য করা হলেও হযরত আয়েশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)-এর উপস্থিতিতে যুবায়র কর্তৃক খলীফা উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)'র হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে অভিযোগ করা এবং খলীফা হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহুল করীম) ও সাহাবা-এ-কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর বিচার চাওয়া কেন গুরুতর অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করা হয়? এ সকল অসঙ্গতি শিয়াদের ভ্রান্ত ধারণারই ফলশ্রুতি।

জামা'আতে নামায আদায় প্রত্যেকের নিজস্ব সুবিধা বা লাভের উদ্দেশ্যেই হয়ে থাকে। কেউ তাতে যোগ না দিলে কোনো মুসলমানের ক্ষতি সাধন করা হবে না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নামাযের জামা'আতে শরীক না হওয়া মুসলমানদের গৃহ তাদের ওপর টেনে নামানোর মৌখিক সতর্কবাণী ব্যক্ত করেছেন। এমতাবস্থায় মুসলমানদের মাঝে সংক্রমণ হতে পারে এবং ইসলাম ধর্মের পূর্ণ বিনাশ সাধন করতে পারে এমন ফিতনা সৃষ্টিকারীদের গৃহ তাদের মাথার ওপর টেনে নামানোর মৌখিক সতর্কবাণী ব্যক্ত

করার অনুমতি কেন হযরত উমর ফারূক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর থাকবে না? আমাদের আকা ও মাওলা হযরত রাসূলে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মা ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)-এর ঘরকে ততোক্ষণ পর্যন্ত তাঁর উপস্থিতি দ্বারা আশীর্বাদধন্য করেননি, যতোক্ষণ না জীবিত প্রাণীর ছবিসম্বলিত পর্দাগুলো সেখান থেকে সরানো হয়েছিল। বস্তুতঃ তিনি কা'বা-এ-মোয়াযযমায় প্রবেশের ক্ষেত্রেও অনুরূপ আচরণ করেছিলেন, যতোক্ষণ না হযরত ইব্রাহীম (আলাইহিস্ সালাম) ও হযরত ইসমাঈল (আলাইহিস্ সালাম)-এর বলে কথিত মূর্তি সেখান থেকে সরানো হয়েছিল। তাহলে মা ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)-এর পবিত্র ও বরকতময় গৃহের পাশে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের নিবৃত্ত করার জন্যে 'তাদের ওপর ঘরটি টেনে নামানোর' ভয় দেখিয়ে মৌখিকভাবে সতর্ক করার জন্যে হযরত উমর ফারূক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে কেন দোষারোপ করা হবে? যদি বলা হয় যে এই হুমকি না দিয়ে তাঁর উচিত ছিল নম্র আচরণ করা, তাহলে জবাবে বলতে হবে যে বড় ধরনের সমস্যা বা সংকটের মুহূর্তে সে ধরনের আচরণ সম্ভব নয়। উদাহরণস্বরূপ, হযরত মা আয়েশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)-এর গৃহের পাশে ফিতনার সময় হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহুল করীম) তাঁর প্রতি যথাযোগ্য আচরণ প্রদর্শন করতে পারেননি। অতএব, পরিদৃষ্ট হচ্ছে যে এমন কি শিয়া মতাবলম্বীরাও নির্দোষ হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহুল করীম)-এর আচরণের অনুরূপ হযরত উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর আচরণকে বিষোদগার করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করে না।

[৫]

হযরত উসমান (রাঃ)-এর প্রতি স্বজনপ্রীতির অপবাদ ও তার খণ্ডন

হুরুফী লেখক বলে, "নিপীড়নকারীরা তাদের নিষ্ঠুরতা বজায় রাখে। এদের আরেকজন নিজের নীচ ও ফাঁকা বুলিসর্বস্ব সৎভাই উকবা বিন ওয়ালীদের কাছে প্রাদেশিক শাসনভার অর্পণ করেন। এই ওয়ালীদ-ই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মুখে থুথু নিক্ষেপ করেছিল। অপর দিকে, মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে সকল লোককে দূরে রেখেছিলেন, তাদেরকে তিনি খেলাফতের উঁচু উঁচু পদে অধিষ্ঠিত করেন। তিনি হযরত হাসান-এ-মোজতবা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর কফিনের দিকে অন্যদেরকে সাথে নিয়ে তীর নিক্ষেপের মাধ্যমে এ সবের প্রতিশোধ নেন।"

এবার সে খলীফা হযরত উসমান যিন্-নুরাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর প্রতি বিষোদগার করেছে। তবে সৌভাগ্যবশতঃ সে যে দড়ি আহলুস্ সুন্নাহর গলায় পেঁচাতে চেয়েছে, সেটি-ই তার পায়ে পেঁচিয়ে গিয়ে তাকে ঝুলিয়ে দিয়েছে। ইসলামের তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) নিজ সৎভাই ও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মুখমণ্ডলে কথিত থুথু নিক্ষেপকারী উকবা ইবনে ওয়ালীদকে প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিয়োগ করেছিলেন মর্মে মিথ্যে অভিযোগ এনে হুরুফী লেখক নিজের অজ্ঞতা-ই প্রকাশ করেছে। প্রকৃতপক্ষে, নূরনবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পবিত্র মুখমণ্ডলে নিজের নোংরা থুথু নিক্ষেপ করেছিল আবূ লাহাবের পুত্র উতায়বা। হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহুল করীম)'র চাচা আবূ লাহাব ছিল মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর চিরশত্রু। যখন 'তাব্বাত এয়াদা' সূরাটি অবতীর্ণ হয় এ কথা জানাতে যে এই লোকটি ও তার স্ত্রী উম্মে জামিল, যে নারী মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ঘরের দরজায় বিস্তর কাঁটা দিতো, উভয়-ই জাহান্নামে যাবে, তখন আবূ লাহাব আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। সে তার দুই পুত্র উতবা ও উতায়বাকে ডেকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দুই মেয়েকে তালাক দিতে আদেশ করে। এই দুই বদমায়েশ ছিল মুশরিক এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জামাতা হবার উচ্চ মর্যাদা থেকে ছিল বঞ্চিত। উতায়বা শুধু নবী-নন্দিনী উম্মে কুলসুম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)-কে তালাক দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, উপরন্তু সে হুযূর পূর নূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সামনে হাজির হয়ে তাঁকে বলে, "আমি আপনাকে বিশ্বাস করি না, পছন্দও করি না। আর আপনিও আমাকে পছন্দ করেন না। অতএব, আমি আপনার কন্যাকে তালাক দিচ্ছি।" এ কথা বলে সে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পবিত্র জামার 'কলার' ধরে টান দেয় এবং এতে জামা ছিঁড়ে যায়। অতঃপর সে তার ঘৃণ্য থুথু নিক্ষেপ করে চলে যায়। রাসূলে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তখন আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করেন, "ইয়া রাব্বী! আপনার কোনো বন্য জন্তু এই লোকের ওপর ছেড়ে দিন।" মহান রাব্বুল আলামীন তাঁর রাসূল-এর দোয়া কবুল করে নেন। ওই বদমায়েশ লোক দামেস্ক অভিমুখে রওয়ানা হলে 'যারক্বা' নামের এক স্থানে তার কাফেলা দলটি রাত্রি যাপনের জন্যে তাঁবু ফেলে। সবাই যখন ঘুমে অচেতন, তখন এক সিংহ তার গন্ধ শুঁকে পুরো কাফেলার মধ্যে শুধু তাকেই থাবা দিয়ে ধরে এবং টুকরো টুকরো করে ফেলে। এই হীন প্রকৃতির দুই ভাই

বিয়ের অনুষ্ঠানপর্বের আগেই ওই সুন্দরী দুই বোনকে তালাক দিয়েছিল। তাদের অসৎ উদ্দেশ্য ছিল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে আর্থিক চাপে ফেলা। এমতাবস্থায় হযরত উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এই রকম খোশ-নসীবীর সুযোগ গ্রহণ করেন এবং কুমারী হযরত রুকাইয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)কে বিয়ে করে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জামাতা হবার সৌভাগ্য অর্জন করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সুদর্শন যুবক। সোনালী চুল ও ফর্সা গায়ের রং ছিল তাঁর। আবূ লাহাবের জারজ সন্তানদের চেয়ে তিনি অনেক ধনী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে অপর যে ব্যক্তি চরম কষ্ট দিয়েছিল, তার নাম উকবা ইবনে আবি মু'য়াইত। একবার হুযূর পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মসজিদে হারাম শরীফে নামায আদায়কালে এই শয়তান পশুর নাড়িভুঁড়ি তাঁর পবিত্র শিরে ছুঁড়ে মারে। আরেকবার সে তাঁর পবিত্র কণ্ঠ তাঁরই জামার 'কলার' পেঁচিয়ে চেপে ধরে। ওই সময় হযরত আবূ বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি এ অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র সহায়তায় এগিয়ে আসেন এবং ওই বদমায়েশকে ভর্ৎসনা করে বলেন, "তুমি কি এমন একজনকে হত্যা করছো, যিনি বলেন, 'আল্লাহ আমার রব্ব'?" মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ওখানে উপস্থিত অবিশ্বাসীদের নাম উল্লেখ করে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করেন, "ইয়া রাব্বী! আপনি এ সকল লোককে আযাবের একটি গর্তে নিক্ষেপ করুন।" হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন, "বদরের জিহাদে আমি দেখেছি (কুফ্ফার) যারা মারা গিয়েছিল, তাদেরকে একটি গর্তে ছুঁড়ে ফেলা হয়। শুধু উকবা ইবনে আবি মু'য়াইত-ই বদরের জিহাদ থেকে ফেরার পথে নিহত হয়।" অতএব, পরিদৃষ্ট হচ্ছে যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি জুলুমকারী অবিশ্বাসী উতায়বা ও উকবা খেলাফত আমল দেখার মতো সময়কাল বাঁচেনি। তারা জাহান্নামে গমন করেছিল। খলীফা উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) তাদেরকে খেলাফতের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত করেছিলেন বলা মূলতঃ নিজ অজ্ঞতারই বহিঃপ্রকাশ ছাড়া কিছু নয়।

হ্যাঁ, হযরত আমীরে মোয়াবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) নিজের ভাই উতবা'র ছেলেকে মদীনা মোনাওয়ারার প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। কিন্তু তাঁর নাম ছিল ওয়ালীদ ইবনে উতবা। তিনি ৫৭ হিজরী সালে ওই পদে নিয়োগ পাওয়ার পর ইমাম হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ও অন্যান্য সাহাবী (রাদ্বিয়াল্লাহু

আনহু)-দের প্রতি পরম শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। বস্তুতঃ ইয়াযীদ খলীফার পদ জবরদখল করার পর মদীনাবাসীকে তার বশ্যতা স্বীকারে ব্যর্থতার দায়ে এবং ইমাম হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে মুক্ত করে দেয়ার অভিযোগে ওয়ালীদকে পদচ্যুত করে।

ওই হেমন্তকালীন ম্যাগাজিনে প্রকাশিত লেখনী যে খলীফা হযরত উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর প্রতি কুৎসা রটনাকারী, সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। কেননা, খলীফা তাঁর মায়ের পেটের সৎভাইকে কুফা শহরের আমির পদে নিয়োগ করেছিলেন। অথচ হুরুফী লেখকের অভিযোগের উল্টো, খলীফার সেই সৎভাই কথিত উকবা ইবনে ওয়ালীদ ছিলেন না। বরং তাঁর নাম ছিল ওয়ালীদ ইবনে উকবা। অর্থাৎ, তিনি ছিলেন অবিশ্বাসী উকবার পুত্র। হুরুফী লেখক এই নামটি উল্টোভাবে লিখেছে। মক্কা বিজয়ের সময় এই ওয়ালীদ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি ওই লোক নন, যার বিরুদ্ধে সেই অপকর্মের অভিযোগটি রয়েছে। নবম হিজরী সালে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে বনূ মোস্তালেক গোত্রের কাছ থেকে কর আদায়ের দায়িত্ব অর্পণ করেন। হুরুফী লেখক নামগুলো সম্পর্কে বিভ্রান্ত হয়েছে ধরে নিয়ে আমরা এরও জবাব দেবো।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) যখন বায়তুল মাল তথা রাষ্ট্রীয় কোষাগারের দায়িত্বে ছিলেন, তখন হযরত সা'আদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর কাছ থেকে কিছু সম্পত্তি ধার করেছিলেন। কিন্তু তিনি সেটি পরিশোধ করতে পারেননি। এই বিষয়টি সারা কুফা শহরের সর্বসাধারণ্যে গুজবের মতো ছড়িয়ে যায়। খলীফা পদে অধিষ্ঠিত হযরত উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এ সংবাদ শোনার পর হযরত সা'আদ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে কুফার আমির পদ থেকে অব্যাহতি দেন। তিনি তাঁর আস্থাভাজন ওয়ালীদকে ওই পদে স্থলাভিষিক্ত করেন। ওয়ালীদের মাঝে প্রশাসনিক দক্ষতা ও গুণ ছিল। তিনি গুজবের পরিসমাপ্তি ঘটান। তিনি জনপ্রিয়ও হয়ে ওঠেন। আজারবাইজানের লোকেরা বিদ্রোহ করলে ওয়ালীদ সেনাবাহিনীতে যোগ্য সেনাপতিদের নিযুক্ত করেন। মাদাঈনের আমির হযরত হুযাইফা-এ-ইয়ামেনী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)-ও সৈন্যদলে যোগ দেন। ওয়ালীদ স্বয়ং নেতৃত্ব দেন এবং বিদ্রোহ সফলভাবে দমন করেন। অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে গযওয়ায় লিপ্ত হয়ে তিনি অনেক গনীমতের মাল অর্জন করেন। এমনি এক সময়ে গোপন

সংবাদ আসে যে বাইজেনটিনীয় রোমানদের একটি বড় সৈন্যবাহিনী সিভাস ও মালাতিয়্যা অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। ওয়ালীদ দামেস্কে অবস্থিত সিরীয় বাহিনীকে সহায়তার জন্যে একটি ইরাকী বাহিনী প্রেরণ করেন। ফলে আনাতোলিয়ার অনেক এলাকা মুসলমানদের দখলে চলে আসে। হিজরী ত্রিশ সালে ওয়ালীদের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ লোকেরা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাছে এই মর্মে অভিযোগ করে যে তিনি মদ্যপানে আসক্ত। হযরত ইবনে মাসউদ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) তা নাকচ করে দেন এ কথা বলে, "যে ব্যক্তি জনসমক্ষে পাপাচারে লিপ্ত হয় না (অর্থাৎ সাক্ষ্য নেই), তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া যায় না।" ওই হিংসাপরায়ণ লোকেরা এরপর খলীফার দরবারে অভিযোগ দায়ের করে। খলীফা উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) তাঁকে মদীনা মোনাওয়ারায় ডেকে পাঠান। তদন্ত করে ওয়ালীদের মদ্যপানের তথ্য মেলে। ইসলামী আইনে 'হাদ্দ' নামের যে শাস্তির বিধান রয়েছে, তা তাঁকে দেয়া হয় এবং সাঈদ ইবনে আ'সকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করা হয়। ইতিপূর্বে জাযিরা অঞ্চলে ওয়ালীদকে হযরত উমর ফারুক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) প্রাদেশিক শাসকের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। খলীফা উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক নিযুক্ত প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের তালিকা পরবর্তী পর্যায়ে আমরা পেশ করবো।

আহলে সুন্নাতের শত্রু হুরুফী শিয়াদের আরেকটি জঘন্য মিথ্যাচার হচ্ছে এই যে, (সাহাবা-এ-কেরাম) নাকি ইমাম হাসান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর কফিনে তীর নিক্ষেপ করেছিলেন। আমরা এক্ষণে 'কেসাস-এ-আম্বিয়া' ইতিহাস পুস্তকের বরাতে প্রকৃত ঘটনাটুকু তুলে ধরবো:

হিজরী ৪৯ সালে ইমাম হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর বড় ভাই ইমাম হাসান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে হুজরাহ-এ-সা'আদাতে দাফনের জন্যে যখন প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তখন নানা দায়িত্ব থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত ও মদীনায় বসবাসকারী মারওয়ান বলেন যে তাঁরা কাউকেই সেখানে দাফন হতে দেবেন না। মদীনা মোনাওয়ারায় বসবাসকারী সকল উমাইয়া বংশীয়কে সাথে নিয়ে তিনি এর বিরোধিতা আরম্ভ করেন। এমতাবস্থায় হাশেমীয় বংশ তাঁদের বিপক্ষে যুদ্ধ করার জন্যে অস্ত্র তুলে নেন। এই পরিস্থিতি দেখে হযরত আবূ হুরায়রা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর পরামর্শক্রমে ইমাম হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর বড় ভাই ইমাম হাসান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে 'বাকী' কবরস্থানে দাফন করেন। ফলে ওই ফিতনা এড়ানো সম্ভব হয়। উমাইয়া বংশীয় সাঈদ ইবনে

আস্ যিনি মদীনার শাসনকর্তা ছিলেন, তিনি জানাযায় শরীক হন। ইসলামী প্রথা অনুযায়ী তিনি-ই তাতে ইমামতি করেন।

খলীফা উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর আরেকজন সমালোচক হচ্ছে মিসরীয় ধর্ম সংস্কারক সাইয়্যেদ কুতুব; এই ব্যক্তির সমালোচনার প্রকাশভঙ্গি এ সত্যকে আড়াল করে যে সে হুরুফী শিয়াদের দ্বারা পথভ্রষ্ট হয়েছিল। তাকে একজন ইসলামী পণ্ডিত ও মুজতাহিদ হিসেবে বর্তমানে উপস্থাপন করা হচ্ছে এবং তার বইপত্র তুর্কী ও ইংরেজিতে ভাষান্তরিতও হচ্ছে; উপরন্তু এক দল লোক তার এ সব বই তরুণ প্রজন্মের কাছে পড়ার জন্যে পেশও করেছে। অথচ এই ব্যক্তিই নিজের রচিত ও ১৩৭৭ হিজরী/ ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত 'আল-আদালাতুল এজতেমাইয়াতু ফীল ইসলাম' পুস্তকের ১৮৬ ও তৎপরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে অত্যন্ত নোংরা ও অবমাননাকর ভাষায় মুসলমানদের পরম ভক্তি-শ্রদ্ধার পাত্র খলীফা উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর কুৎসা রটনা করেছে। আমাদের ইসলামী আদব (শিষ্টাচার) ও শিক্ষা এই সমস্ত কুৎসার সবগুলোকে উদ্ধৃত করতে বাধা দেয়। তবে আমরা ওই বইয়ের কয়েকটি পৃষ্ঠা হতে কিছু লাইন উদ্ধৃত করবো:

"এতো বৃদ্ধ বয়সে উসমান কর্তৃক খেলাফতের পদ গ্রহণ করার ঘটনাটি ছিল দুর্ভাগ্যজনক। তিনি মুসলমানদের শাসনব্যবস্থা পরিচালনায় ছিলেন অক্ষম। তিনি মারওয়ানের কূটচাল ও উমাইয়াদের ঠকানোর কৌশলের কাছে দুর্বল ছিলেন। মুসলমানদের সম্পদ-সম্পত্তি তিনি এলোমেলোভাবে ব্যয় করেন। তাঁর এই আচরণ সর্বসাধারণ্যে গুজবের বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়। তিনি আত্মীয়-স্বজনকে রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত করেন। এঁদেরই একজন ছিলেন হাকাম, যাকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বরখাস্ত করেছিলেন। এই ব্যক্তির পুত্র হারিসের কন্যার সাথে যখন খলীফা নিজ পুত্রের বিয়ে দেন, তখন তিনি নববিবাহিত দম্পতিকে বায়তুল মাল থেকে ২০০ দিরহাম উপহারস্বরূপ প্রদান করেন। পরের দিন সকালে বায়তুল মালের কোষাধ্যক্ষ যায়দ বিন আরকাম খলীফার কাছে কাঁদতে কাঁদতে আসেন এবং নিজ পদ থেকে অব্যাহতি তাঁর দরবারে প্রার্থনা করেন। খলীফা কর্তৃক বায়তুল মাল থেকে সম্পত্তি নিজ আত্মীয়স্বজনের কাছে দেয়ার কারণে যায়দ পদত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বুঝতে পেরে উসমান তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, 'আমি স্বজনপ্রীতি করেছি বলেই কি তুমি কাঁদছো?' যায়দ উত্তর দেন, 'না। আমি কেঁদেছি এই ভেবে যে আপনি

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যাহেরী (প্রকাশ্য) জিন্দেগীর সময় আল্লাহর ওয়াস্তে আপনারই দানকৃত সম্পত্তির বিনিময়ে এ সব জিনিস ফেরত নিচ্ছেন।' যায়দের উত্তর শুনে উসমান রাগান্বিত হয়ে বলেন, 'বায়তুল মালের চাবি রেখে দূর হও! আমি অন্য কাউকে এ পদে খুঁজে নেবো।' খলীফা উসমানের অপচয়ের এ রকম আরও অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। তিনি যুবায়রকে ৬০০ দিরহাম, তালহাকে ২০০ দিরহাম ও আফ্রিকা হতে সংগৃহীত করের এক-পঞ্চাংশ মারওয়ানকে দান করেন। তাঁর এই আচরণের কারণে তাঁকে সাহাবা-এ-কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম), বিশেষ করে হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহুল করীম) অনেক ভর্ৎসনা করেন।

"উসমান (খলীফা থাকা কালে) মোয়াবিয়ার ব্যক্তিগত সম্পদ-সম্পত্তি বৃদ্ধি করে দেন এবং তাকে ফিলিস্তিন রাজ্য দান করেন। তিনি হাকাম ও তার সৎভাই আবদুল্লাহ বিন সা'আদ এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজনকে শাসনকর্তা পদে নিয়োগ দেন। ইসলামের মৌলনীতি থেকে তাকে ধীরে ধীরে সরে যেতে দেখে সাহাবা-এ-কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) মদীনা মোনাওয়ারায় সমবেত হন। খলীফা তখন বয়সের ভারে ন্যুব্জ এবং মানসিকভাবে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত; অপর দিকে মারওয়ান সব কিছুই তখন নিয়ন্ত্রণ করছিলেন। মানুষেরা খলীফার প্রতি পরামর্শ দিতে হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহুল করীম)-কে তার কাছে প্রেরণ করেন। ওই সময় দুজনের মধ্যে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা হয়। উসমান জিজ্ঞেস করেন, 'বর্তমানে প্রাদেশিক শাসনকর্তা হিসেবে দায়িত্বরত মুগিরা কি খলীফা উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর আমলেও শাসনকর্তা ছিলেন না?' হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহুল করীম) জবাব দেন, 'হ্যাঁ, ছিলেন।' উসমান আবারও প্রশ্ন করেন, 'হযরত উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) কি তাঁর পুরো খেলাফত আমলে মুয়াবিয়াকে প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিযুক্ত করে রাখেননি?' এবার হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহুল করীম) উত্তরে বলেন, 'হ্যাঁ, নিযুক্ত করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু মোয়াবিয়া হযরত উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে খুব ভয় করতেন। আর এখন তিনি আপনার অজ্ঞাতসারে ষড়যন্ত্রের জাল বুনে যাচ্ছেন। তিনি এ কাজ করে বলছেন যে এইটি নাকি আপনার-ই নির্দেশ। আপনি সবই জানছেন ও শুনছেন, অথচ মোয়াবিয়ার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছেন না।' উসমানের খেলাফত আমলে সত্য ও মিথ্যা, ভালো ও মন্দের সংমিশ্রণ ঘটে। তিনি আরও আগে খলীফা হলে মোটামুটি কম বয়সী হতেন। যদি তিনি পরবর্তীকালে খলীফা হতেন,

অর্থাৎ, আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহুল করীম) যদি আগেই তার পরিবর্তে খলীফা হতেন, তবে ভালো হতো; কেননা, সে ক্ষেত্রে উমাইয়া গোষ্ঠী আর হস্তক্ষেপ করতে পারতো না।[১]"

ওপরে উদ্ধৃত মন্তব্য দ্বারা সাইয়্যেদ কুতুব ইসলামী খলীফাবৃন্দের, বিশেষ করে আমীরে মোয়াবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর প্রতি গালমন্দ করেছে। সে আরও দাবি করেছে যে খলীফামণ্ডলী নাকি নিজেদের ব্যক্তিগত নফসানী (ক্ষতিকর) আনন্দ-ফূর্তির স্বার্থে বায়তুল মালের অর্থ বেহিসেবি খরচ করেছিলেন এবং এ সমস্ত কিছুর পেছনে নাকি মূল কারণ ছিলেন হযরত উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)! 'তোহফা' শীর্ষক গ্রন্থে দলিল দ্বারা প্রমাণ করা হয়েছে যে সাইয়্যেদ কুতুবের এ সকল অভিযোগ মিথ্যা ও গোমরাহী ছাড়া কিছুই নয়। হযরাতে সাহাবা-এ-কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-ই সর্বসম্মতিক্রমে হযরত উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে খলীফা নির্বাচন করেন। আর এই নির্বাচকদের মধ্যে একজন ছিলেন হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহুল করীম)। খলীফা উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর সমালোচনা করে সাইয়্যেদ কুতুব হযরাতে সাহাবা-এ-কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-বৃন্দের এজমা'আ তথা ঐকমত্যের বিরোধিতা করেছে এবং নিম্নবর্ণিত হাদিসকেও অমান্য করেছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান,

لَا تَجْتَمِعُوا عَلَى ضَلَالَةٍ.

–আমার উম্মত গোমরাহী তথা পথভ্রষ্টতায় ঐকমত্য পোষণ করবে না।[২]

'মিরআত-এ-কায়নাত' গ্রন্থে লেখা হয়েছে: "ইসলামের তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান বিন আফফান বিন আবিল'আস বিন উমাইয়া বিন আবদে শামস বিন আবদে মানাফ বিন কুসায় (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হচ্ছেন মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি ঈমান স্থাপনকারী চতুর্থ ব্যক্তি। তাঁর চাচা যখন তাঁকে বেঁধে ফেলে জানান তিনি ওই বাঁধন খুলে দেবেন না যতোক্ষণ না হযরত উসমান তাঁর পূর্বপুরুষদের ধর্মে প্রত্যাবর্তন করবেন, তখন হযরত উসমান

---

১. সাইয়্যেদ কুতুব কৃত 'আল-আদালাতুল এজতেমাইয়াতু ফীল ইসলাম', ১৮৬ ও তৎপরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ।

২. ক) আবু দাউদ : আস্ সুনান, বাবু যিকরিল ফিত্‌নি ওয়া দালায়িলিহা, ১১:৩২৩, হাদিস নং : ৩৭১১।
খ) তাবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবু ফাদ্বায়িলি সায়্যিদিল মুরসালীন, পৃ. ২৫১, হাদিস নং : ৫৭৫৫।
গ) তাবরানী : মু'জামুল কবীর, ৩:৪৭০।

(রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, তিনি তাতে (মিথ্যে ধর্মে) ফেরার চেয়ে মৃত্যুকেই বেছে নিতে রাজি আছেন। এ কথা শুনে তাঁর চাচা আশা ছেড়ে দেন এবং তাঁর বাঁধন খুলে দেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র প্রতি অবতীর্ণ ওহী (ঐশী বাণী)-এর কাতেব (লেখক) ছিলেন হযরত উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)। আল্লাহ তা'আলার আদেশে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর কন্যা রুকাইয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)-কে হযরত উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর সাথে বিয়ে দেন। বদরের জ্বিহাদের সময়কালে হযরত রুকাইয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বেসালপ্রাপ্তা হলে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর দ্বিতীয় কন্যা উম্মে কুলসুম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)-কেও হযরত উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর সাথে বিয়ে দেন। হিজরী নবম সালে হযরত উম্মে কুলসুম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)-ও বেসালপ্রাপ্তা হলে হুযূর পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ ফরমান, 'আমার যদি আরও কন্যা থাকতো, তবে তাদেরকেও উসমানের সাথে বিয়ে দিতাম।'

দ্বিতীয় কন্যা উম্মে কুলসুম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)-কে যখন তিনি বিয়ে দেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে বলেছিলেন,

'ওহে কন্যা! তোমার স্বামী উসমান অন্য যে কারো চেয়ে তোমারই পূর্বপুরুষ হযরত ইবরাহীম (আলাইহিস্ সালাম) ও তোমারই পিতা মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম))-এর সাথে বেশি সদৃশ বা সাযুজ্যপূর্ণ।' হুযূর পূর নূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দুই কন্যাকে বিয়ে করার সৌভাগ্য হযরত উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর মতো আর কারো হয়নি। একবার তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে এলে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজ মোবারক পা দুটোকে নিজ জামা দিয়ে ঢেকে দেন। হযরত আয়েশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এটি করার কারণ জিজ্ঞেস করলে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ ফরমান, 'ফেরেশতাকুল উসমানের সামনে লজ্জা পায়। আমারও কি উচিত নয় লজ্জা পাওয়া?'

অপর এক হাদিসে তিনি এরশাদ ফরমান, 'উসমান হচ্ছে বেহেশতে আমার ভাই এবং সে সব সময়ই আমার সাথে থাকবে।'

তাবুকের জ্বিহাদের সময় মুসলমান সৈন্যদের খাদ্য ও সরঞ্জাম অপ্রতুল হয়ে পড়লে বিপদ দেখা দেয়। এমতাবস্থায় হযরত উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)

নিজস্ব সম্পদ হতে তিন হাজার উট, সত্তরটি ঘোড়া ও দশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা সরবরাহ করেন। এগুলো সৈন্যদের মাঝে বিতরণের পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ ফরমান, 'আজ হতে উসমানের আর কোনো গুনাহ-খাতা লিপিবদ্ধ হবে না'

[অনুবাদকের জরুরি নোট: মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দুনিয়াতেই উম্মতের গুনাহ-খাতা মাফ করার এখতেয়ারপ্রাপ্ত!]।

ইমাম সুয়ূতী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) প্রণীত 'জামেউস্ সাগির' গ্রন্থে বর্ণিত একটি হাদিসে হুযূর পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ ফরমান, 'উসমানের শাফায়াত দ্বারা সত্তর হাজার দোযখগামী মুসলমান বিনা বিচারে জান্নাতে প্রবেশ করবে।'

ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে হযরত উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর প্রচুর লোক-জ্ঞান বা ব্যবহারিক জ্ঞান ছিল। ধর্মের তাত্ত্বিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে হযরত উমর ফারূক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ও তাঁর মধ্যে এমন উৎসাহ-উদ্দীপনাপূর্ণ আলোচনা অনুষ্ঠিত হতো যে মানুষেরা তা দেখে মনে করতেন তাঁরা বুঝি ঝগড়া করছেন।[১]"

'তোহফা' শীর্ষক বইটিতে লেখা হয়েছে: হযরত উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর খেলাফত আমলে তিনি প্রত্যেককে নিজ নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী নিয়োগ দেন। তাদের সামর্থ্য অনুসারে তিনি তাদেরকে দায়িত্ব দিতেন। খলীফার সব কিছু জানার কথা ছিল না। তিনি কিছু লোককে নিযুক্ত করেন, যাদের প্রতি তিনি আস্থাশীল ছিলেন; যাদের তিনি ভালো, সৎ ও ন্যায়বান ব্যবসায়ী হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন; যাদের সম্পর্কে তিনি ভেবেছিলেন তারা প্রশাসনিক পদে তাঁর আদেশ যথাযথভাবে মান্য করবেন। এই কারণে তাঁর সমালোচনা করার অধিকার কারোরই নেই। তাঁর সঠিক ও সৎ আচরণকে আজকাল কিছু মানুষ অন্যায় আচরণ বলে বিকৃতভাবে তুলে ধরতে চেষ্টা করছে। হযরত উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও সেনাপতিবৃন্দ ছিলেন সেরা বাছাইকৃত নেতৃবৃন্দ খলীফার সাথে ঘনিষ্ঠতার ক্ষেত্রে ও তাঁরই আদেশ পালনের বেলায়; সামরিক কৌশল ও রাজ্য জয়ের দিক দিয়ে; আর তাঁদের অধ্যবসায়ী চরিত্রের বেলায়ও। খলীফার শাসনামলে এই সেনাপতিমণ্ডলী ইসলামী রাষ্ট্রের

১. মির'আত আল-কায়নাত।

সীমানা পশ্চিমে স্পেন এবং পূর্বে কাবাল ও বেলহ পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। জল ও স্থলে তাঁরা একের পর এক মুসলিম বাহিনীর জন্যে বিজয়মাল্য এনে দেন। ইরাক ও খোরাসান ইতিপূর্বে দ্বিতীয় খলীফার আমলে ফিতনা ও ফাসাদের অভয়ারণ্যে পরিণত হয়েছিল। সেনাপতিবৃন্দ সেখানে এমন শুদ্ধি অভিযান পরিচালনা করেন যে ফিতনা সৃষ্টিকারীরা আর ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি। এ সকল প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের কেউ কেউ যদি অসঙ্গতিপূর্ণ আচরণ প্রদর্শন করে খলীফার প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হন, তাহলে এর দোষ কেন খলীফার ওপরে বর্তাবে? তিনি এ ধরনের আচরণ দেখলে কখনোই চুপ থাকতেন না। তাছাড়া, এ রকম পরিস্থিতিতে তিনি তদন্ত আরম্ভ করতেন এ বিষয়টি দেখতে যে, তা শুধু ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিদের প্রচারিত কোনো কুৎসা কি-না। কেননা, রাষ্ট্রবিদদের স্বাভাবিকভাবেই অনেক শত্রু থাকে, তাঁদের প্রতি হিংসাকারীরও অভাব থাকে না। স্রেফ কোনো অভিযোগের ভিত্তিতে কর্মকর্তা পাল্টানো হলে দেশের গোটা প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে বিশৃঙ্খল করে ফেলা হতো। তাই খলীফা প্রথমে তদন্ত করতেন এবং অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে অপসারণ করতেন। তিনি যে ওয়ালীদকে অপসারণ করেন, এ কথা সত্য। হযরত মোয়াবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) কিন্তু খলীফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেননি, যদিও তিনি (মোয়াবিয়া) দামেস্কে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। তাঁর শাসনাধীন কেউই ন্যূনতম ক্ষতির কবলে পড়েননি। আমীরে মোয়াবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে মুসলমানদের ওপর শাসন করছিলেন এবং অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে জ্বিহাদ করছিলেন। এ রকম একজন মহানায়ককে কে অপসারণ করতে চাইবেন? মিসরের শাসনকর্তা আবদুল্লাহ ইবনে সা'আদ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কেই বা কেন খলীফা অপসারণ করতে যাবেন? হযরত উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর পরে এই মহৎ ব্যক্তি পদত্যাগ করেন এবং ফিতনা থেকে দূরে সরে যান। তাঁর বিরুদ্ধে মদীনা কর্তৃপক্ষের বরাবরে যেসব অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছিল, সেগুলোর সবই ছিল আবদুল্লাহ ইবনে সাবা' নামের এক ইহুদীর বানোয়াট মিথ্যে। সংক্ষেপে, খলীফা উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেন। তবে তকদীর তাঁর কর্তব্যকর্মের প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, আর তিনি ইহুদীদের সৃষ্ট ফিতনার আগুন নেভাতে পারেননি।

হযরত উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর ব্যাপারটি অনেকটা হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহুল করীম)-এর মতোই ছিল। হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহুল করীম)-এর গৃহীত বহু সতর্কতামূলক পদক্ষেপের

ফলাফল শূন্যে পরিণত হয়েছিল। শুধু হযরত উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর প্রাদেশিক শাসনকর্তাবৃন্দই তাঁর সাথে ঘনিষ্ঠ ও তাঁর প্রতি অনুগত ছিলেন। তাঁরা খলীফাকে নিয়মিত গনীমতের মালামাল পাঠাতেন। সকল মুসলমানের পর্যাপ্ত সম্পদ-সম্পত্তি ছিল এবং তাঁরা শান্তি ও সুখ-সমৃদ্ধিতে বসবাস করছিলেন। বস্তুতঃ এই সমৃদ্ধিই ফিতনা সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পক্ষান্তরে, হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর প্রাদেশিক শাসনকর্তাবর্গ তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। তারা নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করেনি। এতে রাষ্ট্র-প্রশাসন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহুল করীম)-এর আপন আত্মীয়স্বজন, যথা তাঁর চাচাতো ভাইয়েরাই এই কর্তব্য-কর্মের অবহেলায় জড়িয়ে পড়ে। যে সব লোক হযরত উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে হেয় করতে চায়, তারা সুন্নী উলেমাবৃন্দকে বিশ্বাস না করলে শিয়া বইপত্র পড়ে দেখতে পারে। তাতে তারা প্রকৃত ঘটনা জানতে পারবে। শিয়াদের কাছে অত্যন্ত উঁচুভাবে মূল্যায়িত *'নাহজুল বালাগা'* বইটিতে হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহুল করীম)-এর আপন চাচাতো ভাইয়ের কাছে লিখিত তাঁরই একখানি চিঠি উদ্ধৃত হয়েছে। ওই চিঠিতে তিনি সেই মোনাফেকের ওপর যে আস্থা রেখেছিলেন তা-ই ব্যক্ত হয়েছে। *'নাহজুল বালাগা'* পুস্তকে এরপর সেই মোনাফেকের রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত একখানি তালিকা দেয়া হয়েছে। খলীফা হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহুল করীম)-এর নিযুক্ত অপর প্রাদেশিক শাসনকর্তা মুনযির বিন জারুতও রাষ্ট্রদ্রোহী প্রমাণিত হয়েছিল। খলীফা তাকে যে হুমকিসম্বলিত পত্র লিখেছিলেন, তা অধিকাংশ শিয়া পুস্তকে বিদ্যমান। হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহুল করীম)-এর এই সকল প্রাদেশিক শাসনকর্তার অজুহাত দেখিয়ে খলীফাকে গালমন্দ করা যায় না। এমন কি আম্বিয়া (আলাইহিমুস্ সালাম)-বৃন্দও মোনাফেকদের নরম কথায় বিশ্বাস করে ধোকায় পড়েছেন। তবে এ সব ক্ষেত্রে তাঁদের প্রতি ওহী নাযিল হয়েছিল এবং বেশির ভাগ মোনাফেকেরই অন্তঃস্থ বিদ্বেষভাব বেরিয়ে এসেছিল। শিয়াপন্থীরা বলে যে ইমামবৃন্দকে অজ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। আর তারা হযরত উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে সতর্ক না থাকার দায়ে দোষারোপ করে থাকে। তাদের এই ধারণার মাপকাঠিতে তারা হযরত আলী (কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এরও মানহানি করে বটে। কেননা, তাদের এই ভ্রান্ত ধারণা অনুযায়ী হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু) মুসলমানদের শাসন করার জন্যে রাষ্ট্রদ্রোহীদেরকে উচ্চপদে নিয়োগ

করেছিলেন, যদিও তিনি জানতেন তারা বিদ্রোহ করবে। হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর নিযুক্ত অপর এক কুখ্যাত প্রাদেশিক শাসনকর্তা ছিল যিয়াদ বিন আবিহ।

হুরুফী শিয়া গোষ্ঠী কর্তৃক হযরত উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর প্রতি কালিমা লেপনের আরেকটি অপপ্রয়াস হলো তিনি মারওয়ানের পিতা হাকামকে মদীনা মোনাওয়ারায় প্রবেশের অনুমতি দিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইতিপূর্বে হাকামকে মদীনা হতে বের করে দিয়েছিলেন, কারণ তিনি মোনাফেকদের সাথে বন্ধুত্ব করেছিলেন এবং মুসলমানদের মাঝে ফিতনা সৃষ্টি করেছিলেন। অতঃপর প্রথম দুই খলীফার শাসনামলে (মদীনার) অবিশ্বাসীদেরকে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে নিয়ে আসা হয় এবং সেখানে আর মোনাফেকের অস্তিত্ব ছিল না। এমতাবস্থায় হাকামকে আর নির্বাসনে থাকার প্রয়োজনও ছিল না। প্রথম দুই খলীফা তাকে বাড়ি ফেরার অনুমতি দেননি। কেননা, তিনি তাঁর পূর্ববর্তী ফিতনা সৃষ্টির অভ্যাসে প্রত্যাবর্তন করার সম্ভাবনা ছিল (এই কথা ভেবে অনুমতি দেয়া হয়নি)। হাকাম ছিলেন বনূ উমাইয়া গোত্রভুক্ত। অপর দিকে দুই খলীফার একজন তামিম এবং আরেকজন আদী গোত্রীয় ছিলেন। জাহেলীয়া যুগের গোত্রীয় কোন্দলে প্রত্যাবর্তনের সমূহ সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু হযরত উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ছিলেন হাকামের ভাতিজা। তাই এ ধরনের কোন্দলের কোনো আশঙ্কার কারণও ছিল না। হযরত উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর এই সিদ্ধান্তের পক্ষে যে ব্যাখ্যা দেন তা নিম্নরূপঃ

> "আমি তাকে (হাকামকে) মদীনায় ফেরত আনার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অনুমতি পেয়েছিলাম। আমি তা খলীফা আবূ বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে জানালে তিনি আমাকে সাক্ষী হাজির করতে বলেন। আমি চুপ ছিলাম, কারণ আমার কোনো সাক্ষী ছিল না। খলীফা উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) আমার বক্তব্য গ্রহণ করবেন, এই আশায় আমি তাঁকেও আরজি পেশ করি। কিন্তু তিনিও সাক্ষী হাজির করতে বলেন। অতঃপর আমি খলীফা হলে হাকামকে মদীনায় প্রবেশের অনুমতি দেই, কেননা আমি (রাসূলুল্লাহর সম্মতি সম্পর্কে) জানতাম।"

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শেষ অসুখের সময় তিনি এরশাদ ফরমান, "আমি আশা করি পুণ্যবান কেউ আমার কাছে আসবে এবং আমি তাকে কিছু কথা বলবো।"

সাহাবা-এ-কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) জিজ্ঞেস করেন, হযরত আবূ বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে ডেকে পাঠাবেন কি-না। তিনি উত্তর দেন, "না।" তাঁরা আবার জিজ্ঞেস করেন হযরত উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর ব্যাপারে। তিনি আবার বলেন, "না।" তাঁরা হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর নাম মোবারক উচ্চারণ করলে তিনি আবারও বলেন, "না।" অবশেষে তাঁরা হযরত উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর নাম মোবারক উল্লেখ করেন, আর মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জবাবে "হ্যাঁ" বলেন। হযরত উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর কাছে এলে তিনি তাঁকে কী যেন বলেন। এই সময়ই সম্ভবতঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাকামের জন্যে শাফায়াত করেন এবং তাঁর শাফায়াত (আল্লাহর দরবারে) গৃহীত হয়। এটি সর্বজনবিদিত যে হাকাম তাঁর ফিতনা সৃষ্টির পূর্ববর্তী অভ্যাস পরিত্যাগ করেছিলেন এবং ইন্তেকালের আগে তওবাও করেছিলেন। অধিকন্তু, মদীনা প্রত্যাবর্তনকালে তিনি এতো বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন যে তার পক্ষে কিছু করা আর সম্ভব-ই ছিল না।

হযরত উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) খলীফা থাকাকালে বায়তুল মাল (রাষ্ট্রীয় কোষাগার) থেকে উপহার সামগ্রী তাঁর আত্মীয়স্বজনকে দান করেছিলেন মর্মে হুরুফী শিয়াদের ও সাইয়্যেদ কুতুবের বইয়ে উত্থাপিত অভিযোগ সঠিক নয়। কেননা, তা বায়তুল মাল থেকে নয় বরং খলীফার নিজস্ব সম্পদ থেকে প্রদান করা হয়েছিল। হযরত আবদুল গনী নাবলুসী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) নিজ 'হাদিকা' পুস্তকের ৭১৯ পৃষ্ঠায় লেখেনঃ "খোলাফায়ে রাশেদীনের চারজনের মধ্যে তিনজন বায়তুল মাল থেকে বেতন পেতেন। হযরত উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বেতন গ্রহণ করেননি, কারণ তিনি প্রচুর ধনসম্পদের মালিক ছিলেন। বেতনের কোনো প্রয়োজন-ই তাঁর ছিল না।" 'বারিকা' শীর্ষক গ্রন্থের ১৪৩১ পৃষ্ঠায় একই তথ্য পরিবেশনের পাশাপাশি আরও যোগ করা হয়েছে, "যেদিন হযরত উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে শহীদ করা হয়, সেদিন তাঁর নওকরের ব্যক্তিগত মালামালের মধ্যে ১ লক্ষ ৫০ হাজার স্বর্ণ-দিনার, ২ লক্ষ স্বর্ণ মূল্য পরিমাণ ১০ লক্ষ রৌপ্য দিরহাম ও জামাকাপড় পাওয়া গিয়েছিল।" খলীফা ছিলেন বস্ত্রের ব্যবসায়ী। উপহার সামগ্রী তিনি শুধু তাঁর আত্মীয়-পরিজনকেই

দান করতেন না, বরং সবাইকে দান করতেন। আল্লাহর ওয়াস্তেই তিনি অনেক দান-সদকাহ করতেন। প্রতি শুক্রবার তিনি কোনো না কোনো গোলামকে মুক্ত করে দিতেন। প্রতি দিনই তিনি সাহাবা-এ-কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-কে দাওয়াত করে খাওয়াতেন। আল্লাহর ওয়াস্তে দানকৃত সম্পদকে কেউই অপচয় বলতে পারে না। উপরন্তু, একটি হাদিসে এরশাদ হয়েছে যে আত্মীয়স্বজনকে দানের মধ্যে দ্বিগুণ সওয়াব নিহিত রয়েছে। একবার খলীফা উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) সাহাবা-এ-কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)কে সমবেত করেন। সেখানে হযরত আম্মার বিন ইয়াসের (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-ও উপস্থিত ছিলেন। খলীফা বলেন, "দয়া পাওয়ার যোগ্য মানুষদের মধ্যে কুরাইশ ও বনূ হাশেম গোত্রগুলোকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে অগ্রাধিকার দিয়েছেন, সে সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবার জন্যে আপনাদের আহ্বান করছি। তাঁরা যদি আমাকে জান্নাতের চাবিগুলো দেন, তবে আমি তাঁদের সবাইকেই জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেবো। কাউকেই বাইরে ফেলে রেখে যাবো না।" খলীফার এই কথায় সাহাবা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-বৃন্দ কোনো জবাব দেননি। অতএব, তিনি বায়তুল মাল থেকে তাঁর সমস্ত উপহার সামগ্রী দান করতেন বলে মনে করার ব্যাপারটি স্রেফ গোঁড়ামি ও একগুঁয়েমি ছাড়া আর কিছুই নয়। এটি তাঁর প্রতি শত্রুতা পোষণেরই আলামত (লক্ষণ)। যখন তাঁকে (এ বিষয়ে) জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তখন তিনি জবাব দিয়েছিলেন, "ন্যায়বিচার ও তাকওয়া (খোদাভীতি)-এর সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ কোনো বিষয় দ্বারা আমাকে ভারাক্রান্ত করো না।" মারওয়ানের ভাই হারিসের কন্যার সাথে নিজের পুত্রকে বিয়ে দেয়ার সময় খলীফা উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) নিজস্ব তহবিল থেকে ০১ (এক) হাজার রৌপ্যমুদ্রা প্রেরণ করেন। তাঁর কন্যা রুমানকে মারওয়ানের সাথে বিয়ে দেয়ার সময়ও তিনি ০১ (এক) হাজার দিরহাম তাদের (নব দম্পতি)-কে দিয়েছিলেন। এই উপহারের কোনোটিই বায়তুল মাল থেকে প্রদান করা হয়নি।

'হযরত উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) আফ্রিকিয়া হতে আগত গনীমতের মালের এক-পঞ্চমাংশই মারওয়ানকে দান করেন' মর্মে অভিযোগটি, যেটি সাইয়্যেদ কুতুব হুরুফী বইপত্র ও আব্বাসীয় ইতিহাসপুস্তক থেকে গ্রহণ করেছে, তা আরেকটি মিথ্যে ছাড়া আর কিছুই নয়। খলীফা ২৯ হিজরী সালে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সা'আদের অধীনে এক সহস্র অশ্বারোহী ও পদাতিকের এক শক্তিশালী বাহিনী আফ্রিকায় প্রেরণ করেন। তিউনিশীয় রাজধানী আফ্রিকিয়ায় অনেক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং মুসলমান বাহিনী যুদ্ধ জয় করে প্রচুর

গনীমতের মালামাল লাভ করে। আব্দুল্লাহ মারওয়ান সেই মালামালের এক-পঞ্চমাংশ খলীফার দরবারে নিয়ে আসেন। এগুলোর মধ্যে কেবল স্বর্ণমুদ্রার সংখ্যাই ছিল পাঁচ সহস্রাধিক। ফিরতি যাত্রার সময় দূরত্ব বেশি হওয়ায় এ সমস্ত মালামাল মদীনা মোনাওয়ারায় নেয়া কঠিন ও বিপজ্জনক হিসেবে সাব্যস্ত হয়। তাই মারওয়ান এগুলোর মধ্যে এক সহস্র দিরহাম বিক্রি করে বাকি অর্থ মদীনা মোনাওয়ারায় নিয়ে আসেন। তিনি (যুদ্ধ জয়ের) সুসংবাদও নিয়ে আসেন, যার দরুন তিনি খলীফার আন্তরিক আশীর্বাদ লাভ করেন। মারওয়ানের এই কষ্টসাধ্য দীর্ঘ যাত্রা ও তার নিয়ে আসা সুসংবাদের খাতিরে খলীফা তাকে ওই যাত্রার মাঝপথে তার দ্বারা বিক্রীত সম্পদ হতে লব্ধ সমস্ত অর্থ ফেরত দানে ব্যর্থতার দায় হতে মাফ করে দেন। এটি খলীফার ইখতেয়ারভুক্ত একটি বিষয়। উপরন্তু, এগুলোর সবই সাহাবা-এ-কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)'র উপস্থিতিতে ঘটেছিল। কারো কাছে যদি এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা উপঢৌকন হিসেবে আসে এবং তিনি যদি ওই অর্থ থেকে এক বা ততোধিক মুদ্রা মালামাল বহনকারীকে দান করেন, তবে একে কেউই অপচয় বলতে পারবেন না। বস্তুতঃ আল্লাহ পাক আদেশ করেছেন যেন যাকাত সংগ্রহকারীকে তার চাহিদা বা প্রয়োজন মোতাবেক অর্থ প্রদান করা হয়। এ ছাড়া আরেকটি কুৎসাপূর্ণ অভিযোগ হলো 'খলীফা উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) আবদুল্লাহ বিন খালেদকে এক হাজার দিরহাম প্রদান করেন।' প্রকৃতপক্ষে তিনি এই ব্যক্তিকে কিছু অর্থ কর্জ দেয়ার জন্যে আদেশ করেছিলেন। আবদুল্লাহ তার প্রাপ্ত ধার পরবর্তীকালে পরিশোধ করেন। খলীফা যখন শোনেন যে তাঁর মেয়ের জামাই হারিস মদীনা মোনাওয়ারার ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে যাকাত সংগ্রহের সময়ে অন্যায় করেছেন, তৎক্ষণাৎ তিনি তাকে তার পদ থেকে অপসারণ করেন এবং তার শাস্তি বিধান করেন।

খলীফা হযরত উসমান যিন্-নুরাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হিজায ও ইরাকে তাঁর আস্থাভাজন মানুষদের এবং আত্মীয়স্বজনকে অনাবাদি জমি দান করতেন এবং তাঁদের কাছে চাষের সরঞ্জাম সরবরাহ করে ওই জমি চাষের আওতায় আনতেন; ফলে এভাবে তিনি মানুষের কাছে অনেক চাষযোগ্য জমি হস্তান্তর করেন। তিনি কৃষির প্রভূত উন্নতি সাধন করেন এবং আঙ্গুর ও আপেল বাগান গড়ে তোলেন। তাঁর সময়ে আরবের শুষ্ক ও অনুর্বর ভূভাগ উর্বরতা লাভ করে। এরই ফলশ্রুতিতে দেশে শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজ করে। চোর-ডাকাতের উপদ্রব ও বন্য জন্তুর আক্রমণ এই সময় ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই নেয়। তাদের

আস্তানা যেখানে ছিল, সেখানে অতিথি আশ্রম ও পান্থশালা নির্মিত হয়। আর এ সকল অবকাঠামোর সূত্রে ভ্রমণ (পর্যটন) ও পরিবহনের সুযোগও সৃষ্টি হয়। আরব অঞ্চলের জন্যে এগুলো ছিল যুগান্তকারী ঘটনা। এই কৃতিত্ব বিংশ শতাব্দীর যান্ত্রিক উপকরণ দ্বারাও অর্জন করা সম্ভব ছিল না। এ যেন হযরত উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর শাসনামলে অর্জিত সভ্যতার মাত্রা নির্দেশক হাদিস শরীফেরই ভবিষ্যদ্বাণী যা'তে এরশাদ হয়েছে, "প্রলয় সে সময় পর্যন্ত হবে না, যতোক্ষণ আরবে নদ-নদী প্রবাহিত না হবে।"

অপর এক হাদিসে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত আদী বিন হাতেম তাঈ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে বলেন,

يَا عَدِيُّ هَلْ رَأَيْتَ الْحِيرَةَ قُلْتُ لَمْ أَرَهَا وَقَدْ أُنْبِئْتُ عَنْهَا قَالَ فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللهَ.

–তোমার হায়াতে জিন্দেগী দীর্ঘ হলে তুমি দেখবে কোনো মহিলা আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় না পেয়ে কীভাবে হেরা শহর থেকে কা'বা শরীফে সহজে যাতায়াত করে।[১]

খলীফা উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর জমানায় ধনসম্পদ বৃদ্ধি ও ব্যবসায়িক জীবনের উন্নতিসম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীমূলক আরও অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে। সাহাবা-এ-কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) এই সমৃদ্ধি ও শান্তি প্রত্যক্ষ করে হযরত উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর শাসনব্যবস্থা ও সাফল্যে বিমুগ্ধ হন। তাঁরাও খলীফার পদাঙ্ক অনুসরণ করতে থাকেন। হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু) ইয়াম্বু ও ফাদাক এবং যুহরা নামের স্থানগুলোতে জমি চাষ করেন। হযরত তালহা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) খলীফার পদাঙ্ক অনুসরণ করে গাবেদ নামের স্থানে ভূমি কর্ষণ করেন এবং হযরত যুবায়র (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-ও যেহাশেব নামের স্থানে অনুরূপ কৃষিকাজ করেন। হিজায অঞ্চল সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠে। খলীফা উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর খেলাফত যদি আরও কিছু বছর

[১]. ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু আলামাতিন্ নবুয়্যাতি ফীল ইসলাম, ১১:৪২৯, হাদিস নং : ৩৩২৮।
খ) তাবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবু ফাদ্বায়িলি সায়্যিদিল মুরসালীন, পৃ. ২৭৩, হাদিস নং : ৫৮৫৭।
গ) বায়হাকী : সুনানুল কুবরা, ৫:২২৫।

স্থায়ী হতো, তবে তা শিরায নগরীর গোলাপ-বাগান এবং হেরাতের বনাঞ্চল অবশ্যই ছাড়িয়ে যেতো। কারো জন্যে খলীফার অনুমতির শর্তসাপেক্ষে অনাবাদি জমি নিজের বলে চাষ করা (ইসলামে) বৈধ হলে তা খলীফার নিজের জন্যে কেন বৈধ হবে না? আর এভাবে তাঁর ফলানো ফসল কেন তাঁরই জন্যে হালাল হবে না? হযরত উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) নিজ সম্পদের অনেক জমি আবাদি করে তোলেন; আঙ্গুর ফলের ও আপেলের বাগানও গড়ে তোলেন। তিনি অনেক কুয়ো খনন করেন এবং সেঁচের ব্যবস্থাও করেন। অন্যান্যদের জন্যে তিনি উজ্জ্বল নজির স্থাপন করেন। মানুষের জন্যে তিনি ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ সৃষ্টি করে দেন। 'সম্পদ আরও সম্পদের জন্ম দেয়', এই প্রবাদের বাস্তব রূপস্বরূপ মানুষের আয়-রোজগার কয়েক গুণ বৃদ্ধি পায়। তাঁর শাসনামলে ভূমি কর্ষণ বা বাগান পরিচর্যায় জড়িত নন এমন কেউই আর অবশিষ্ট ছিলেন না। যদি ভারত উপমহাদেশের আবুল আলা মওদূদী কিংবা মিসরের সাইয়্যেদ কুতুব ইসলামের ইতিহাস পড়তো, অথবা অন্ততঃ ভারত উপমহাদেশে রচিত 'তোহফা' শীর্ষক গ্রন্থটি অধ্যয়ন করতো, তাহলে তারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র খলীফাবৃন্দ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম আজমাঈনকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টায় লজ্জা পেতো। ওই সকল পুণ্যাত্মার প্রশংসা যথাযোগ্য মর্যাদায় করতে নিজেদের অপারগতা উপলব্ধি করে তারা অবশ্যই তাদের আচরণ সংযত করতো।

হযরত উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) 'বায়তুল মাল হতে হযরত যায়দ বিন সাবেত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে এক হাজার দিরহাম দান করেন' মর্মে অভিযোগটি হলো মন্দ দৃষ্টিকোণ থেকে সব বিষয়কে বিবেচনা করার আরেকটি বাজে নজির। প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে একদিন খলীফা দান পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তিদের জন্যে বায়তুল মাল (রাষ্ট্রীয় কোষাগার) হতে সম্পদ বণ্টনের আদেশ দেন। তাঁর ফরমান যথারীতি বাস্তবায়ন করা হয়। অতঃপর যখন দেখা গেল যে এক সহস্র দিরহাম উদ্বৃত্ত আছে, তখন তিনি সেগুলোকে জনসেবায় ব্যয় করার জন্যে নির্দেশ দেন। হযরত যায়দ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ওই অর্থ মসজিদে নববীর মেরামত কাজে ব্যবহার করেন।

শাফেঈ আলেম হাফেয আহমদ বিন মুহাম্মদ আবূ তাহের সিলাফী যিনি ৫৭৬ খৃষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন, তাঁর রচিত 'মাশিহাত' গ্রন্থে বর্ণিত এবং এর পাশাপাশি ইবনে আসাকির কর্তৃক উদ্ধৃত একখানি হাদিস শরীফে মহানবী

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঘোষণা করেন, "আবূ বকরকে ভালোবাসা এবং তাঁকে শোকরিয়া জানানো আমার উম্মতের জন্যে ওয়াজিব।" ইমাম মানাবী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)-ও ইমাম দায়লামী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) হতে এই হাদিসটি উদ্ধৃত করেন। হাফেয উমর বিন মুহাম্মদ আরবিলী কৃত 'ওয়াসীলা' পুস্তকে লিপিবদ্ধ অপর একটি হাদিসে তিনি এরশাদ করেন, "আল্লাহ তা'আলা যেমন তোমাদের জন্যে নামায, রোযা ও যাকাত ফরয করেছেন, ঠিক তেমনি তিনি তোমাদের জন্যে আবূ বকর, উমর, উসমান ও আলীকে ভালোবাসা ফরয করেছেন।" আবদুল্লাহ ইবনে আদী বর্ণিত এবং আল-মানাবী কর্তৃক উদ্ধৃত আরেকটি হাদিসে বিবৃত হয়েছে, "আবূ বকর ও উমরের প্রতি মহব্বত রাখা ঈমান হতে নিঃসৃত। আর তাদের প্রতি শত্রুতা হলো মোনাফেকী।" ইমাম তিরমিযী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর বর্ণনানুযায়ী একবার কোনো এক মৃত ব্যক্তির জানাযা পড়ার জন্যে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে আনা হয়। তিনি তা পড়তে অস্বীকৃতি জানান এবং বলেন, "এই লোক উসমানের প্রতি বৈরী ভাবাপন্ন ছিল। অতএব, আল্লাহ তা'আলাও এর প্রতি বৈরী ভাব পোষণ করছেন।" সূরা তাওবার ১০০ নং আয়াতে ঘোষিত হয়েছে,

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.

–এবং সবার মধ্যে অগ্রগামী প্রথম মুহাজির ও আনসার আর যারা সৎকর্মে তাদের অনুসারী হয়েছে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট; আর তাদের জন্যে (তিনি) প্রস্তুত রেখেছেন বাগানসমূহ (জান্নাত), যেগুলোর নিম্নদেশে নহরসমূহ প্রবাহমান।[১]

প্রথম তিন খলীফা প্রাথমিক মো'মিন মুসলমানদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। আর সর্ব-হযরত আমীরে মোয়াবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ও আমর ইবনে আস্

[১]. আল কুরআন : সূরা তাওবা, ৯:১০০।

(রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) সে সকল মুসলমানের অন্তর্ভুক্ত যাঁরা তাঁদেরকে অনুসরণ করেছিলেন। ইসলামের ইতিহাসে নেতৃস্থানীয় এই পুণ্যাত্মাবৃন্দের কুৎসা রটনা যে সব লোক করছে, তারা বাস্তবে ওপরোক্ত আল-কুরআনের আয়াতে কারীমা ও হাদিস শরীফেরই বিরোধিতা করছে। আর যে ব্যক্তি কুরআনের আয়াত ও হাদিস শরীফের বিরোধিতা করে, সে এরই ফলশ্রুতিতে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে অবিশ্বাসীতে পরিণত হয়। তার মুসলমান হওয়ার দাবি এই বাস্তবতাকে অস্বীকার করতে পারবে না যে সে একজন মোনাফিক বা যিনদিক।

[৬]

হযরত মা আয়েশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)-এর প্রতি অপবাদ ও তার রদ

হুরুফী লেখক বলে, "আরেক বুড়ি একটি চুড়ি/বালা হারানোর মিথ্যে গল্প ফেঁদেছিল, যা ছিল সাফওয়ানের সাথে মরুভূমিতে ঘটে যাওয়া তার প্রেমের উপাখ্যান ঢাকবার একটি চেষ্টামাত্র। এটি করতে যেয়ে ওই বুড়ি হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর ওপর তালাকের কারণ চাপিয়ে দেয়। এরই ফলশ্রুতিতে জামাল তথা উটের যুদ্ধের সূত্রপাত হয়।"

ওপরের বক্তব্য দ্বারা ম্যাগাজিন পত্রিকাটি নির্লজ্জভাবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর স্ত্রী ও মো'মিন মুসলমানদের মাতা হযরত আয়েশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)-কে আক্রমণ করেছে। এ বিষয়ে হযরত আব্দুল হক্ব মোহাদ্দীসে দেহেলভী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর প্রণীত 'মাদারিজুন্ নুবুয়্যত' গ্রন্থে কী বলেছেন তা দেখুন:

হযরত আয়েশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) ছিলেন অসংখ্য গুণে গুণান্বিতা। আসহাবে কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-বৃন্দের মধ্যে তিনি ছিলেন ফিক্‌হবিদ। তিনি স্পষ্টভাষী ও বাগ্মীও ছিলেন। সাহাবা-এ-কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-এর জন্যে তিনি ফতোওয়া দিতেন। অধিকাংশ উলামামণ্ডলীর মতে, ফিক্‌হ-বিদ্যার এক-চতুর্থাংশ জ্ঞানই হযরত আয়েশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত হয়। একটি হাদিস শরীফে হুযূর পূর নূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ ফরমান, "তোমাদের এক-তৃতীয়াংশ দ্বীনী জ্ঞান হুমায়রা হতে শিক্ষা করো!"

তিনি হযরত আয়েশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)-কে অত্যন্ত ভালোবাসতেন বলে তাঁকে 'হুমায়রা' নামে ডাকতেন। আসহাব-এ-কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) ও তাবেঈন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-দের মধ্যে বেশির ভাগই তাঁর কাছ থেকে শ্রুত বিভিন্ন হাদিস শরীফ বর্ণনা করেন। হযরত উরওয়াত ইবনে যুবায়র (রাদ্বিয়াল্লাহু

আনহু) ব্যক্ত করেন, কুরআনুল করীমের অর্থ (তাফসীর), হালাল-হারাম, আরবী পদ্য বা বংশ বৃত্তান্তবিষয়ক জ্ঞানে হযরত আয়েশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)'র চেয়ে বেশি জ্ঞানী আর কাউকেই দেখি নি। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রশংসায় রচিত নিচের দুটি পংক্তি তাঁরই:

মিসরীয় লোকেরা যদি তাঁর কপোলদ্বয়ের সৌন্দর্য সম্পর্কে শুনতে পেতো,
তাহলে তারা ইউসূফ (আঃ)-কে কেনার জন্যে অর্থ ব্যয় না করতো।

(মানে তারা তাঁর কপোলদ্বয় দেখার জন্যেই ওই অর্থকড়ি রাখতো)।

জোলেখাকে দোষারোপকারিনী নারীরা যদি তাঁর আলোকোজ্জ্বল ললাট দেখতে পেতো,
তবে তারা তাদের হাতের বদলে নিজেদের হৃদয়গুলোই কাটতো।

(আর এতে তারা কোনো ব্যথাই অনুভব করতো না)।

হযরত আয়েশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)-এর আরেকটি মর্যাদাপূর্ণ শ্রেষ্ঠত্ব হলো তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রেমময়ী স্ত্রী। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। যখন হুযূর পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করা হয় তিনি (স্ত্রীদের মাঝে) কাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন, তিনি উত্তরে বলেন, "আয়েশা।" আর যখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয় কোন্ ব্যক্তিকে তিনি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন, তিনি জবাবে বলেন, "আয়েশার পিতা।" অর্থাৎ, তিনি হযরত আবূ বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কেই উদ্দেশ্য করেছিলেন। হযরত আয়েশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)-কে যখন জিজ্ঞেস করা হয় মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কাকে বেশি ভালোবাসতেন, তিনি উত্তর দেন হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)-কে হুযূর পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বেশি ভালোবাসতেন। তাঁকে যখন আবার জিজ্ঞেস করা হয় কোন্ ব্যক্তিকে তিনি বেশি ভালোবাসতেন, তিনি জবাবে বলেন হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)'র স্বামীকে তিনি বেশি ভালোবাসতেন। এর মানে দাঁড়ায় এই যে, মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর স্ত্রীদের মাঝে হযরত আয়েশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)-কে তিনি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন; তাঁর সন্তানদের মাঝে তিনি হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)-কে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন; তাঁর আহলে বায়তের (পরিবারের) মধ্যে হযরত আলী (কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-কে তিনি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন; আর তাঁর সাহাবা-এ-কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-দের মধ্যে হযরত আবূ বকর

(রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কেই তিনি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন। হযরত আয়েশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণনা করেন, "একদিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর মোবারক চপ্পলের চামড়ানির্মিত ফিতা খুলছিলেন, আর আমি সুতো বুনছিলাম। তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডলের দিকে নজর করতেই আমি দেখি, তাঁর উজ্জ্বল ললাট থেকে ঘাম বের হচ্ছিল; প্রতিটি বিন্দু ঘাম চারদিকে আলো ছড়াচ্ছিল। এগুলো আমার চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছিল। আমি হতভম্ব হয়ে যাই। তিনি আমার দিকে ফিরে তাকান এবং জিজ্ঞেস করেন, "তোমার কী হয়েছে? কেন তুমি এতো চিন্তামগ্ন?" আমি আরয করি, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনার পবিত্র মুখমণ্ডলের নূরানী আলোর তীব্রতা এবং আপনার পবিত্র ললাটে ঘামের বিচ্ছুরিত প্রভা দেখে আমি আত্মহারা।' তিনি উঠে দাঁড়িয়ে আমার কাছে আসেন। আমার দুচোখের মাঝখানে চুম্বন দিয়ে তিনি বলেন, "ওহে আয়েশা! আল্লাহ পাক তোমাকে ভালাই দিন! তুমি আমাকে যেভাবে সন্তুষ্ট করেছো সেভাবে আমি তোমাকে সন্তুষ্ট করতে পারিনি।"

অর্থাৎ, তিনি বলতে চেয়েছেন, 'আমাকে তোমার কৃত সন্তুষ্টি তোমাকে আমার কৃত সন্তুষ্টির চেয়েও বেশি।' মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি ভালোবাসা ও তাঁর সৌন্দর্য দেখে তা স্বীকার করার স্বীকৃতিস্বরূপ এবং সম্মানার্থে তিনি হযরত আয়েশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)-এর পবিত্র দুনয়নের মাঝখানে চুম্বন করেন। একটি ছত্র ব্যক্ত করে,

আমি তব সৌন্দর্য দর্শনে আপন আঁখিকে জানাই অভিনন্দন!
সৌন্দর্য দর্শনে ওই দুনয়ন কতোই না উত্তম,
তাঁর ভালোবাসার দহনে পূর্ণ হৃদয় কতোই না সৌভাগ্যবান!

তাবেঈনদের শীর্ষস্থানীয় বুযর্গ হযরত ইমাম মাসরুক্ব (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) হযরত আয়েশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) হতে যখনই কোনো রিওয়ায়াত উদ্ধৃত করতেন, তিনি সর্বপ্রথমেই বলতেন, "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রিয়তমা স্ত্রী এবং হযরত আবূ বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর আশীর্বাদধন্য কন্যা হযরত সিদ্দিকা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) বলেন"। কখনো কখনো তিনি আরম্ভ করতেন এভাবে, "আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দিনী ও বেহেশতবাসীদের (প্রাণপ্রিয়) দুলালী বিবৃত করেন।" হযরত আয়েশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) বলতেন যে, তিনি-ই আযওয়াজে মোতাহ্হারাত তথা হুযূর পূর নূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর স্ত্রীবৃন্দের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং

তিনি তাঁর প্রতি বর্ষিত আল্লাহ তা'আলার আশীর্বাদ সম্পর্কে গর্বও করতেন। উদাহরণস্বরূপ, তিনি বলতেন, "মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) (আমার বাবার কাছে) আমায় বিয়ে করার ইচ্ছে প্রকাশের আগে জিবরাইল আমীন তাঁকে আমার একখানি ছবি দেখিয়ে বলেছিলেন, 'ইনি আপনার স্ত্রী'!" জীবিত প্রাণীর ছবি অঙ্কন তখনো হারাম ঘোষিত হয়নি। তাছাড়া, ওই ছবি তো কোনো মানুষই আঁকেনি। তাহলে তা কেন গুনাহ/পাপ হবে? বুখারী ও মুসলিম শরীফে বিদ্যমান একটি হাদিসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের মা আয়েশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)-কে বলেন,

"তোমাকে আমি পর পর তিন রাত স্বপ্নে দেখি। ফেরেশতা (জিবরাইল আমীন) সাদা রেশমের কাপড়ের ওপর আঁকা তোমার ছবি আমায় দেখিয়ে বলেন, 'ইনি আপনার স্ত্রী'। ফেরেশতা যে ছবি দেখিয়েছিলেন, তা আমি ভুলিনি। সেটি হুবহু তুমি-ই।"

মা আয়েশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একবার তাহাজ্জুদ নামায পড়ছিলেন (মধ্য রাতের পরে), আর আমি তাঁর পাশে শুয়েছিলাম। এই সম্মান একমাত্র আমারই (বৈশিষ্ট্য)[১]। তিনি সিজদায় গেলে তাঁর পবিত্র হাত মোবারক কখনো কখনো আমার পা স্পর্শ করতো এবং আমি আমার পা টেনে সরিয়ে নিতাম।" হযরত আয়েশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)'র প্রতি দানকৃত সম্মানের মধ্যে আরেকটি হলো, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং তিনি এক সাথে গোসল করতেন এবং একই হাউজ (পানির আধার) ব্যবহার করতেন। এটি হযরত আয়েশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)-এর প্রতি মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অন্তরে পোষণকৃত ভালোবাসার মাত্রা-ই প্রতিফলন করে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত আয়েশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) ছাড়া তাঁর অপর কোনো স্ত্রীর শয্যায় ওহী প্রাপ্ত হননি। আর এতে আল্লাহ তা'আলা হযরত আয়েশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)-কে কতোখানি মূল্যায়ন করেছেন, তার প্রতিফলন ঘটেছে। একবার হযরত উম্মে সালামা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) মা আয়েশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) সম্পর্কে হুযূর পূর নূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে কিছু কথা বলেছিলেন। তিনি এর জবাবে বলেন,

[১]. মা আয়েশা এই গুণ সম্পর্কে গর্ব করতেন– আল্লামা ইশিক।

لَا تُؤْذِينِي فِي عَائِشَةَ فَإِنَّ الْوَحْيَ لَمْ يَأْتِنِي وَأَنَا فِي ثَوْبِ امْرَأَةٍ إِلَّا عَائِشَةَ قَالَتْ فَقَالَتْ أَتُوبُ إِلَى اللهِ مِنْ أَذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ.

–আয়েশার সূত্রে আমাকে আঘাত করো না। আমি তার শয্যায় ওহী পেয়েছি।" অতঃপর হযরত উম্মে সালামা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) তাঁকে বলেন, "আমি আর কখনোই আপনাকে আঘাত করবো না। ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমি তাওবা করছি।[১]

একদিন মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর কন্যা হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)-কে জিজ্ঞেস করেন,

يَا بُنَيَّةُ أَلَا تُحِبِّينَ مَا أُحِبُّ؟ قَالَتْ: بَلَى. قَالَ: فَأَحِبِّي هَذِهِ.

–তুমি কি এমন কাউকে ভালোবাসবে যাকে আমি ভালোবাসি? মা ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) হাঁ-সূচক জবাব দেয়ার পর তিনি বলেন, 'তাহলে আয়েশাকে ভালোবাসো'।[২]

হযরত আয়েশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) গর্ব করে বলতেন, "আমার বিরুদ্ধে রটানো কুৎসা যে মিথ্যে ছিল, তা আল্লাহ পাক-ই (ওহীর মাধ্যমে) প্রকাশ করেন।"

মহান রাব্বুল আলামীন তাঁর পবিত্র কুরআন মাজীদের সূরা নূরের সতেরোটি আয়াত নাযিল করেন এ কথা ঘোষণা করতে যে হযরত আয়েশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)-এর নামে যারা অপবাদ দিয়েছিল, তারা জাহান্নামী হবে। মা আয়েশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)-এর মাহাত্ম্য ও উচ্চ মর্যাদার আরেকটি নিদর্শন হলো এই সব আয়াতে করীমা।

হযরত আয়েশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)-এর প্রতি কুৎসা রটানো হয় 'মুরাইসী' ধর্মযুদ্ধের সময়, হিজরী পঞ্চম সালে। এই জিহাদকে 'বনী মোস্তালেক'-ও বলা

[১]. ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু মা আহদা ইলা সহিবিহি..., ৯:৩০, হাদিস নং : ২৩৯৩।
খ) তাবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবু মানাক্বিবি কুরাইশ ওয়া যিকরি কাবায়িলি, পৃ. ৩৪৯, হাদিস নং: ৬১৮০।
গ) তাবরানী : মু'জামুল কবীর, ১৭:১৮৩।

[২]. ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু মা আহদা ইলা সহিবিহি..., ৯:৩০, হাদিস নং : ২৩৯৩।
খ) তাবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবু মানাক্বিবি কুরাইশ ওয়া যিকরি কাবায়িলি, পৃ. ৩৪৯, হাদিস নং: ৬১৮০।
গ) তাবরানী : মু'জামুল কবীর, ১৭:১৮৩।

হয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক সহস্র সৈন্যের সমন্বয়ে গঠিত একটি শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে ধর্মযুদ্ধে গমন করেন। মা আয়েশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) ও হযরত উম্মে সালামা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)-কে তিনি সাথে নেন। কিছু সংখ্যক মোনাফিক গনীমতের (যুদ্ধে প্রাপ্ত) মালামাল লাভের আশায় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত উমর ফারূক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে সেনাপতির দায়িত্ব দেন। এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর পাঁচ হাজার ভেড়া ও দশ হাজার উট লাভের পাশাপাশি সাত'শরও বেশি শত্রুকে বন্দি করা হয়। তাদের মধ্যে জুওয়াইরিয়্যা-ও ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে অর্থের বিনিময়ে মুক্ত করেন এবং তাঁকে বিয়ে করেন। এই দৃশ্য দেখে হযরতে আসহাব-এ-কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) বলেন, "আমরা কীভাবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আত্মীয়স্বজনকে আমাদের বন্দি হিসেবে রাখতে পারি?" অতঃপর তাঁরা সকল বন্দিকেই মুক্ত করে দেন। জুওয়াইরিয়া নিশ্চয় অনেক ভাগ্যবতী মহিলা হবেন, কেননা তাঁর মাধ্যমেই তাঁর গোত্র মুক্তি পেয়ে যায়। ওই একই বছর মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত সালমান ফারসী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে তাঁর ইহুদী মালিকের কাছ থেকে অর্থের বিনিময়ে মুক্ত করে দেন। এই সাহাবী হিজরী প্রথম বর্ষে মুসলমান হবার সৌভাগ্য অর্জন করেন।

নিম্নের বর্ণনাটি *'মা'আরিজুন্ নুবুওয়া'* শিরোনামের পারসিক গ্রন্থের তুর্কী অনুবাদ 'আল্টি-পারমাক' শীর্ষক পুস্তক হতে সংগৃহীত। ওতে লিপিবদ্ধ আছে: কোনো জ্বিহাদে যাবার আগে হুযূর পূর নূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর কোন্ স্ত্রীকে সাথে নেবেন তা নির্ধারণের জন্যে লটারী করতেন এবং বিজয়িনীকে সাথে নিতেন। হযরত আয়েশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণনা করেন,

"নারীদেরকে পর্দা করার হুকুমসম্বলিত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরই এই ঘটনার সূত্রপাত হয়। আমার জন্যে একটি তাঁবু তৈরি করা হয় এবং আমি ওই তাঁবুতে উটের পিঠে চড়ে প্রবেশ করি। জ্বিহাদ শেষে ফেরার পথে আমরা (সেনাদল) মদীনার সন্নিকটে একটি জায়গায় যাত্রাবিরতি করি। ভোরে শ্রুত আওয়াজে আমরা বুঝতে পারি যে আমাদেরকে আবার যাত্রা আরম্ভ করতে হবে। প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে আমি (সেনা) ছাউনি ছেড়ে একটু দূরে যাই। সেখান থেকে ফিরে এলে পরে আমি দেখতে পাই যে আমার হাতের চুড়ি/বালা হারিয়ে গিয়েছে। তাই আমি আবারো সেখানে যেয়ে তার খোঁজ করি এবং

পেয়েও যাই। কিন্তু ছাউনিতে ফিরে এসে দেখি সেনাবাহিনী নেই; তারা চলে গিয়েছে। তারা নিশ্চয় আমার তাঁবুকে উটের পিঠে চড়িয়েছিল এই ভেবে যে আমি তাতে (তাঁবুতে) অবস্থান করছি। ওই সময় আমি খুব কম খেতাম এবং খুব দুর্বল ছিলাম। উপরন্তু, চৌদ্দ বছর বয়সী হওয়ায় আমি খুব বিচলিত হয়ে যাই। অতঃপর আমি মনে মনে বলি, নিশ্চয় তারা আমার অনুপস্থিতি অনুভব করে আমার খোঁজে ফিরে আসবে। তাই আমি সেখানে অপেক্ষা করতে থাকি এবং কিছুক্ষণ পর ঘুমিয়ে পড়ি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার খোঁজে (হযরত) সাফওয়ান বিন মুয়াত্তিল সুলামী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে ফেরত পাঠান। এই ব্যক্তি আমাকে ঘুমন্ত অবস্থায় পেয়ে চিৎকার করেন। তাঁর চিৎকারে আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। তাঁকে দেখতে পেয়ে আমি আমার মুখ ঢেকে ফেলি। তিনি তাঁর উটকে হাটু ভেঙ্গে বসান এবং বলেন, 'উটে চড়ে বসুন!' আমি তা-ই করি। সাফওয়ান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) উটের গলার দড়ি ধরেন। আমরা যখন সেনাদলের দেখা পাই ততোক্ষণে পরিস্থিতি বেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। প্রথমেই মোনাফেকদের একটি দল আমাদের সামনে পড়ে। তারা নিজেদের মধ্যে অপ্রীতিকর আলাপে ব্যস্ত ছিল। এটি উস্কে দিয়েছিল ইবনে আবি সালুল। মুসলমানদের মধ্যে হযরত হাস্সান বিন সাবেত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এবং মিসতাহও সেই আলাপে জড়িয়ে যান। ফিরে আসার পর আমি অসুস্থ বোধ করি। কিন্তু গুজব সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। তবুও আমি সে সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। শুধু (দেখতে পাই), রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইতিপূর্বে যেমনটি আমার কাছে ঘনঘন আসতেন, তেমনটি তো আর আসছেনই না বরং আমি কেমন আছি তা জানতে অন্তত একবারও তিনি আসেননি। এ রকম কেন হচ্ছে তা আমি বুঝতে পারিনি। এক রাতে মিসতাহর মাতাকে সাথে নিয়ে আমি টয়লেটের জন্যে বের হই। তাঁর জামার কাপড় নিজের পায়ে পেঁচিয়ে তিনি পড়ে যান। তিনি তাঁর ছেলে মিসতাহকে অভিসম্পাত দেন। লানত দেয়ার কারণ তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি তা বলতে চাননি। কিন্তু আমি বারংবার জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, ওহে আয়েশা! সে যে গুজব ছড়াচ্ছে তা কি তুমি জানো না?' আমি তাঁকে ওই গুজব সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি সমস্ত কুৎসার বিবরণ প্রদান করেন। এতে তৎক্ষণাৎ আমার অসুখ বেড়ে যায়। জ্বরে মনে হয় যেন আমার মাথা পুড়ে যাচ্ছিল। জ্ঞান হারিয়ে আমি পড়ে যাই। জ্ঞান ফিরলে বাড়িতে প্রত্যাবর্তন করি। অতঃপর বাবার বাড়ি যাবার জন্যে আমি মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর

কাছে আরজি পেশ করলে তিনি তা গ্রহণ করেন। আমার উদ্দেশ্য ছিল, কী ঘটছে তা খতিয়ে দেখা। আমি আমার মাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'চিন্তা করো না, বাছা! সব কিছু তোমার জন্যে সহজ হয়ে যাবে। প্রত্যেক সুন্দরী নারী যাকে তার স্বামী ভালোবাসে, সে এ ধরনের কুৎসার মুখোমুখি হতে পারে।' আমি আশ্চর্যান্বিত হলাম। ভাবছিলাম এই অপবাদ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পবিত্র কানে পৌঁছেছিল কি-না। আর আমার বাবা এ সম্পর্কে শুনলেই বা কী হবে, তা নিয়েও চিন্তিত ছিলাম আমি। এ সব চিন্তা আমাকে ব্যথিত করছিল এবং আমি ডুকরে ডুকরে কাঁদছিলাম। ওই সময় আমার বাবা কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করছিলেন। তিনি আমার কান্নার আওয়াজ শুনতে পেয়ে আমার মাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করেন। মা তাঁকে বলেন যে রটানো কুৎসা সম্পর্কে প্রথমবারের মতো জানার দরুন আমি দুঃখে খুব ভেঙ্গে পড়েছি। এ কথা শুনে বাবাও কাঁদতে থাকেন। অতঃপর তিনি আমার কাছে এসে বলেন, 'আমার প্রিয় বৎস! ধৈর্য ধরো! আল্লাহ তা'আলা এ সম্পর্কে যে আয়াত নাযিল করবেন, তার জন্যে চলো আমরা অপেক্ষা করি।' সে রাতে ভোর না হওয়া পর্যন্ত আমি আর ঘুমোতে যেতে পারিনি। আমার চোখের পানিও আর বাঁধ মানেনি।"

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু) ও উসামা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে ডেকে পাঠান এবং তাঁদেরকে বলেন, "এই ব্যাপারটি কীভাবে মীমাংসা হবে?" উসামা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনার বিবি সাহেবা সম্পর্কে আমাদের শুধু সৎ ধারণা-ই বিদ্যমান।" অতঃপর হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু) বলেন, "পৃথিবীতে অনেক নারী আছেন। আল্লাহ তা'আলা আপনার জন্যে দুনিয়াকে সরু বানাননি তথা সঙ্কুচিত করেননি। আয়েশার জারিয়া (খেদমতগার) বোরায়দাকে আয়েশা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করুন!" এমতাবস্থায় বোরায়দাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, "আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি যে আমি আয়েশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)-কে কখনোই কোনো মন্দ বা ভুল কাজ করতে দেখিনি। সময়ে সময়ে তিনি নিদ্রাগত হতেন। ভেড়ার পাল (সন্ধ্যায় ফিরে) আসার পর তিনি ময়দা/যব পিষে রুটি বানাতেন এবং তা খেতেন। আমি অধিকাংশ সময়ই তাঁর কাছে ছিলাম। তাঁর মাঝে কোনো কিছু মন্দ প্রত্যক্ষ করিনি। এই গুজব যদি সত্যি হতো, তাহলে আল্লাহ পাক সে সম্পর্কে আপনাকে অবশ্যই জানাতেন।" আরেক দিন মহানবী

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজ গৃহে অবস্থান করছিলেন। তিনি ছিলেন দুঃখ ভারাক্রান্ত। এমনি সময় হযরত উমর ফারুক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) সেখানে আসেন। হুযূর পূর নূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর কাছে তাঁর মতামতও জানতে চান। হযরত উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমি ভালো করেই জানি মোনাফেকরা মিথ্যে বলছে। আল্লাহ তা'আলা আপনার মোবারক দেহে একটি মাছিকেও বসতে দেন না। সেটি কোনো ময়লার ওপর বসে সেই ময়লা আপনার পবিত্র শরীরে নিয়ে আসতে পারে, তাই এই বিষয় হতেও আল্লাহ পাক আপনাকে রক্ষা করে থাকেন। যে আল্লাহ তা'আলা আপনাকে ছোটখাটো ময়লা থেকে রক্ষা করেন, তিনি অবশ্যই আপনাকে সবচেয়ে বড় ময়লা থেকে রক্ষা করবেন।" হযরত উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর এই কথায় নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ভীষণ খুশি ও সন্তুষ্ট হন। তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডলে হাসির রেখা ফুটে ওঠে। অতঃপর তিনি হযরত উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে ডেকে পাঠান এবং তাঁকেও এ ব্যাপারে প্রশ্ন করেন। জবাবে হযরত উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, "মোনাফেক চক্র কর্তৃক ছড়ানো এই গুজব যে মিথ্যে, সে সম্পর্কে আমি কোনো সন্দেহ পোষণ করি না। এটি সম্পূর্ণভাবে একটি কুৎসা রটনা। আল্লাহ তা'আলা আপনার ছায়াকে মাটিতে পড়তেই দেন না। কোনো ময়লা জায়গায় আপনার পবিত্র ছায়া পড়ুক, অথবা কোনো নোংরা/বদ প্রকৃতির লোক আপনার ছায়াকে পদদলিত করুক, এটিও আল্লাহ তা'আলা হতে দেন না; তিনি আপনাকে রক্ষা করেন। এমতাবস্থায় তিনি কি আপনার আশীর্বাদধন্য গৃহে এমনি একটি ধূলিকণাকে প্রবেশ করতে দেবেন?" এই সকল কথাবার্তা মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পবিত্র অন্তরকে স্বস্তি দেয়। অতঃপর তিনি আবারো হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-কে ডেকে পাঠান এবং তাঁকেও এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করেন। হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু) বলেন, "এই সব গুজব মিথ্যে; এগুলো কুৎসা বটে। এগুলো মোনাফেকদেরই বানোয়াট কাহিনী। (একদিন) আপনি এবং আমরাও নামাযে দণ্ডায়মান হয়েছিলাম। নামায আদায়কালে আপনি আপনার মোবারক চপ্পল (স্যান্ডেল) খুলে রাখেন। আর আপনার অনুসরণে আমরাও আমাদের পায়ের স্যান্ডেল খুলে ফেলি। এতে আপনি বলেন, "তোমরা কেন তোমাদের পায়ের চপ্পল খুলে রেখেছো?' যখন আমরা উত্তর দেই যে আপনাকে অনুসরণ করার উদ্দেশ্যেই আমরা এ রকম করেছি, তখন আপনি বলেন,

"জিবরাঈল (আলাইহিস্ সালাম) এসে আমাকে জানান যে আমার চপ্পলে কিছু নাজাসাত (যে কোনো ময়লা যা নামাযের আগে জামা থেকে পরিষ্কার করা বাধ্যতামূলক) বিদ্যমান; তাই আমি ওই স্যান্ডেল জোড়া খুলে ফেলি।" যে আল্লাহ তা'আলা আপনাকে ময়লা থেকে রক্ষার জন্যে এমন কি নামাযে ওহী পর্যন্ত প্রকাশ করেছেন, তাঁর পক্ষে কি আপনার পবিত্র বিবি সাহেবাদের শরীরে অনুরূপ ময়লা পড়ার অনুমতি দেয়া সম্ভব? এ ধরনের কোনো পাপ হয়ে থাকলে, তিনি তৎক্ষণাৎ তা আপনাকে জানাতেন। অতএব, আপনার পবিত্র অন্তর যেন আর দুঃখ ভারাক্রান্ত না হয়। আল্লাহ তা'আলা নিশ্চয় ওহী অবতীর্ণ করে আপনাকে জানাবেন যে আপনার পবিত্র স্ত্রী খাঁটি, নির্মল।" এ কথায় মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অতিশয় খুশি হন। তিনি তৎক্ষণাৎ নিজ উপস্থিতি দ্বারা হযরত আবূ বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর গৃহকে ধন্য করেন।

হযরত আয়েশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণনা করেন, সেদিন আমি অবিরত কেঁদেছিলাম। আনসার সাহাবীদের জনৈক মহিলা মেহমান আমাকে ওই সময় দেখতে আসেন। তিনিও কাঁদছিলেন। আমার বাবা ও মা আমার পাশে উপবিষ্ট ছিলেন। হঠাৎ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এসে আমাদেরকে সম্ভাষণ জানান। তিনি আমার পাশে বসেন। এক মাস আগে ঘটে যাওয়া ওই ঘটনার পরে তিনি এতোদিন আমাকে দেখতেই আসেন নি। এর মধ্যে কোনো ওহীও নাযিল হয়নি। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার পাশে বসার পর আল্লাহ পাকের হামদ্ ও সানা (প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা) পাঠ করেন। তিনি শাহাদাত-বাক্যও পাঠ করেন। অতঃপর আমার দিকে ফিরে তিনি বলেন, "ওহে আয়েশা! তারা তোমার সম্পর্কে আমাকে এসব কথা বলেছে; তারা যা বলেছে তা মিথ্যে হলে তুমি যে সত্য, তা আল্লাহ তা'আলা সহসাই জানাবেন। আর যদি কোনো পাপ সংঘটিত হয়েই থাকে, তবে তওবা ও এস্তেগফার করো! আল্লাহ পাক সে সব মানুষকে ক্ষমা করেন যারা নিজেদের পাপের জন্যে তাওবা করে।" রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পবিত্র কণ্ঠ মোবারক শুনতে পেয়ে আমি কান্না বন্ধ করি। আমার বাবার দিকে তাকিয়ে আমি তাঁকে উত্তর দিতে বলি। আমার বাবা (হযরত আবূ বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, "ওয়াল্লাহি (আল্লাহর নামে শপথ)! আমি জানি না আমি কীভাবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে উত্তর দেবো। মূর্খতার যুগে আমরা ছিলাম মূর্তিপূজারী। মানুষের মূর্তি আমরা পূজা করতাম। যথাযথভাবে ইবাদত-বন্দেগী

করতেও আমরা জানতাম না। আমাদের মহিলাদের সম্পর্কে কেউই এ রকম কথা বলতে পারতো না। এখন আমাদের অন্তরগুলো দ্বীন ইসলামের আলো দ্বারা আলোকিত হয়েছে। ইসলামের জ্যোতি আমাদের ঘরগুলোকে জ্যোতির্ময় করেছে। অথচ মানুষেরা আমাদের বিরুদ্ধে এসব গুজব ছড়াচ্ছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে আমাদের কী বলা উচিত?" এরপর আমি আমার মাকে উত্তর দিতে বলি। তিনি বলেন, "আমি হতবাক। কী বলবো ভেবে পাচ্ছি না। তুমি-ই বরং ব্যাখ্যা করো।" এবার আমি বলতে আরম্ভ করি: আল্লাহর কসম, আপনার মোবারক কানে যে গুজব পৌঁছেছে, তা সর্বৈব মিথ্যে। আপনি ওই গুজবে বিশ্বাস করলে আমি যা-ই বলি না কেন, তাতে বিশ্বাস করবেন না। আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন যে আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ। যে কাজ করিনি, তা স্বীকার করে নিলে আমি আমার প্রতি কুৎসা রটনা করবো বৈ কী! ওয়াল্লাহি, আমার আর বলার কিছুই নেই, শুধু হযরত ইউসুফ (আলাইহিস্ সালাম)-এর ভাষ্য উদ্ধৃত করা ছাড়া; তিনি বলেন: 'ধৈর্যই উত্তম। তারা যা বলে, আমি তা হতে আল্লাহ তা'আলার সাহায্যই আশা করি।' ওই সময় আমি এতোই বিচলিত ছিলাম যে হযরত এয়াকূব (আলাইহিস্ সালাম)-এর নামের পরিবর্তে হযরত ইউসুফ (আলাইহিস্ সালাম)-এর নাম উচ্চারণ করেছিলাম। এ কথা বলে আমি মুখ ফিরিয়ে হেলান দেই। আমি সর্বদা আশা করছিলাম আল্লাহ পাক তাঁরই মহা অনুগ্রহে আমাকে এই মিথ্যে অপবাদ থেকে মুক্ত করে আমার সুনাম অক্ষুন্ন রাখবেন। কেননা, আমি আমার ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলাম যে আমি নির্দোষ। তবু আমি ঘুণাক্ষরেও ভাবিনি যে তিনি আমার খাতিরে আয়াতে করীমা নাযিল করবেন। আমি কল্পনাও করিনি যে এসব আয়াত দুনিয়ার শেষ সময় পর্যন্ত সর্বত্র আমার জন্যে তেলাওয়াত করা হবে। এটি এ কারণে যে আল্লাহ তা'আলার মাহাত্ম্যের মোকাবেলায় আমি নিজেকে ক্ষুদ্র মনে করেছি, আর তাই কখনো আশা করিনি যে তিনি আমার জন্যে আয়াত নাযিল করবেন। আমি শুধু আশা করেছিলাম, আমি যে নিষ্পাপ, আমার অন্তর যে নির্মল, তা তিনি মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর স্বপ্নে বা তাঁর পবিত্র অন্তরে প্রেরিত ওহী (ঐশী প্রেরণা) মারফত তাঁকে জানিয়ে দেবেন। আল্লাহর নামে শপথ, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যেখানে বসা ছিলেন সেখান থেকে তখনো উঠে দাঁড়াননি, আর কেউ কক্ষ ত্যাগও করেননি, এমতাবস্থায় তাঁর পবিত্র মুখাবয়বে ওহী অবতরণের চিহ্ন ফুটে ওঠে। ওই কক্ষে উপবিষ্ট সবাই বুঝতে পারেন যে ওহী অবতীর্ণ হয়েছে। আমাদের একখানা

চামড়ার গদি ছিল। আমার বাবা কী ঘটছে বুঝতে পেরে সেটি মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শির মোবারকের নিচে পেতে দেন। এরপর তিনি একটি মুসলিনের বিছানার চাদর দ্বারা তাঁকে ঢেকে দেন। ওহী অবতরণের পরে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজ চেহারা মোবারকের ওপর থেকে চাদরটি সরিয়ে ফেলেন। তাঁর লাল গোলাপের মতো মুখমণ্ডল হতে মুক্তোসদৃশ চকচকে ঘামের ফোঁটাগুলো নিজ পবিত্র হাত দ্বারা তিনি মুছে ফেলেন। স্মিতহাস্য বদনে তিনি বলেন, "ওহে আয়েশা! তোমার জন্যে সুখবর। তুমি যে নির্দোষ, আল্লাহ তা'আলা তার প্রমাণ দিয়েছেন। তুমি যে নির্মল (আত্মার), সে ব্যাপারে তিনি সাক্ষ্য দিয়েছেন।" তৎক্ষণাৎ আমার পিতা বলেন, "ওঠে দাঁড়াও, হে আমার কন্যা! রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে এখনি ধন্যবাদ জানাও!" আমি এমতাবস্থায় বলি, "ওয়াল্লাহি, আমি ওঠে দাঁড়াবো না, আল্লাহ ছাড়া কাউকে ধন্যবাদ-ও জানাবো না! কেননা, আমার প্রভু আমারই খাতিরে আয়াতে করীমা নাযিল করেছেন।" অতঃপর রাসূলে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দশটি আয়াতে করীমা তেলাওয়াত করেন, যেগুলো বর্তমানে সূরা নূরের ১১তম আয়াতের আগে যুক্ত রয়েছে। আমার বাবা সাথে সাথে ওঠে দাঁড়িয়ে আমার শিরে চুম্বন করেন।

হযরত আয়েশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) সম্পর্কে আয়াতে করীমা অবতীর্ণ হওয়ার আগে হযরত খালেদ বিন যায়েদ আবূ আইয়ুব আনসারী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর স্ত্রী তাঁকে (হযরত খালেদকে) জিজ্ঞেস করেছিলেন তিনি মা আয়েশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) সম্পর্কে রটে যাওয়া গুজবে বিশ্বাস করেন কি না। হযরত খালেদ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, "আল্লাহর ওয়াস্তে বলছি, এগুলো মিথ্যে। তুমি কি আমার প্রতি এ ধরনের কোনো অসদাচরণ করতে পারতে?" তাঁর স্ত্রী যখন জবাব দেন, "না, কখনোই না; আল্লাহ আমাকে এই পাপ থেকে হেফাযত করুন", তখন হযরত খালেদ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, "তাহলে আমাদের চেয়েও দৃঢ় ঈমান অন্তরে পোষণকারিনী হযরত আয়েশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) কি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র সাথে এ ধরনের অসদাচরণ করতে পারেন? আমরা তো এই কথা বলিনি। এসব গুজব কুৎসা বৈ কিছু নয়।" আর হক্ক তা'আলাও হযরত খালেদ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর বক্তব্যের সাথে একদম সঙ্গতিপূর্ণ আয়াতে করীমাসমূহ নাযিল করেন। তৎক্ষণাৎ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবা-এ-কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-বৃন্দকে মসজিদে সমবেত করে ওই আয়াতগুলো তেলাওয়াত করে

শোনান। এই আয়াতগুলোর বরকতে ঈমানদারবৃন্দের অন্তর সেসব সন্দেহ থেকে মুক্ত হয়, যেগুলো তাঁদের অন্তরকে পীড়া দিচ্ছিল। মিসতাহ ছিলেন হযরত আবূ বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর এক গরিব আত্মীয়। ইতিপূর্বে তিনি তাকে জীবন ধারণের জন্যে দান-সদকাহ করতেন। কিন্তু যখন মিসতাহ মোনাফেকদের সাথে এই নোংরা কাজে (গুজব রটানোয়) জড়িত হয়ে পড়েন, তখন হযরত আবূ বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) শপথ করেন, তিনি আর কখনোই তাকে দয়া-দাক্ষিণ্য করবেন না। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা সূরা নূরের ২২তম আয়াতে করীমা নাযিল করেন, যা শুনে হযরত আবূ বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, "আল্লাহ পাক আমায় ক্ষমা করলে আমি খুশি হবো।" অতঃপর তিনি আবারো মিসতাহকে আগের মতোই আর্থিক সহায়তা প্রদান করতে থাকেন। হযরত আয়েশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)-এর সুনাম অক্ষুন্ন রাখার আয়াতগুলো অবতীর্ণ হওয়ার পর মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কুৎসা রটনাকারীদেরকে 'কাযফ' (কোনো মহিলাকে অবৈধ যৌনাচারের দোষারোপ)-এর দায়ে 'হাদ্দ' তথা শাস্তির আদেশ দেন। চারজন লোকের প্রত্যেককে আশি দোররার ঘা মারা হয়। এদের মধ্যে একজন ছিল মহিলা এবং হুযূর পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর স্ত্রীর বোন। *[মা'আরিজ পুস্তকের উদ্ধৃতি এখানেই শেষ হলো]*

হযরত আয়েশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) সম্পর্কে অবতীর্ণ আয়াতে কারীমাগুলোর মধ্যে প্রথমটির ব্যাখ্যায় *'তাফসীরে মাওয়াকিব'* গ্রন্থে লেখা হয়: "নিশ্চয় ওই সব লোক, যারা (হযরত আয়েশার বিরুদ্ধে) এ 'বড় অপবাদ' নিয়ে এসেছে, তারা তোমাদেরই মধ্যকার একটি দল; সেটিকে নিজেদের জন্যে অনিষ্টকর মনে করো না; বরং তা তোমাদের জন্যে কল্যাণকর। [মানে এই অপবাদের কারণে তুমি অনেক সওয়াব অর্জন করেছো। অপবাদদাতাদের মিথ্যে প্রকাশ হয়ে পড়েছে এবং তোমার মর্যাদা আরও উন্নীত হয়েছে। এই আয়াতে কারীমা তোমার নির্দোষ হওয়ার ব্যাপারটি ঘোষণা করেছে।] তাদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে ওই পাপ রয়েছে, যা সে অর্জন করেছে; এবং তাদের মধ্যে ওই ব্যক্তি, যে সর্বাপেক্ষা বড় অংশ নিয়েছে (মানে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে), তার জন্যে মহা শাস্তি রয়েছে।" [সূরা নূর, ১১] এই সব লোকদেরকে 'হাদ্দ' (বেত্রাঘাতে শাস্তি) দেয়ার পর আবদুল্লাহ বিন আবি (সমাজে) বে-ইজ্জত হয়। হাসসান অন্ধ হয়ে যান এবং ইন্তেকাল পর্যন্ত তা-ই থাকেন। আর মিসতাহ'র এক হাত নষ্ট হয়ে যায়। বারোতম আয়াতে কারীমায় এরশাদ হয়,

لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَٰذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ.

–কেন এমন হয়নি যখন তোমরা সেটি (অপবাদ) শুনেছিলে, মুসলমান নর ও নারীরা নিজেদের (লোকদের) বিষয়ে ভালো ধারণা করতো; আর বলতো, 'এ তো স্পষ্ট অপবাদ'।[১]

১৯ নং আয়াতে এরশাদ হয়েছে,

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.

–ওই সব লোক যারা চায় যে মুসলমানদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার হোক, তাদের জন্যে মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে, দুনিয়া ও আখেরাতে।[২]

আর ২৬তম আয়াতের মানে হলো–

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ.

–অপবিত্র কথাবার্তা অপবিত্র লোকদের মুখেই মানায়। আজেবাজে মন্দ কথা বলা অপবিত্র লোকদেরই সাজে।[৩]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), হযরত আয়েশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) ও সাফওয়ান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ওই সকল নিচু মনের অধিকারী লোকদের অপবাদের বহু উর্ধ্বে অবস্থান করছেন। বেহেশতে আল্লাহর ক্ষমা ও দয়া এবং আশীর্বাদ তাঁদেরই প্রাপ্য। বস্তুতঃ সাফওয়ান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর উচ্চসিত প্রশংসা করা হয়েছে একখানা হাদিস শরীফে। আরযুরুম বিজয়ের সময় ১৭ হিজরী সালে তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

১. আল কুরআন : সূরা নূর, ২৪:১২।
২. আল কুরআন : সূরা নূর, ২৪:১৯।
৩. আল কুরআন : সূরা নূর, ২৪:২৬।

আল্লাহ পাক ওয়াদা করেন যে তিনি হযরত আয়েশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)-এর প্রতি অপবাদদাতাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি দেবেন। যেহেতু মহান রাব্বুল আলামীন নিজেই এ সব বদমাইশ লোককে তাদের প্রাপ্য অনুযায়ী জবাব দিয়েছেন, সেহেতু আমাদের আর কোনো কিছু যোগ করার প্রয়োজন নেই। তবে আমরা এক্ষণে একটি ফতোওয়া পেশ করবো, যা 'মিরা'আত আল-কায়েনাত' শীর্ষক গ্রন্থের ২৯২ পৃষ্ঠায় বিদ্যমান:

'খাসাইস উল-হাবীব' গ্রন্থে বিবৃত হয়েছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ফতোওয়া দিয়েছেন,

"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পুতঃপবিত্র স্ত্রীদের কারো প্রতি কেউ 'কাযফ' (অপবিত্রতার অপবাদ) করলে সে কাফের হয়ে যাবে এবং তার তওবা-ও কবুল হবে না।"

পক্ষান্তরে, হযরত আয়েশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)-এর প্রতি অপবিত্রতার অভিযোগের মানে হলো কুরআন আল-করীমের সাথে দ্বিমত পোষণ করা; যার ফলশ্রুতিতে এজমা' তথা ঐকমত্য অনুযায়ী কাফের বা অবিশ্বাসী হতে হবে। আর সাহাবা-এ-কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-দের মধ্যে একজনের (আমীরে মোয়াবিয়ার) মাতা (হিন্দ)-এর প্রতি দুর্বিনীত হওয়ার অপবাদ আরোপ কাযফ-এর শাস্তির চেয়েও দ্বিগুণ শাস্তি প্রতিবিধান করে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের আলাউয়ী ও শিয়া ভাইদেরকে এবং সকল মুসলমানদেরকে এ ধরনের মহাভ্রান্তিতে পড়ার কবল থেকে রক্ষা করুন, আমীন!

[৭]

হযরত আমীরে মুআবিয়াহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ও তাঁর পূর্বপুরুষদের কুৎসা রটনা এবং তার রদ

হুরুফী লেখক বলে, "উতবার মেয়ে হিন্দ, যিনি ছিলেন অসংখ্য পুরুষের প্রেমের উপাখ্যানের কুখ্যাত নায়িকা, তিনি জনৈক আবিসিনীয় দাসের সঙ্গে কাটানো ঘনিষ্ঠ মুহূর্তগুলোতে হযরত আমীরে হামযা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর (পবিত্র) কলিজা চিবিয়েছিলেন। তাঁর স্বামী ইবনে মুগীরা বেশ্যাবৃত্তির অভিযোগে তাঁকে তালাক দিয়েছিলেন এবং ওই সময় আবূ সুফিয়ান তাঁকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন। এই বিয়ে তাঁকে পরপুরুষের সান্নিধ্য লাভের অভ্যাস থেকে সরিয়ে আনতে পারেনি। তিনি তাঁর অসতীপূর্ণ জীবন যাপন বজায় রাখেন। তবে তাঁর এই বিয়ের ফলে অভিশপ্ত মোয়াবিয়ার জন্ম হয়, যাঁকে

সম্ভাব্য অন্যান্য পিতার মাঝে আবূ সুফিয়ানের পুত্র বলেই শেষমেশ সাব্যস্ত করা হয়। এই লোকটি নিষ্ঠুর এক স্বৈরশাসকে পরিণত হন এবং সর্বসাধারণের প্রতি চরম অত্যাচার-অবিচার করেন।"

এ ধরনের নোংরা ও কুরুচিপূর্ণ ভাষা ব্যবহারে যে কেউ লজ্জাবোধ করবেন, এমন কি যদি তা হয় মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে জানী দুশমনী অন্তরে পোষণকারী ও চির অভিশপ্ত শত্রু আবূ জাহেল ও ইবলিস শয়তানের ক্ষেত্রেও। তবু আল-কুরআনে যেমনটি এরশাদ হয়েছে, "অপবিত্র কথাবার্তা অপবিত্র লোকদের মুখেই মানায়", ঠিক তেমনি কারো মুখের ভাষা হলো আয়নায় তারই চেহারার প্রতিফলন। আমরা তো আর পয়ঃনিষ্কাশন প্রণালী ড্রেন থেকে সুগন্ধ আশা করতে পারি না! আল্লাহ তা'আলা যাঁদের ক্ষমা করেছেন এবং বেহেশত ও খোদায়ী আশীর্বাদ দ্বারা ধন্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তাঁদেরকে এই কদর্য ও ঘৃণ্য অপবাদমূলক লেখা হেয় প্রতিপন্ন করতে পারবে না। তবে এসব কথার উচ্চারণকারীদের নিচ ও হীন চরিত্র এই কথাবার্তা যতোই ফাঁস করুক না কেন, এসব কথাকে কিন্তু পুরোপুরি অবহেলা করা তথা জবাব না দিয়ে ফেলে রাখা যাবে না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ ফরমান, "ঈমানদারী মানুষের অতীত পাপ মোচন করে।"

এই হাদিস একটি শক্তিশালী দলিল এ মর্মে যে, হযরত আমীরে মোয়াবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ও তাঁর আশীর্বাদধন্য বাবা আবূ সুফিয়ান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এবং মক্কা বিজয়ের দিনে হুযূর পূর নূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপস্থিতিতে নিজের পবিত্রতা ও মহত্ত্ব প্রমাণকারিনী মহিলা হিন্দ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) অত্যন্ত খাঁটি ও নির্মল আত্মার ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

হযরত আমীরে মোয়াবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু), তাঁর বাবা আবূ সুফিয়ান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ও আশীর্বাদধন্য নারী হিন্দ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা), এই তিনজন সাহাবীর সদগুণাবলী সম্পর্কে অসংখ্য বইপত্র লেখা হয়েছে। এই পর্যায়ে আমরা সবার জন্যে সহজলভ্য 'কেসাস-এ-আম্বিয়া' (পয়গাম্বরবৃন্দের ইতিহাস) গ্রন্থটি থেকে কিছু উদ্ধৃতি পেশ করবো:

"আরব জাতির মাঝে পারিবারিক জীবন ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিল সুদৃঢ়। প্রত্যেক আরবীয়ই নিজ গোত্র ও আত্মীয়স্বজনের মান-সম্মান রক্ষায় থাকতেন বিস্ময়করভাবে তৎপর।"

"আরবীয় লোকেরা বাজার এলাকায় ও সভাস্থলে কবিতা আবৃত্তি করতেন এবং ধর্মীয় ভাষণ দিতেন।"

"ফখরে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফা পর্বতে আরোহণ করে সেখানে বসেন। হযরত উমর ফারূক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর পাশে কিছুটা নিচে বসেন। প্রথমে পুরুষেরা এবং তারপর মহিলারা একে একে হাজির হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। মহিলাদের মধ্যে হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর বোন উম্মে হানী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এবং হযরত মোয়াবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর মা হিন্দ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)-ও ছিলেন। রাসূল-এ-করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মহিলাদেরকে 'চুরি না করার ওয়াদা' করতে বললে হিন্দ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এগিয়ে এসে বলেন, 'আমি যদি চুরি করার মানুষ হতাম, তাহলে আবূ সুফিয়ান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর সম্পত্তি থেকে অনেক কিছুই চুরি করতাম।' এ কথায় ফখরে আলম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হিন্দকে চিনতে পারেন এবং জিজ্ঞেস করেন, 'আপনি কি হিন্দ?' জবাবে তিনি বলেন, 'আমিই হিন্দ। অতীতের (পাপের) জন্যে (আমায়) ক্ষমা করুন যাতে আল্লাহ তা'আলাও আপনাকে মাফ করেন।' রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যেনা তথা অবৈধ যৌনাচার না করার ব্যাপারে ঐশী নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে বলার পরে হিন্দ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, 'স্বাধীন কোনো নারী কি যেনা করেন?' অতঃপর মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক কারো দ্বারা আপন শিশুদের হত্যা না করার পক্ষে শরয়ী বিধান ঘোষণা করার পরে হিন্দ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, 'তারা (শিশুরা) ছিল ছোট, আর আমরা তাদেরকে বড় করেছিলাম। তারা বড় হয়েছিল, আর আপনি তাদেরকে বদর যুদ্ধে হত্যা করেন। এখন বিষয়টি আপনার ও তাদের মধ্যে (মীমাংসাধীন)।' হযরত উমর ফারূক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ছিলেন একজন কড়া ও গুরুগম্ভীর প্রকৃতির ব্যক্তি, তবু তিনিও হিন্দের এ কথায় হাসি থামাতে পারেননি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন কুৎসা রটনা না করার বিধান সম্পর্কে জানান, তখন হিন্দ বলেন, 'ওয়াল্লাহি (আল্লাহর কসম)! কুৎসা রটনা করা একটি বদমাইশি কাজ। আপনি আমাদের প্রতি সুন্দর নৈতিকতার নির্দেশ দিয়ে থাকেন।' অবশেষে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিদ্রোহ না করার পক্ষে নির্দেশনা দিলে হিন্দ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) ওয়াদা করেন, 'আমরা এই মহান নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দরবারে হাজিরা দিতে এসেছি বিদ্রোহ করার উদ্দেশ্যে নয়।' ফলে হিন্দকে

হত্যা করার ইতিপূর্বেকার নির্দেশ বাতিল হয়ে যায় এবং তাঁকে ক্ষমা করা হয়; এভাবে তিনি ঈমানদারদের কাতারে শামিল হন। তিনি তৎক্ষণাৎ বাড়ি ফিরে সবগুলো মূর্তি ভেঙ্গে ফেলেন এবং বলেন, 'আমরা আহাম্মকের মতো তোমাদেরকে এতোকাল বিশ্বাস করে এসেছি।' রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই মহিলার দ্বারা তাঁর দরবারে হাজিরা দেয়ার কারণে তাঁকে আশীর্বাদ করেন।[১]"

হিন্দ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)-এর এভাবে ক্ষমা লাভ ও ঈমান গ্রহণে অন্যান্য বিরোধিতাকারীরা যারা পালিয়ে নিরাপদ স্থানে যাওয়ার কথা বিবেচনা করছিলেন, তাঁরাও অনুপ্রেরণা পান। তাই তাঁরা ফিরে আসেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তাঁদের আরজি মঞ্জুর করা হয়। হিন্দ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)-এর সৌভাগ্য এমনই যে তাঁর কারণে অনেক মানুষ বেঁচে যান এবং ঈমানদার হতে সক্ষম হন। *'কেসাস-এ-আম্বিয়া'* গ্রন্থ হতে গৃহীত আরেকটি লাইনে বিবৃত হয়, "আবূ সুফিয়ান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ও তাঁর ছেলেরা দৃঢ় বিশ্বাসী মুসলমানে পরিণত হন। রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁদেরকে নিজের 'কাতেব' (লেখক) পদে নিয়োগ দেন।[২]"

ইসলাম ধর্মের প্রতি হযরত আমীরে মোয়াবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর খেদমত ও মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পবিত্র জবান মোবারকে উচ্চারিত তাঁর প্রশংসা বাণী সত্ত্বেও হুরুফী শিয়া গোষ্ঠী কীভাবে তাঁর প্রতি কলঙ্ক লেপন করা যায় তা-ই ভেবে পায় না। তারা তাঁর অতীত ঘেঁটে, অবিরত তাঁর পারিবারিক জীবনের খুঁত ধরে তাঁকে গালমন্দ করতে অপতৎপর। এই গালাগালের অপচেষ্টায় তারা যতোই সফল হোক না কেন, তারা তাঁর পিতা (আবূ সুফিয়ান)-কে আবূ লাহাব নামের অবিশ্বাসীর পর্যায়ে নামিয়ে আনতে পারেনি! রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি 'জানী দুশমনী' মনোভাব পোষণকারী ওই অবিশ্বাসী আবূ লাহাব, যার নামে কুরআন মজীদের একটি আয়াতও নাযিল হয়েছে, তার ছেলে উতবা ইতিপূর্বে হুযূর পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে অনেক কষ্ট দিতেন। শুধু তাই নয়, তিনি মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে আর্থিক কষ্টে ফেলার জন্যে তাঁর আশীর্বাদধন্য কন্যাকেও তালাক দিয়েছিলেন। *'কেসাস-এ-আম্বিয়া'* গ্রন্থে বিবৃত হয়:

১. কেসাস-এ-আম্বিয়া।
২. কেসাস-এ-আম্বিয়া।

> –এই উতবা-ই মক্কা বিজয়ের সময় ক্ষমা প্রার্থনা করে ঈমানদার তথা বিশ্বাসী হয়ে যান। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে ক্ষমা করেন এবং তার জন্যে আশীর্বাদস্বরূপ দোয়া করেন। হুনায়নের জিহাদে চরম সংকটকালেও উতবা হুযূর পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সামনে রক্ষীর অবস্থান থেকে সরে যাননি।

দেখুন, হুরুফী শিয়া চক্র আবূ লাহাবের মতো কট্টর অবিশ্বাসীকে পর্যন্ত সমালোচনা করে না, আর উতবাকে তার ছেলে হওয়ার জন্যেও দোষারোপ করে না; কিংবা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে কষ্ট দেয়ার কারণেও দায়ী করে না। কেননা, হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজ্‌হাহু)-কে ইসলামের প্রথম খলীফা হিসেবে যাঁরা দেখতে চেয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে উতবা ছিলেন অন্যতম। তিনি এ কথা তাঁর কবিতায় ব্যক্ত করেছিলেন। এতে বোঝা যায়, (ওই তথাকথিত ম্যাগাজিন পত্রিকায় লিপিবদ্ধ কুৎসা রটনাকারী হুরুফী) লেখক যে মাপকাঠি ব্যবহার করেছে, তা ইসলাম ধর্ম বা কুফর (অবিশ্বাস), রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর খেদমত বা তাঁকে কষ্ট দেয়ার মতো জরুরি বিবেচনাযোগ্য বিষয়গুলোর ওপর ভিত্তিশীল নয়। বরং হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-কে নির্বাচন করার বিষয়ের ওপরই সেটি ভিত্তিশীল। অতএব, সে যে জিনিসের পেছনে ছুটেছে, তা রাজনৈতিক ফায়দা বৈ কিছু নয়, আর তাই তার সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্কই নেই। বরঞ্চ তার সমস্ত অপচেষ্টাই আসহাব-এ-কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-কে বাজে এবং মিলে-মিশে চলতে অপারগ মানুষ হিসেবে বিকৃতভাবে তুলে ধরার বদ-খায়েশ হতে নিঃসৃত।

'কেসাস-এ-আম্বিয়া' গ্রন্থ থেকে ওপরে আমাদের উদ্ধৃত বিভিন্ন ভাষ্যে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে ওই 'হেমন্তের ম্যাগাজিনে' প্রকাশিত কুৎসা স্রেফ মিথ্যাচার ছাড়া কিছুই নয়। *'কামুস্ আল-আলম'* পুস্তকে লেখা আছে:

> "হিন্দ্ বিনতে উতবা বিন রাবেয়া বিনতে আব্দে শামস ছিলেন কুরাইশ বংশের একজন মহীয়সী নারী। তিনি ছিলেন আবূ সুফিয়ানের স্ত্রী। আবূ সুফিয়ানের আগে তিনি ছিলেন ফকীহ বিন মুগীরা'র স্ত্রী। তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তা শক্তভাবে আঁকড়ে ধরেন এবং সবসময়ই আচরণে নিজেকে নেককার মুসলমান হিসেবে তুলে ধরেন। তিনি ছিলেন বিচক্ষণ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন কর্ত্রী। তিনি ও তাঁর স্বামী আবূ

সুফিয়ান 'ইয়ারমুকের' জ্বিহাদে যোগ দেন; সবসময়ই তিনি মুসলমানদেরকে বাইজেন্টানীয় রোমানদের বিরুদ্ধে জ্বিহাদ করতে উৎসাহ দিতেন।"

হিন্দ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)-এর ঈমান কতোখানি সুদৃঢ় ছিল এবং সতিত্বের ব্যাপারে তাঁর নৈতিকতা কতোটুকু উচ্চে ছিল, তা সমস্ত বইপত্রে লিপিবদ্ধ আছে। ইসলামের আগেও বিয়ে এবং পারিবারিক জীবনের অস্তিত্ব ছিল।[১] হেমন্তের ম্যাগাজিনটির লেখক পারিবারিক জীবনের সাথে তার নিজের মোতা' বিয়ে নামের যৌনজীবনকে তালগোল পাকিয়ে ফেলেছে। সে নিজেকে অন্যান্যদের সাথে তুলনা করছে এবং ধরে নিচ্ছে যে তারাও বুঝি তারই মতো অবৈধ যৌনাচারী। 'মা'আরিজ-উন-নুবুওয়্যা' পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে:

"হিন্দ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) ঈমানদার হওয়ার পর এবং তাঁর ঘরে সমস্ত মূর্তি ভেঙ্গে ফেলার বাদে তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দরবারে তোহফা-হাদীয়া (উপহার)-স্বরূপ দুটি ভেড়া/দুম্বা প্রেরণ করেন। হুযূর পূর নূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ওই উপহার গ্রহণ করে হিন্দ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)-এর জন্যে দোয়া করেন। হক্ক তা'আলা (প্রতিদানে) তাঁর ভেড়ার পালের প্রতি এতো বরকত দেন যে সেগুলোর সংখ্যা জানা অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। হিন্দ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) সবসময়ই স্বীকার করতেন যে এই খোদায়ী আশীর্বাদ মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বরকতে নসীব হয়েছিল।"

মাওলানা আবদুল গনী নাবলুসী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) নিজ 'হাদীকা' গ্রন্থের ১২৬তম পৃষ্ঠায় লেখেন,

"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি ঈমান রাখেন এমন প্রত্যেক ব্যক্তিই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে কিছুটা হলেও উপলব্ধি করতে সক্ষম হন এবং তাঁর প্রতি নির্দিষ্ট মাত্রার মহব্বত পোষণ করেন। তথাপি এই উপলব্ধি ও ভালোবাসার মাত্রায় তারতম্য ঘটে থাকে। অনেক অন্তরে এই মহব্বতের প্রবাহ উপচে ওঠে। সর্বসম্মত একটি রেওয়ায়াতে বিবৃত হয়েছে যে আবূ সুফিয়ান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর স্ত্রী হিন্দ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) মহানবী

[১]. অনুগ্রহ করে এ বইয়ের ৩৬তম অধ্যায় দেখুন।

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনার পবিত্র চেহারা মোবারক আমি ইতিপূর্বে কখনো পছন্দ করতাম না। কিন্তু এখন আপনার ওই সুন্দর চেহারা আমার কাছে অন্য যে কোনো কিছুর চেয়েও প্রিয়'।"

হুরূফী লেখক অভিযোগ করে যে হযরত মোয়াবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) মানুষদের প্রতি জুলুম-অত্যাচার করেছিলেন। অথচ তাঁর খেলাফত দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনে এবং ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটায়। বিভিন্ন জ্বিহাদ ও রাজ্যবিজয়েরও সূচনা হয়। তাঁর ন্যায়বিচার ও দয়াদাক্ষিণ্যের খবর কাছে এবং দূরে পৌঁছে যায়। এ সব ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে ইতিহাসের বইপত্রে।

[৮]

হযরত আলী (ক:) প্রথম খলীফা বলে দাবি উত্থাপন ও তার রদ

হুরুফী লেখক বলে, "এমন এক মানসিকতার বীজ বপণ করা হয় যা শাসন পাকাপোক্ত করার জন্যে কুসংস্কারের জন্ম দেয় এবং এরই ফলশ্রুতিতে সুন্দর দ্বীন-ইসলামকে (ধর্মীয়) গোঁড়ামির স্রেফ একটি ব্যবস্থায় পরিণত করা হয়; আর কতিপয় উসমানীয় তুর্কী সম্রাটের অন্তর ও মস্তিষ্কে উম্মতের দরদ উথলে ওঠে। আসলে এগুলোর সবই করা হয় শিয়াদের (প্রতিহত করার) জন্যে। কেননা, শিয়ারা ঐক্যের পক্ষে কথা বলেছিল। তারা জানতো যে ঐক্যের সূচনা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)কে দিয়ে। তাদের লক্ষ্য ছিল আহলে বায়তকে ভালোবাসা। অতঃপর যখন উম্মতের হুজুগ আধিপত্য বিস্তার করে, তখন বুদ্ধিজীবী ও শিয়া সম্প্রদায় এর বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু) কি প্রথম ন্যায্যভাবে নির্বাচিত খলীফা নন?"

আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের সম্বোধন করে বলেন, 'ওহে আমার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র উম্মত (জাতি, সমাজ)!' আমাদের প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-ও বিবৃত করেন যে মুসলমান সম্প্রদায় তাঁরই উম্মত। উদাহরণস্বরূপ, তিনি এরশাদ ফরমান,

شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي.

–আমার উম্মতের বড় বড় গুনাহগারদের জন্যে হবে আমার শাফা'আত তথা সুপারিশ।[১]

এবং অন্য হাদিসে বলেন,

عُلَمَاءُ أُمَّتِيْ كَأَنْبِيَاءِ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ.

–আমার উম্মতের আলেমবৃন্দ বনী ইসরাঈল বংশের আম্বিয়া (আলাইহিমুস্ সালাম)-বৃন্দের মতো।[২]

'আমার উম্মত', এই অভিব্যক্তিটি তিনি আরও বহু হাদিস শরীফে ব্যবহার করেছেন। অপরদিকে, হুরুফী লেখক উসমানীয় সম্রাটদের সমালোচনা করে বলেছে যে তাঁরা দ্বীন-ইসলামকে স্রেফ উম্মতের একটি ব্যবস্থায় পরিণত করেন। সে উম্মতের ব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান করে এবং এটি পরবর্তীকালে প্রবর্তিত একটি ব্যবস্থা বলে ভ্রান্তভাবে উপস্থাপন করে। হুরুফী লেখকের এই কথাগুলো ইসলামের একদম পরিপন্থী এবং এগুলো হুরুফী মতবাদের পক্ষে ওকালতি করে। হুরুফীদের সকল অপকৌশলের ভিত্তিই হচ্ছে মুসলমানদের ছদ্মবেশে ইসলাম ধর্মকে আক্রমণ করা। তাদের ঐক্যের পক্ষে যে বুলি, তা জবাইয়ের জন্যে নেয়া ভেড়াকে উদ্দেশ্য করে বলা কসাইয়ের এ কথার মতোই শোনায়, 'আমি তোমাকে স্নেহ করি, আর তোমাকে ব্যথা দিতেও আমি ঘৃণা করি।' এই লেখক যে হুরুফী, মানে আবদুল্লাহ ইবনে সাবার অনুসারী, সে তা আড়াল করতে চায়; এই আবদুল্লাহ ইবনে সাবাই সর্বপ্রথম ফিতনার বীজ বপণ করে, যার দরুন মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃঘাতী সংঘাতের সৃষ্টি হয়। ইবনে সাবার অনুসারী হাসান সাব্বাহ কর্তৃক সহস্র সহস্র মুসলমান হত্যার বিস্তারিত বিবরণও লিপিবদ্ধ রয়েছে বিভিন্ন ইতিহাস পুস্তকে। এই হুরুফী লেখক যে তার লেখালেখিতে ভ্রান্ত, তা বুঝতে হাসান সাব্বাহর গণহত্যা ও বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে (ওই সমস্ত ইতিহাস) পাঠ-ই যথেষ্ট।

---

১. ক) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু মা জা'আ ফিশ্ শাফা'আত, ৮:৪৭০, হাদিস নং : ২৩৫৯।
খ) আবু দাউদ : আস্ সুনান, বাবু ফীশ্ শাফা'আত, ১২:৩৫১, হাদিস নং : ৪১১৪।
গ) তাবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবুল ওয়াযি ওয়াশ্ শাফা'আত, ১ম পরিচ্ছেদ, পৃ. ২১৬, হাদিস নং : ৫৫৯৮।
ঘ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবু মুসনাদি আনাস্ ইবনে মালেক, ২৬:২৯২, হাদিস : ১২৭৪৫।

২. মিসবাহুল আনোয়ার, ১:৮৩।

'কেসাস-এ-আম্বিয়া' গ্রন্থের ৮৮৭ পৃষ্ঠায় লেখা আছে:

–ইবনে সাবার অনুসারী হাসসান সাব্বাহ ছিল এক গোমরাহ মুলহিদ। হারামকে হালাল বলে সে অনেক মানুষকেও গোমরাহ-পথভ্রষ্ট করে। 'আলামুত' নামের দুর্গ ও এর আশপাশের এলাকা ছিল তার অনুসারীদের দ্বারা ভরপুর; আর এদের বেশির ভাগই ছিল রাহাজানির সাথে জড়িত। তারা আহল্-আস্ সুন্নাহকে 'ইয়াযীদী' বলে ডাকতো। (তাদের আখ্যায়িত) একজন ইয়াযীদীকে হত্যা করা দশজন কাফের হত্যার চেয়ে বেশি সওয়াবদায়ক বলে ধারণা করে তারা ছুরিকাঘাতে হাজী সাহেবান, বিচারকমণ্ডলী, আলেম-উলামা ও সৈন্যদের হত্যা করতো। এ লোকদেরকে বলা হয় বাতেনীয়্যা বা ইসমাঈলীয়্যা। তারা খোদা তা'আলায় অবিশ্বাসী হিংস্র প্রকৃতির লোক। পঁয়ত্রিশ বছর যাবত হাসসান সাব্বাহ বহু মানুষের প্রাণনাশ করে এবং আরও অনেককে তাদের আকীদা-বিশ্বাস হতে বিচ্যুত করে। পরিশেষে সে ৫১৮ হিজরী মোতাবেক ১১২৪খৃষ্টাব্দে জাহান্নামে গমন করে। তার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে তারই পৌত্র আহ্মদ হাসসান ৫৫৭ হিজরীতে বাতেনীয়্যাদের গোত্রপতি হয়; সে ছিল এক যিনদিক, তাদের সবার মধ্যে সবচেয়ে হীন প্রকৃতির লোক ছিল সে। মুসলমানদেরকে ধোকা দেয়ার জন্যে এই বদমাইশই সর্বপ্রথম তার অনুসারীদের 'আলাউয়ী' (শিয়া) নামে ডাকা আরম্ভ করে। ৫৫৭ হিজরী সালের ১৭ই রমজান, যে তারিখে হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু) শহীদ হন, সেই একই তারিখে হাসসান সাব্বাহ মিম্বরে আরোহণ করে বলে, "আমি হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু) কর্তৃক প্রেরিত। মুসলমানদের সবার ইমাম হলাম আমি। ইসলাম ধর্মের কোনো ভিত্তি নেই। সব কিছুই অন্তরের ওপর নির্ভরশীল। কোনো ব্যক্তির অন্তর নির্মল হলে পাপ সংঘটন তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আমি সব কিছু (তোমাদের জন্যে) হালাল করে দিলাম। তোমাদের খেয়াল-খুশিমতো জীবন যাপন করো!" অতঃপর তারা নারী-পুরুষ সবাই মিলে একসাথে মদ্যপান আরম্ভ করে। ওই দিনকে তারা নববর্ষের দিন ধার্য করে। এই গোমরাহকে তার শ্যালক ৫৬১ হিজরী সালে হত্যা করে। তার পৌত্র জালালউদ্দীন হাসসান এই গোমরাহ পথ ত্যাগ করেন। তিনি খলীফাকে জানান যে তিনি আহলুস্ সুন্নাহর মাযহাব অনুসরণ শুরু

করেছেন। হাসসান সাব্বাহর প্রকাশিত যতো বইপত্র ছিল, সবগুলোকে জড়ো করে তিনি পুড়িয়ে ফেলেন। ৬১৮ হিজরী সালে তাঁর ইন্তেকাল হয়। তাঁর ছেলে আহুন্দ আলাউদ্দীন মুহাম্মদ উত্তরাধিকারসূত্রে ইসমাঈলীয়্যা রাজ্যের সপ্তম শাসক হিসেবে অধিষ্ঠিত হয়। এই লোক পূর্বসূরীদের গোমরাহ পথ আবার গ্রহণ করে এবং হারাম কাজকে হালাল ঘোষণা করে। ৬৫২ হিজরী সালে তার পুত্র আহুন্দ রুকনউদ্দীন তাকে তার বিছানায় হত্যা করায়। অতঃপর রুকনউদ্দীন তার বাবার দ্বারা কারারুদ্ধ শিয়াপন্থী আলেম নাসিরুদ্দীন তুসীকে নিজের উজির নিয়োগ করে। কিন্তু ৬৫৪ হিজরী সালে টাল্সঅক্সিনিয়ায় মংগলরাজ হালাকু খানের ভাই তাকে হত্যা করে। হালাকু খান এসব ইসমাঈলী গোমরাহদের হত্যা করে মুসলমানদেরকে এসব যিনদিকের গ্রাস থেকে রক্ষা করে। অতঃপর আরেকবার বাস্তবায়িত হয় নিম্নের প্রবাদবাক্য, "খোদাদ্রোহী লোককে দমনের জন্যে প্রেরিত হয় বেঈমান নিষ্ঠুর লোক।"

'কামুস্ আল-আলম' শীর্ষক বিশ্বকোষ গ্রন্থে 'ইসমাঈলীয়্যা' শব্দের সংজ্ঞায় বলা হয়: "শিয়াদের মাঝে (গোপনে) অনুপ্রবেশকারী গোমরাহ দলগুলোর একটি এটি। তাদেরকে এই নামে ডাকা হয়, কেননা তারা মহান ইমাম জাফর সাদেক (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর যাহেরী জীবদ্দশাতেই মৃত্যুবরণকারী তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ইসমাঈলকে সর্বশেষ ইমাম হিসেবে মেনেছিল। আসলে তারা অনুসরণ করে ইবনে সাবাকে। তারা পুনর্জন্মে বিশ্বাস করে এবং হারামকে 'হালাল' বলে। সামান্যতম লজ্জাবোধ না করেই তারা সব ধরনের অনৈতিক কাজ সংঘটন করে। 'কারামতী' নামের গোমরাহ দল যারা অনেক মুসলমানের রক্ত ঝরিয়েছিল, তারা এবং হাসসান সাব্বাহ নামের বদমাইশ লোক, আর মিসরে ইসলাম ধর্ম নির্মূলের অপচেষ্টাকারী ফাতেমী রাষ্ট্র, এরা সবাই ছিল ইসমাঈলী। গোমরাহ দলগুলোর উগ্রপন্থীরা এবং দ্রুজ ও হুরুফীরা হলো ওই ইসমাঈলীদের পরবর্তী প্রজন্ম।" 'মুনজিদ' পুস্তকে লেখা আছে যে তারা নিজেদেরকে 'আলাউয়ী' (আলাভী) নামে সম্বোধন করে থাকে।

হুরুফীরা দাবি করে যে হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর ঐক্যে তারা বিশ্বাসী। তাদের এ যুক্তি অনুযায়ী আসহাব-এ-কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) যাঁদেরকে কুরআন

মজীদ ও হাদিস শরীফে প্রশংসা করা হয়েছে, তাঁরা সে ঐক্যের বাইরে অবস্থান করছেন। বেহেশতের সুসংবাদ দ্বারা আশীর্বাদপ্রাপ্ত ইসলামের তিনজন খলীফা এবং তিনটি মহাদেশে ইসলাম ধর্মের প্রচার-প্রসারে অবদান রেখেছেন এমন সকল বীর মোজাহিদ মুসলমানবৃন্দও হুরুফীদের দাবিকৃত ওই ঐক্যের বাইরে রয়েছেন। কিন্তু হুরুফী লেখক 'মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)' নামগুলো ব্যবহারের সময় নিজ আন্তরিকতার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। কেননা, হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু) অন্য তিনজন খলীফা এবং সকল সাহাবা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-কে ভালোবাসতেন; এমন কি তিনি যাঁদের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন, তাঁদেরও তিনি ভালোবাসতেন। তিনি যেসব ভাষণ দিয়েছিলেন এবং পাশাপাশি (মানুষের সাথে) যেসব আলাপ করেছিলেন, তাতে তিনি স্বীকার করেছিলেন যে ওই সকল পুণ্যাত্মা পরিপূর্ণ ঈমানদার এবং তিনি তাঁদের প্রশংসাও করেছিলেন। যে ব্যক্তি আলাভী নাম দ্বারা সম্মানিত, তাকেও ওই রকম হওয়া চাই। হুরুফীরা দাবি করে তারা আহলে বায়তকে অনুসরণ করে; তারা আমাদের দেশে (তুরস্কে) সুন্নী ও আলাভী উভয়ের দ্বারা ভক্তি প্রদর্শনকৃত পবিত্র আলাভী নামটি নিজেদের জন্যে মুখোশ হিসেবে ব্যবহার করে। তবে তাদের সমস্ত লেখনী ও মনোভাবই প্রতীয়মান করে যে তারা আলাভী নয়। ওই সময়কার লেখা 'তোহফা' শিরোনামের বইটি তাদের আসল উদ্দেশ্য প্রকাশের লক্ষ্যে নিম্নের তথ্য তুলে ধরেছে:

১. 'সর্ব-হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর ঐক্যের' অজুহাতে হুরুফী শিয়া গোষ্ঠী রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-কে সমতুল্য বিবেচনা করে;

২. তারা বলে, "হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-কে যে ব্যক্তি ভালোবাসে, সে বেহেশ্‌তী হবে– সে যদি ইহুদী, বা খৃষ্টান কিংবা মুশরিক-ও হয়, তাতে কিছু আসে যায় না। অপরদিকে, যারা আসহাব-এ-কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-কে ভালোবাসে তারা জাহান্নামী– তারা যতো ভালো এবাদত-বন্দেগীই করুক না কেন, অথবা আহলে বায়তকে যতো ভালোই বাসুক না কেন, তারা জাহান্নামী।"

৩. তারা দাবি করে, "যারা আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-কে ভালোবাসে, তারা পাপ করলেও ক্ষতিগ্রস্ত হবে না।"

৪. আহলুস্ সুন্নাত যাঁরা উম্মতে মারহুমা (আল্লাহর রহমতপ্রাপ্ত), তাঁদেরকে তারা উম্মতে মাল'উনা (আল্লাহর লা'নত তথা অভিসম্পাতপ্রাপ্ত) আখ্যা দেয়;

৫. হযরত উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক কুরআন মজীদ পরিবর্তিত হয়েছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করে তারা বহু আয়াতকে অস্বীকার করে;

৬. তাদের মতে কুরআন তেলাওয়াত বা যিকরের চেয়ে হযরত উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে লা'নত তথা অভিসম্পাত দেয়া বেশি সওয়াবদায়ক;

৭. তাদের দৃষ্টিতে আসহাব-এ-কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) ও যওজাত-এ-যাউয়িল ইহতেরাম (মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র বিবি সাহেবা-মণ্ডলী)-কে অভিসম্পাত দেয়া একটি ইবাদত। তারা বলে, "এই লোকদেরকে প্রতিদিন লা'নত দেয়া ফরয তথা অবশ্য কর্তব্য।"

৮. তারা বিশ্বাস করে, "সর্ব-হযরত আবূ বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ও উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে লা'নত দেয়া সত্তরটি ইবাদতের সমান।"

৯. হুরুফী শিয়াদের মতে, যেহেতু সর্ব-হযরত রোকাইয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) ও উম্মে কুলসুম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) হযরত উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে বিয়ে করেছিলেন, সেহেতু তাঁরা মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কন্যা নন;

১০. তারা দাবি করে যে সর্ব-হযরত আবূ বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু), উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ও উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) 'মোনাফিক' ছিলেন। তাই তারা এই তিন খলীফার প্রশংসাসূচক সমস্ত হাদিস অস্বীকার করে। এই হাদিসগুলো সহীহ ইসনাদসহ শাহ ওলীউল্লাহ মোহাদ্দীসে দেহেলভীর বইতে লিপিবদ্ধ আছে।

১১. যেহেতু হযরত আবূ বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) 'তামিম' গোত্রভুক্ত ছিলেন এবং হযরত উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) 'আদী' গোত্রভুক্ত ছিলেন, সেহেতু হুরুফী শিয়া গোষ্ঠী বলে যে এই দুজন মহান সাহাবী (রাদ্বিয়াল্লাহু

আনহুমা) 'গোপনে মূর্তিপূজা করতেন।' কিন্তু হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু) নিজ কন্যাকে হযরত আবূ বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর পুত্র মুহাম্মদের সাথে বিয়ে দেন এবং তাঁকে প্রাদেশিক শাসনকর্তাও নিয়োগ করেন। আর তিনি তাঁর অপর কন্যাকে হযরত উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর সাথে বিয়ে দেন। একদিকে হুরুফীরা দাবি করে 'হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু) ভুলভ্রান্তি থেকে মুক্ত', অপরদিকে তারাই আবার হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু) যে সকল ধর্মীয় ইমামের সাথে নিজ কন্যাদের বিয়ে দিয়েছিলেন এবং যাঁরা খোদ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শ্বশুর ও জামাতা ছিলেন, তাঁদের প্রতি কটূক্তি করে এবং দোষারোপ করে যে তাঁরা মোনাফেক ছিলেন।

১২. হুরুফী শিয়া চক্র মনে করে যে সুন্নী মুসলমান সমাজ বুঝি হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু) ও আহলে বায়ত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-এর প্রতি বৈরী ভাবাপন্ন। পক্ষান্তরে, সুন্নী জামাআত হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু) ও আহলে বায়ত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-কে অত্যন্ত ভালোবাসেন এবং তাঁরা বলেন যে এঁদেরকে ভালোবাসলে ঈমানদারির সাথে ইন্তেকাল হবে সবার। সুন্নীরা আরও বিশ্বাস করেন যে আল্লাহর ওলী তথা বন্ধু হতে হলে শর্ত এই যে এঁদেরকে ভালোবাসতে হবে এবং অনুসরণও করতে হবে।

১৩. হুরুফী শিয়ারা অভিযোগ করে যে সুন্নীরা হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর হন্তা ইবনে মুলজামকে ন্যায়পরায়ণ মনে করে এবং "ইমাম বোখারী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর বর্ণিত অনেক হাদিসের রাবী বা বর্ণনাকারীই হচ্ছে এই ইবনে মুলজাম।" এ অভিযোগ একেবারেই অসত্য। বোখারী শরীফে ইবনে মুলজাম বর্ণিত কোনো হাদিসই নেই।

১৪. আহলুস্ সুন্নাহর প্রতি যেহেতু তারা বৈরীভাবাপন্ন, সেহেতু তারা 'সুন্নাত' শব্দটিকেও লা'নত তথা অভিসম্পাত দেয়।

১৫. তারা বলে, কোনো ব্যক্তি নামাযে "ওয়া তা'আলা জাদ্দুকা" বাক্যটি উচ্চারণ করলে নামায বাদ হয়ে যাবে।

১৬. হুরুফী শিয়া সম্প্রদায় বলে যে সুন্নী পুণ্যাত্মা (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)-বৃন্দ হলেন "ইহুদী ও খৃষ্টানদের চেয়েও নিকৃষ্ট ও মন্দ।"

১৭. তারা দাবি করে যে তাদের সকল দল-উপদল নিজেদের মধ্যে শত্রুতা থাকা সত্ত্বেও হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-কে ভালোবাসার কারণে বেহেশ্‌ত প্রবেশাধিকার পাবে।

১৮. তারা আরও বলে, "আহলুস্ সুন্নাহ কর্তৃক শেখানো ইবাদত-বন্দেগী পালন করা জরুরি নয়।"

১৯. হুরুফী শিয়া গোষ্ঠী কোনো কাজ আরম্ভ করার সময় 'বিসমিল্লাহ' বলার পরিবর্তে (প্রথম) তিন খলীফা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-কে অভিসম্পাত দেয়। তারা এও বলে, "কোনো ব্যক্তি অসুস্থ হওয়ার পর প্রথম দুই খলীফা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর প্রতি লা'নত লেখা কাগজ নিজের সাথে বহন করলে কিম্বা ওই কাগজ পানিতে চুবিয়ে পানি পান করলে আরোগ্য লাভ করবে।"

২০. হুরুফী শিয়াদের মতানুযায়ী, সর্ব-হযরত আয়েশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) ও হাফসা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)-কে প্রতিদিন পাঁচবার লা'নত (অভিসম্পাত) দেয়া "ফরয"।

২১. তারা বলে যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) "তাঁর স্ত্রীদেরকে তালাক দেয়ার ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্বের অধিকার দিয়ে গিয়েছিলেন। তাই হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু) ওই প্রতিনিধিত্বের অধিকারবলে হযরত আয়েশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)-এর তালাক বলবৎ করেন।" অথচ কুরআন মজীদের আয়াতে করীমায় হুযূর পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পবিত্র বিবি সাহেবা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)-দেরকে তালাক দেয়ার অধিকার স্বয়ং মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কেও দেয়া হয়নি।

২২. তারা বলে, "হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু) না হলে পয়গম্বর (আলাইহিমুস্ সালাম)-বৃন্দকে সৃষ্টি করা হতো না।" কিন্তু তারা বুঝতেও পারে না যে "নবী নন এমন ব্যক্তি কোনো নবী (আলাইহিমুস্ সালাম)-এর চেয়ে উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন"– এমন কথা যে ব্যক্তি বলে, সে কাফের তথা অবিশ্বাসী হয়ে যায়।

২৩. তারা বলে, "পুনরুত্থান দিবসে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর সিদ্ধান্তের ওপর সব কিছু নির্ভর করবে।"

২৪. হুরুফী চক্রের মতে, হযরত উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) যখন শহীদ হন, তখন "ফেরেশতাবৃন্দ তিন দিনের জন্যে কারো পাপের হিসেব লিপিবদ্ধ করেননি।"

২৫. তারা বলে যে হজ্জের সময় মিনায় হাজ্বী সাহেবান যে পাথর ছোঁড়েন, তা সর্ব-হযরত আবূ বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ও উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে উদ্দেশ্য করেই তারা নিক্ষেপ করেন।

২৬. তারা দাবি করে, "দাব্বাত-উল-আরদ্ সম্পর্কিত আয়াতটির উদ্দেশ্য এ কথা জানানো যে হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু) আবার পৃথিবীতে ফিরে আসবেন।"

২৭. হুরুফী শিয়াদের মতে, এবং তাদের মিথ্যে ধর্মমতের ২২তম অনুচ্ছেদে লিখিত ধারা অনুযায়ী, কোনো হুরুফী গৃহকর্তার বাড়িতে হুরুফী মেহমান এলে তার খেদমতে গৃহকর্তার স্ত্রী-কন্যাদেরকে প্রস্তাব করা সওয়াবদায়ক কাজ। ইরানে হুরুফী পিতারা মর্জিমাফিক বিভিন্ন বাসায় বেড়াতে যায়, আর ওই সব বাসার পরিবারগুলো তাদেরকে পছন্দ করার জন্যে নারীদের পেশ করে। এতে তারা বিশ্বাস করে যে শুক্রবার রাতে (মানে বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে) যে সমস্ত শিশু গর্ভে আসবে, তাদেরকে পারসিক (ফারসী) সৈয়্যদ বলা হবে। এভাবেই ইরানে তথাকথিত অসংখ্য সৈয়্যদের ছড়াছড়ি।

২৮. আরবী যিলহাজ্জ মাসের ১৮তম দিবস হলো তাদের সবচেয়ে বড় উৎসবের দিন। ওই দিন হযরত উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর শাহাদাত হয়েছিল।

২৯. হুরুফী শিয়া গোষ্ঠী অপর যে দিনটি উদযাপন করে, তা হচ্ছে ৯ই রবিউল আউয়াল, যেদিন হযরত উমর ফারূক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) শহীদ হন।

৩০. নওরোজ দিবসও তাদের কাছে পবিত্র। বাস্তবে ওই দিনটি পারসিক অগ্নি উপাসকদের উৎসব দিবস।

৩১. হুরুফী শিয়া গোষ্ঠীর মতানুযায়ী, ফরয নামায ছাড়া বাকি সব নামায যে কোনো দিকে ফিরে আদায় করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, তারা যখন ইরানের মাশহাদ অঞ্চলে অবস্থিত ইমাম আলী রেযা (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর মাযার যেয়ারত করতে যায়, তখন তাঁর রওযার যে কোণায়ই থাকুক না কেন, তারা রওযার দিকে ফিরে নামায পড়ে। *'তোহফা-এ-এসনা আশারিয়্যা'* পুস্তকের সারসংক্ষেপমূলক বইয়ের ৩০০ পৃষ্ঠায় লেখা আছে: "তারা ইমামবৃন্দের মাযার-রওযার দিকে মুখ করে নামায পড়ে, এ কাজ করার সময় তারা চিন্তাও করে না যে তাদের পিঠ কা'বা শরীফের দিকে থাকতে পারে।"

৩২. তারা বলে, মানুষের পক্ষে যতোটুকু নগ্ন হওয়া যায় ততোটুকু দ্বারাই সে সবসময় নামায আদায় করতে পারবে। হুরুফীদের *'মিনহাজ-উস-সালেহীন'* পুস্তকে খোলামেলাভাবে লেখা হয়েছে যে তাদের মতে 'সাও'আতাইন' (দুই গোপন অঙ্গ) ব্যতিরেকে মানুষের বাকি কোনো অঙ্গপ্রত্যঙ্গই 'আওরাত' তথা ঢাকবার অঙ্গ নয়। এ বইয়ের ১৫তম সংস্করণ ১৩৮৬ হিজরী মোতাবেক ১৯৬৬ ইং সালে নজফে প্রকাশিত হয়।

৩৩. তারা দাবি করে, নামাযে দাঁড়ানো অবস্থায় পানাহার নামাযকে বিনষ্ট করবে না।

৩৪. ওপরোক্ত 'তোহফা' গ্রন্থের ২১৮ পৃষ্ঠায় লেখা আছে যে হুরুফী শিয়া চক্র শুক্রবারের জুমু'আহ নামায আদায় করে না, কিন্তু যোহর, আসর, এশা' ও রাতের নামাযগুলো সব একবারে একত্রে পড়ে থাকে।

৩৫. তাদের দলীয় দর্শনের ১৭তম অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, নিষ্পাপ ও নির্মল ইমামদের স্পর্শকৃত কোনো বস্তু কা'বা শরীফের চেয়ে হাজার হাজার গুণ বেশি মূল্যবান।

৩৬. হুরুফী শিয়ারা বলে, "পানিতে কেউ ডুব দিয়ে গোসল করলে তার রোযা নষ্ট হয়ে যাবে।"

৩৭. মুহররম মাসের ১০ তারিখে তারা আধা বেলা (দুপুর ১২টা) পর্যন্ত রোযা রাখে।

৩৮. হুরুফীরা বলে, "জিহাদ কোনো ইবাদত নয়, এর কোনো অনুমতিও নেই।"

৩৯. তারা অর্থের বিনিময়ে কোনো নারীর সাথে নির্দিষ্ট সময়কালের জন্যে সহবাস করাকে 'মোত'আ বিবাহ' বলে। তাদের মতে, এই ধরনের বিয়ের ফলে প্রচুর সওয়াব হয়। ওপরোক্ত 'তোহফা' পুস্তকের ২২৭ পৃষ্ঠায় লেখা আছে যে বেশ্যালয়ে জীবনযাপন করা, যাকে হুরুফীরা 'মোত'আ-এ-দাওরিয়্যা' আখ্যা দেয়, তা বৈধ।

৪০. তারা বলে, "কোনো জারিয়্যা (দাসী)-কে অন্য পুরুষের কাছে অর্পণ করা সহীহ (ধর্মীয়ভাবে গ্রহণযোগ্য)।"

৪১. আরবী *"মোখতাসার-এ-তোহফা-এ-এসনা-আশারিয়্যা"* গ্রন্থ, যেটি সাইয়্যেদ মাহমূদ শুকরু আলুসী ১৩০২ হিজরী সালে প্রণয়ন করেন এবং ১৩৭৩ হিজরী সালে কায়রোতে ছাপা হয়, তার ৩২৫ পৃষ্ঠায় লেখা আছে: হুরুফীদের মতে, "শৌচকর্মে ব্যবহৃত পানি দ্বারা রান্নাকৃত গোস্ত বা অনুরূপ খাবার গ্রহণ করা জায়েয (অনুমতিপ্রাপ্ত)।" হুরুফী শিয়াদের *'মিনহাজ'* শীর্ষক বইতে লেখা হয়েছে যে এসতেনজায় ব্যবহৃত পানি পরিষ্কার। অনুরূপভাবে, তারা বলে, "কিছু সংখ্যক মানুষ যে পানি দ্বারা শৌচ করে কিংবা যে পানিতে কুকুর পেশাব করে, তাও পরিষ্কার; সে পানি পান বা তা দ্বারা রান্না করা জায়েয। যে পানির অর্ধেক রক্ত বা পেশাবমিশ্রিত, তার ক্ষেত্রেও একই ফায়সালা।"

৪২. হুরুফী শিয়া চক্র বলে, "কোনো ক্ষুধার্ত ব্যক্তির পক্ষে পর্যাপ্ত রুটি আছে কিন্তু কিয়দংশ দিতেও নারাজ এমন ব্যক্তিকে হত্যা করা অনুমতিপ্রাপ্ত।"

৪৩. 'তোহফা' শিরোনামের বইয়ের ২য় অধ্যায়ে উদ্ধৃত হুরুফীদের ৭৫তম কৌশলের বর্ণনায় তারা বলে, "নামাযে সিজদা করতে হবে রোদে শুকানো মাটির ইটের ওপর। সুন্নীরা হলো শয়তানের মতো, কেননা তারা মাটির ওপর সেজদা করে না।"

৪৪. 'তোহফা' পুস্তকের সংক্ষিপ্ত সংস্করণের ২৯৯ পৃষ্ঠায় বিবৃত হয়: "খৃষ্টান সম্প্রদায়ের মানুষ যেমন হযরত ঈসা (আলাইহিস্ সালাম) ও হযরত মরিয়মের ছবি এঁকে গীর্জায় ওসব ছবির সামনে সিজদা করেন, ঠিক তেমনি হুরুফী শিয়া গোষ্ঠীর লোকেরাও ইমামবৃন্দের কাল্পনিক ছবি এঁকে

সেগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন এমন কি সিজদাও করে থাকে।" ইরান ও ইরাকে আজো তা করা হয়; তারা দাড়িবিশিষ্ট ও পাগড়িপরিহিত মানুষের কাল্পনিক ছবি এঁকে তাদের মসজিদ, বাড়িঘর ও দোকানের দেয়ালে টানিয়ে দেয় এবং সেগুলোর পূজা করে; আর তারা দাবি করে এগুলো না-কি হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এরই ছবি।

৪৫. 'তোহফা' পুস্তকের সংক্ষিপ্ত সংস্করণের ১৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে যে হুরুফীদের মধ্যে চরমপন্থী দলটি হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-কে 'খোদা' বলে দাবি করে থাকে। এই চরমপন্থী শিয়ারা আবার ২৪টি উপদলে বিভক্ত। বিংশতম উপদলটি দাবি করে, "খোদা হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু) ও তাঁর সন্তানদের মধ্যে প্রবেশ করেছেন। হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু) একজন খোদা।" এ উপদলের লোকেরা বেশির ভাগই দামেশক, আলেপ্পো ও লাযকিয়্যায় বসতি করছে। কিন্তু তুরস্কে উপদলটির ভক্তদের অস্তিত্ব নেই।

'তোহফা-এ-এসনা আশআরিয়্যা' পুস্তকটি ওপরের ৪৫টি প্যারাগ্রাফে প্রদত্ত সংক্ষিপ্ত হুরুফী বদ-আকীদাগুলোর বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছে; সেই সাথে কোন্ কোন্ বইয়ে এসব বদ-আকীদার অধিকাংশ লিপিবদ্ধ হয়েছে, সেগুলোর নামও উল্লেখ করেছে; আর প্রতিটি হুরুফী বদ-আকীদা যে ভ্রান্ত ও গোমরাহীপূর্ণ, তাও সমর্থনসূচক (শরয়ী) দলিল-আদিল্লা দ্বারা বইটি প্রমাণ করেছে। আলাভীবৃন্দ, যাঁরা হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর সম্মান ও কদর বোঝেন এবং ইসলামের প্রতি তাঁর খেদমত সম্পর্কে জানেন, তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নির্দেশিত পন্থায় আল্লাহ তা'আলার এই সিংহ (আসাদউল্লাহ)-কে ভালোবাসেন। অপরদিকে, আমরা সুন্নী মুসলমানবৃন্দও আলাভী বটে, কেননা আমরাও হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-কে ওই একই নির্দেশিত পন্থায় ভালোবাসি। অন্য যে সকল আলাভী অন্তরে তাঁর প্রতি এই ভালোবাসা রাখেন, আমরা তাঁদেরকেও ভালোবাসি। তাঁদেরকে আমরা ভাই বলে জানি। এ ভূমি (তুরস্ক) যা আমাদের ইবাদত-বন্দেগী ও শান্তি প্রতিষ্ঠার স্বাধীনতা দেয়, তাতে একে অপরকে সহযোগিতা করা ও ভালোবাসা দেশের প্রতি আমাদের বিবেকের ঋণ বলে বিবেচিত হওয়া উচিত।

ওপরে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে ইসলাম ধর্মকে অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতার মাধ্যমে ধ্বংস করতে চাওয়া ধর্ম সংস্কারক দলগুলোর মধ্যে সম্ভবতঃ সবচেয়ে

ক্ষতিকারক একটি হচ্ছে হুরুফী গোষ্ঠী। এরা আসলে (পুরোপুরি) শিয়া নয়। শিয়া সম্প্রদায় হওয়ার মানে হলো তিন খলীফা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-কে অপছন্দ করা; কিন্তু এর মানে তাঁদের প্রতি বৈরী মনোভাব পোষণ করা নয়। 'শি'য়াহ' অর্থ জামা'আত, কমিউনিটি, দল বা পার্টি। এ দলের অন্তর্ভুক্ত লোকদের বলা হয় শি'য়া।

'কেসাস-এ-আম্বিয়া' শীর্ষক পুস্তকে নিম্নের তথ্যাবলী লিপিবদ্ধ রয়েছে: আহলুস্ সুন্নাহ'র প্রতি বৈরিতা পোষণকারী প্রথম ফিতনা সৃষ্টিকারী ব্যক্তি হচ্ছে এক ইয়েমেনদেশীয় ইহুদী। তার নাম আবদুল্লাহ ইবনে সাবা'। সে মুসলমান হওয়ার ভান করেছিল। প্রথমে বসরায় গিয়ে সে তার বিষোদগার আরম্ভ করে, যার সারসংক্ষেপ হলো–

> "হযরত ঈসা (আলাইহিস্ সালাম) পৃথিবীতে ফিরবেন। তাহলে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পক্ষে একই কাজ করা সম্ভব হবে না কেন? তিনিও ফিরবেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু) দুনিয়াকে কুফর (অবিশ্বাস) থেকে রক্ষা করবেন। খেলাফতের ওপর একমাত্র হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এরই অধিকার। (অন্য) তিন খলীফা বলপ্রয়োগ করে তাঁকে তাঁর অধিকার থেকে বঞ্চিত করেন।"

এ বক্তব্যের কারণে ইবনে সাবা'কে বসরা থেকে বের করে দেয়া হয়। সে কুফায় গিয়ে মানুষজনকে গোমরাহ করতে থাকে। সেখান থেকেও তাড়িয়ে দেয়া হলে সে দামেস্ক গমন করে। সেখানে অবস্থানরত সাহাবা-এ-কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) তাকে বাধা দেন। ফলে সে মিসরে পালিয়ে যায়। সেখানে কিছু নিচু ও উগ্রপন্থী দস্যু প্রকৃতির লোককে সে সহযোগী হিসেবে পায়; এদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল খালেদ বিন মুলজেম, সুদান বিন হামরান, গাফিকী বিন হারব ও কেনানা বিন বিশরের মতো লোক। ইবনে সাবা' নিজেকে আহলে বায়তের ভক্ত-অনুরক্ত হিসেবে উপস্থাপন করে। মানুষজনকে ধোকা দেয়ার জন্যে প্রথমে যে কাজটি সে করেছিল, তা হলো এই পরামর্শ দেয়া–

> "হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর প্রতি মহব্বত রাখো এবং যারা তাঁর বিরোধিতা করেছিলেন, তাঁদের প্রতি বৈরিভাব পোষণ করো।"

লোকেরা তার কথায় বিশ্বাস করার পর সে আরেক ধাপ এগিয়ে বলে,

"আম্বিয়া (আলাইহিমুস্ সালাম)-এর পরে হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-ই সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী ব্যক্তি। তিনি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাহায্যকারী, ভাই ও জামাই।"

বিভিন্ন আয়াতে করীমার ভুল ব্যাখ্যা ও বিকৃত অর্থ আরোপ এবং জাল হাদিস বর্ণনা করে সে মানুষদেরকে বিভ্রান্ত করতো। যেসব লোক এ রকম কাজ করে তাদের বলা হয় যিনদিক্ব। লোকজন যারা তার কথায় পথভ্রষ্ট হয়েছিল, তাদেরকে বিভ্রান্ত করতে তার চূড়ান্ত বক্তব্য ছিল–

"মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আদেশ করেছিলেন হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু) তাঁর পরে খলীফা হবেন। সাহাবা-এ-কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) সে আদেশ অমান্য করেন। তাঁরা হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-কে তাঁর অধিকার থেকে বঞ্চিত করেন। তাঁরা দুনিয়াবী লাভের জন্যে নিজেদের ঈমান বিক্রি করে দেন।"

এ বদ-আকীদা প্রচারের সময় ইবনে সাবা' খুব সাবধানী ছিল তার অনুসারীদের এ ব্যাপারে সতর্ক করতো যে, তারা যেন অপরিচিতদের কাছে গোপনীয় এসব কথা প্রকাশ না করে; কেননা তার উদ্দেশ্য ছিল "খ্যাতি অর্জন নয়, বরং মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করা।" এভাবে সে খলীফা হযরত উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর শাহাদাতের কারণ হয়। এরপর সে হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর সেনাবাহিনীতে তিন খলীফার প্রতি বিদ্বেষ ছড়াতে চেষ্টা করে। সে এতেও সফল হয়। তাকে যারা অনুসরণ আরম্ভ করে, তাদের বলা হতো 'সাবা'ইয়্যা' [এবং পরে এদেরকে হুরুফী নামে ডাকা হয়]। তাদের গুজব সম্পর্কে জেনে হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু) মিম্বরে আরোহণ করে তিন খলীফা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-এর কুৎসা রটনাকারী লোকদের কড়া সমালোচনা করেন। তাদের কাউকে কাউকে তিনি বেত্রাঘাতের হুমকিও দেন। নিজের সাফল্য দেখে ইবনে সাবা' এই পরিস্থিতিরও ফায়দা লুটার চেষ্টা করে। সে গোপনে হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর কারামত তথা অলৌকিক কর্মগুলোকে তার পছন্দকৃত লোকদের কাছে বর্ণনা করে এবং এগুলোকে "হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর অর্জিত অলৌকিকত্ব" বলে ব্যাখ্যা করে 'সাকর-এ-তরীকত' নামে খ্যাত আধ্যাত্মিক

অবস্থায় খলীফারই উচ্চারিত কথাবার্তা উপস্থাপন করে "তিনি খোদা হওয়ার" আলামত মর্মে এটিকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করে। হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-ও এ বিষয়টির মোকাবেলায় জ্ঞানের পরিচয় দেন। তিনি ঘোষণা করেন তিনি ইবনে সাবা' ও তার বিভ্রান্ত অনুসারীদের পুড়িয়ে মারবেন। তিনি তাদেরকে মাদায়েন শহরে নির্বাসিত করেন। ইবনে সাবা' সেখানেও ক্ষান্ত হয়নি। ইরাক ও আযারবায়জানে অনুসারী পাঠিয়ে সে আসহাব-এ-কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-এর প্রতি বিদ্বেষ প্রচার অব্যাহত রাখে। হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু) ওই সময় দামেস্কীয় বিদ্রোহীদের দমনে ছিলেন ব্যতিব্যস্ত। তাই তিনি 'সাবা'ইয়্যা'দের বিরুদ্ধে সংগ্রাম বা খলীফার (প্রশাসনিক) দায়িত্ব পালন কোনোটাই ঠিকমতো করতে পারেননি।

[৯]

হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর সাথে সাহাবাবৃন্দের বিরোধ ছিলো ইজতেহাদী পার্থক্য হতে

প্রশ্ন: হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু) যদি জামাল (উট) ও সিফফিনের যুদ্ধে তাঁর বিরোধিতাকারী সাহাবী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-বৃন্দের সাথে সন্ধি করতেন এবং যুদ্ধ না করতেন, আর তাঁর ওই সকল দ্বীনী ভাইদের সাথে একতাবদ্ধ হতেন ও তাঁদেরকে সহযোগিতা করতেন এবং ইবনে সাবা' ও তার অনুসারীদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে যুদ্ধ করতেন, তাহলে তিনি ইসলামের যে খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন তার সাথে আরও একটি খেদমত যোগ করতে পারতেন। ফলে সারা ইসলামী ইতিহাসে রক্তপাতের হোতা যে সাবা'ইয়্যা গোষ্ঠী, তারা নির্মূল হয়ে যেতো। এই প্রশ্নের উত্তর কীভাবে দেবেন?

উত্তর: হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর ইজতেহাদ ওরকম ছিল না। আল্লাহ তা'আলা যে ভাগ্য (তাকদীর) নির্ধারণ করে রেখেছিলেন, তা-ই তাঁর কলবে (অন্তরে) প্রক্ষিপ্ত বা অন্তর্নিবেশিত হয়েছিল। এমতাবস্থায় তিনি সে কদর-এ-এলাহী মাঝে আত্মসমর্পণ করেন। আহলুস্ সুন্নাহর জ্ঞান বিশারদবৃন্দ ব্যাখ্যা করেন যে হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-ই সঠিক ছিলেন। (পরবর্তীকালে) একই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন (উসমানীয় তুর্কী) খলীফা ২য় আবদুল হামীদ খান (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)। যখন লুণ্ঠনকারীদের এক বিশাল বাহিনী মেইসনীয় যিনদিকচক্রের পরিকল্পনানুযায়ী তাঁকে ক্ষমতা থেকে সরানোর উদ্দেশ্যে রাজপ্রাসাদের দিকে যাত্রা করে, তখন ইস্তাম্বুলে অবস্থিত সেনাবাহিনীর

জেনারেলবৃন্দ তা প্রতিহত করার পরামর্শ তাঁকে দেন। ওই সময় ইস্তাম্বুলের ব্যারাকগুলো প্রশিক্ষিত সৈন্য দ্বারা পূর্ণ ছিল। তবু আবদুল হামীদ খান হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর অনুকরণ করেন এবং কদর-এ-এলাহীতে আত্মসমর্পণ করেন। তিনি বিদ্রোহীদের প্রতিহত করেননি। ফলে তাঁর এবং সহস্র সহস্র মুসলমানের ওপর প্রতিশোধ নেয়ার ইউনিয়ন-দলীয় পরিকল্পনা তিনি নস্যাৎ করে দেন।

হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)'র সময়ে প্রতিদিনই বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং এরই ফলস্বরূপ তাঁর বাহিনী চারটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে:

১. প্রথম দলটি ছিল শি'য়াহ, যারা হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-কে অনুসরণ করেছিলেন। তাঁরা আসহাব-এ-কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-এর কারো প্রতি সমালোচনা করেননি। পক্ষান্তরে, তাঁরা সাহাবা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-দের সম্পর্কে মহব্বত ও ভক্তিসহ কথা বলতেন। তাঁরা শয়তানের ওয়াসওয়াসা হতে উদ্ভূত সন্দেহ মুক্ত ছিলেন। তাঁরা যাঁদের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে গিয়েছিলেন তাঁদেরকে তাঁরা নিজের ভাইয়ের মতোই মনে করতেন। (অল্পকাল পরেই) তাঁরা ওই যুদ্ধ বন্ধ করে দেন। হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু) তাঁদের এ বিচার-বিবেচনাকে গ্রহণ করে নেন। 'শি'য়াহ' নামটি এ দলের প্রতি আরোপ করা হয় প্রথমে, আর যাঁরা এ দলকে অনুসরণ করতেন, তাঁদের বলা হতো 'আহল-আস্ সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত'।

২. দ্বিতীয় দলটি যারা হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-কে অন্যান্য সাহাবী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-দের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করতো, তাদের ডাকা হতো 'তাফদিলিয়্যা'। হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু) তাদেরকে এ থেকে নিবৃত্ত করতে শাস্তিস্বরূপ বেত্রাঘাতের হুমকি পর্যন্ত প্রদান করেন। বর্তমানে শি'য়াহ শব্দটি এ দলেরই প্রতি আরোপিত।

৩. তৃতীয় দলটি দাবি করে সকল সাহাবা-এ-কেরাম (রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন)-ই পাপিষ্ঠ ও অবিশ্বাসী। এদের 'সাবা'ইয়্যা' বা 'হুরুফী' নামে ডাকা হয়।

৪. চতুর্থ দলটির নাম 'গুলাত'; এরাই সবচেয়ে অযৌক্তিক ও গোমরাহ-পথভ্রষ্ট ছিল। তারা দাবি করতো যে আল্লাহ তা'আলা হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর মাঝে প্রবেশ করেছিলেন।

হযরত ইমাম হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর পুত্র ইমাম যাইনুল আবেদীন আলী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) ৯৪ হিজরী সালে যখন ৪৮ বছর বয়সে বেসালপ্রাপ্ত হন, তখন তাঁর পুত্র যায়দ বিন আলী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) খলীফা হিশামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং একটি সৈন্যদলসহ কুফা গমন করেন। কিন্তু তাঁর সৈন্যদের হযরতে আসহাব-এ-কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-কে গালি দিতে দেখে তিনি তাদেরকে তা বন্ধ করতে বলেন। এতে তাঁর অধিকাংশ সৈন্যই দলত্যাগ করে। তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত থেকে যাওয়া গুটিকয়েক সৈন্যকে সাথে নিয়ে যুদ্ধ করতে করতে অবশেষে তিনি ১২২ হিজরী সালে শাহাদাত বরণ করেন। যারা তাঁকে ত্যাগ করেছিল, তারা নিজেদের 'ইমামিয়্যা' নামে ডাকতো। আর তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত যোদ্ধাদের বলা হতো 'যায়দিয়্যা'।

আহলুস্ সুন্নাহ যাঁরা হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর 'শি'আহ' ছিলেন, তাঁদের দৃষ্টিতে হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-ই ছিলেন তাঁর সময়কার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। খেলাফত ছিল তাঁরই হক্ক। তাঁর সাথে যারা দ্বিমত পোষণ করেছিল তারা ছিল ভ্রান্ত এবং তারা 'বাগী' (খলীফার প্রতি বিদ্রোহী) হয়ে যায়। সর্ব-হযরত আয়েশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা), তালহা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু), যুবায়র (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু), মো'আবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু), আমর ইবনে আস্ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ও অন্যান্য সাহাবাবৃন্দ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) যাঁরা হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন, তাঁরা খেলাফতের পদের জন্যে তা করেননি। তাঁরা হযরত উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-এর খুনীদের খুঁজে না পাওয়া ও তাদেরকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় না করানোর প্রতিবাদ করেছিলেন মাত্র। তাঁরা একটি ঐকমত্যে তথা সন্ধিতে প্রায় পৌঁছেই গিয়েছিলেন, যখন আবদুল্লাহ ইবনে সাবা' ও তার লোকেরা (ষড়যন্ত্র করে) যুদ্ধ বাধিয়ে দেয়; এরপর যা ঘটে তা ইতিহাসে ঠাঁই পেয়েছে। সকল সাহাবা-এ-কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) যাঁরা হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন, তাঁরা বলেছিলেন যে খেলাফত হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এরই হক্ক ছিল এবং তিনি তাঁদের

চেয়ে শ্রেষ্ঠতর। তাঁরা তাঁর ভূয়সী প্রশংসাও করেন। আর হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-ও তাঁর সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া সাহাবা-এ-কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-কে মহব্বত করতেন এবং তাঁদের প্রশংসা করতেন।

[১০]

বিরোধিতাকারী সাহাবাবৃন্দ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) ধর্মত্যাগী ছিলেন না

হুরুফী শিয়া চক্র বলে, "আহলে বায়ত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-বৃন্দ আসহাব-এ-কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-এর প্রতি তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করেন এবং তাঁদের দ্বারা পরিচালিত জুলূম-অত্যাচারের ব্যাপারে আফসোস করেন।" হুরুফীরা এ-ও যোগ করে, "অধিকাংশ সাহাবা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম), বিশেষ করে (হযরত) মো'আবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ও তাঁর পিতা (আবূ সুফিয়ান) এবং (হযরত) আমর ইবনে আস্ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) মুরতাদ্দ (ধর্মত্যাগী) ছিলেন; আর যারা এসব ধর্মত্যাগীকে ভালোবাসে এবং তাদের প্রশংসা করে, তারাও তাদের সাথে একত্রে জাহান্নামে যাবে।" এ কথা সত্য যে সাহাবা-এ-কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-এর পরে কিছু শাসক নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন ও জুলূম-অত্যাচার করেছিল। কিন্তু উমাইয়্যা আমলে পরিচালিত এ ধরনের নির্যাতন-নিপীড়নের চেয়ে আব্বাসীয় আমলে পরিচালিত অত্যাচারের মাত্রা অনেক বেশি ছিল। আহলে বায়তের কয়েকজন ইমাম ওই সব শাসকের সমালোচনা করেন। অথচ হুরুফী শিয়া গোষ্ঠী আহলে বায়তের ইমামবৃন্দের এ সমালোচনাকে বিকৃত করে এমনভাবে উপস্থাপন করে যেন এগুলো সাহাবা-এ-কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-এরই প্রতি করা হয়েছিল। আহলে বায়ত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) ও আসহাব-এ-কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) উভয়ের সাথেই হুরুফীদের এ আচরণটি বিশ্বাসঘাতকতার পরিচায়ক।

আহলে সুন্নাতের উলামাবৃন্দ আসহাব-এ-কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-কে সমালোচনা করে নানা বইপত্র লিখেছেন এমন বিকৃত তথ্য উপস্থাপন করে হুরুফী শিয়া গোষ্ঠী অজ্ঞদেরকে পথভ্রষ্ট করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, ব্যাখ্যামূলক বইটির লেখক স্বয়ং 'তাফদিলিয়্যা' (২য় দলসম্পর্কিত ওপরের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) ও 'মো'তাযিলা' গোষ্ঠীর সমর্থক। অপরদিকে, আহতাব হারেযমী হচ্ছে সীমাছাড়া যায়দী (শিয়া)। *'মা'আরিফ'* পুস্তকের লেখক ইবনে কুতায়বা, আর *'নাহজুল বালাগাহ'* পুস্তকের ওপর ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থপ্রণেতা ইবনে আবিল হাদীদ উভয়ই মো'তাযিলা সম্প্রদায়ভুক্ত। তাফসীর-রচয়িতা হিশাম কালাবী

হলো একজন বেদআতী। 'মুরাউয়ীজুয্ যাহাব' পুস্তকপ্রণেতা মাস'উদী, 'আগ্বানী' গ্রন্থের লেখক আবূল ফারাজ ইসফাহানী এবং 'রিয়াদুন্ নাদারা' বইয়ের রচয়িতা আহমদ তাবারী গং ছিল আহলে সুন্নাতের প্রতি উগ্র দুশমনিভাব পোষণকারী। এদেরকেই এখন আহলে সুন্নাতের উলামা-মণ্ডলী হিসেবে উপস্থাপনের চেষ্টা চলছে, আর এর দরুন তরুণ প্রজন্ম প্রতারিত হচ্ছে। তাদের এই ধোকাবাজি বহাল রাখার জন্যে তারা এ তথ্য প্রকাশ করে না যে তারা বেদআতী। তাদের বেশির ভাগই সম্পূর্ণভাবে ছদ্মবেশ ধারণ করে সুন্নী হওয়ার ভান করে। তারা আহলে সুন্নাতের উলামাবৃন্দের প্রশংসা করে, অথচ এর পাশাপাশি উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন সাহাবী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-বৃন্দকেও গালমন্দ করে। আর তারা দলীল-আদীল্লার নামে আমরা ওপরে যেসব বইয়ের নাম উল্লেখ করেছি, সেগুলোর হাওয়ালা দেয়। এমতাবস্থায় মুসলমানদেরকে অত্যন্ত সক্রিয় হতে হবে। এসব বিকৃত বইয়ের অনুবাদ বা তা হতে উদ্ধৃতি যে সকল বইপত্রে বা ম্যাগাজিনে দেয়া হয়, তা যেন তাঁরা না পড়েন। ইসলাম-ধর্ম ও আহলে সুন্নাতের উলেমাবৃন্দের প্রশংসায় যতো নিষ্ঠাপূর্ণই দৃশ্যমান হোক না কেন, ওই সব তথাকথিত বইয়ের উদ্ধৃতিসম্বলিত কোনো বইকে বিষস্বরূপ জানতে হবে; যিনদিকদের দ্বারা পর্দার অন্তরালে তৈরি ফাঁদ মনে করতে হবে, যে ফাঁদের একমাত্র লক্ষ্য হলো অন্তর্ঘাতে দ্বীন-ইসলামের ধ্বংস সাধন।

সুদ্দী নামে দুজন ধর্মীয় পদে সমাসীন ব্যক্তি রয়েছেন। একজন হলেন ইসমাঈল কুফী, যিনি সুন্নী। অপরজন, সগীর ডাকনামে যার প্রসিদ্ধি, সে এক গোঁড়াপন্থী বেদআতী। ইবনে কুতায়বা নামেরও দুজন রয়েছেন। ইবরাহীম ইবনে কুতায়বা হলো বেদআতী। অপরদিকে আবদুল্লাহ বিন মুসলিম বিন কুতায়বা হলেন সুন্নী। এই দুজনেরই 'মা'আরিফ' শীর্ষক দুটি বই আছে। এ রকম আরও দুজনের নাম মুহাম্মদ ইবনে জারির তাবারী। এঁদের একজন সুন্নী এবং মহা একখানা ইতিহাসগ্রন্থ-প্রণেতা। অপরজন বেদআতী। 'তাবারী' নামের ইতিহাস-পুস্তকটি আলী শিমশাতী নামের এক বেদআতী কর্তৃক সংক্ষেপিত হয়।

'তোহফা-এ-এসনা আশারিয়্যা' শীর্ষক বইটি হুরুফীদের ২৭তম মিথ্যাচারকে উদ্ধৃত করে।

[১১]

খলীফা হারুনুর রশীদের দরবারে এক জারিয়্যা তরুণীসম্পর্কিত বানোয়াট কাহিনি

হুরুফীরা বলে, "এক কৃষ্ণবর্ণের জারিয়্যা তরুণী খলীফা হারুনুর রশীদের দরবারে শি'আহ মতবাদের প্রশংসা করেন এবং আহলে সুন্নাহ'র তীব্র সমালোচনা করেন। সেখানে আহলে সুন্নাতের অনেক জ্ঞান বিশারদ উপস্থিত ছিলেন, যাঁদের মধ্যে কাজী আবূ ইউসূফ অন্যতম। তাঁদের কেউই তাঁকে জবাব দিতে পারেননি।"

হুরুফীদের বানোয়াট কাহিনিতে তরুণীর নামটি ছিল হুসনিয়্যা। বর্তমানে তার নামে 'হুসনিয়্যা' শীর্ষক একখানি বই সারা আনাতোলিয়া-জুড়ে বিক্রি হচ্ছে। কিন্তু তাদের প্রত্যাশার পরিপন্থী এই কাহিনি তাদেরই আলেমদের গোমরাহীমূলক মতবাদের জন্যে অপমানসূচক। কেননা, এটি স্বাভাবিকভাবে মানুষকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত করে যে "বহু শতাব্দী ধরে এসব লোক ওই কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে পারেনি, যা জারিয়্যাটি পেরেছিল; জারিয়্যা যেভাবে ওই বিতর্কে সুন্নী আলেমদের হারিয়েছিল, সেভাবে কোনো বিতর্কেই তারা সুন্নী আলেমদের খণ্ডন করতে পারেনি। তারা সবসময় পরাজিত হয়েছে। তারা যদি জারিয়্যাটির কৌশল আগেভাগেই শিখে রাখতো, তাহলে তারা এই বিব্রতকর পরিস্থিতি হতে নিজেদের রক্ষা করতে পারতো।" হুসনিয়্যা শীর্ষক পুস্তকের লেখক ছিল মুরতাদা নামের এক লোক। এই লোকটি যে ইহুদী হতে নও-মুসলিম হয়েছিল, তা লেখা আছে 'আসমাউল মু'আল্লেফীন' শীর্ষক কেতাবে।

[১২]

আবদুল্লাহ ইবনে সাবা' ও তার অনুসারী শিয়াদের ষড়যন্ত্র

হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর শাহাদাতের পর ইবনে সাবা' নামের ইহুদীর অনুসারীরা ইমাম হাসান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে সমর্থনকারী মুসলমানদের দলে সুকৌশলে অনুপ্রবেশ করে। এরকম চল্লিশ হাজার লোক তাঁকে খলীফা নির্বাচিত করে এবং হযরত আমীরে মোআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর সাথে যুদ্ধ করার প্ররোচনা দেয়। হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর সাথে তারা যে আচরণ করেছিল এবং তাঁকে শহীদ করেছিল, তাদের একই উদ্দেশ্য ছিল হযরত হাসান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর বেলায়ও। তারা তাঁর সাথে দুর্ব্যবহার করেছিল। বস্তুতঃ মোখতার সাকাফী এরকম এক

ঘটনায় তাঁর পবিত্র কদম মোবারকের নিচ থেকে জায়নামায টেনে সরিয়ে নিয়েছিল। আরেক ঘটনায় এক লা'নতী দুর্বৃত্ত তাঁর পবিত্র পায়ে কুড়াল দ্বারা আঘাত করেছিল। উভয় সৈন্যবাহিনী যুদ্ধে অবতীর্ণ হলে হযরত মো'আবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর বাহিনী জিতে যাচ্ছে দেখে তারা হযরত হাসান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর বাহিনীকে ত্যাগ করে। মুরতাদা নামে তাদেরই এক যিনদিক লোক নিজের *'তানযিহুল আম্বিয়া'* শীর্ষক পুস্তকে নির্লজ্জভাবে তাদের এই বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে বর্ণনা দিয়েছে। বস্তুতঃ তাদের *'কিতাবুল ফুসূল'* শীর্ষক বইয়ে বর্ণিত আছে যে ইবনে সাবা'র অনুসারীরা যারা প্রথমে হযরত হাসান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর দলে ছিল, তারা হযরত মো'আবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে চিঠি লিখেছিল এ কথা বলে, "এক্ষুণি আক্রমণ করুন! আমরা হাসান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে আপনার হাতে ছেড়ে দেবো।" এসব বদমাইশদের বদ-উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে হযরত হাসান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) সন্ধির প্রস্তাব করেন। হযরত আমীরে মো'আবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) যিনি হযরত হাসান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর পবিত্র দেহ মোবারকে কোনো আঘাতপ্রাপ্তির ব্যাপারে শঙ্কিত ছিলেন, তিনি জবাবে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে হযরত হাসান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর দেয়া যে কোনো শর্ত মেনে নেয়ার ক্ষেত্রে তিনি প্রস্তুত বলে জানান।

[১৩]

শিয়াদের ষড়যন্ত্রের ইতিহাস

হযরত আমীরে মোয়াবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর শাসনামলের পরবর্তী সময়েও এই শিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের বদমাইশিপূর্ণ কর্মকাণ্ড বন্ধ করেনি। কেননা ইসলামের মধ্যে অন্তর্ঘাত হানার সেটি-ই সেরা সময় ছিল। তারা হযরত হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাছে তাঁর খেলাফতের অধিকারের প্রতি সমর্থন জানিয়ে একখানা পত্র প্রেরণ করে। তারা তাঁকে মক্কা মোয়াযযমা হতে কুফায় আসার আমন্ত্রণ জানায়। এ প্রসঙ্গে *'কেসাস-এ-আম্বিয়া'* গ্রন্থে লেখা আছে:

> –ইমাম হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)'র কুফা গমনে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) অনুমোদন না করে তাঁকে তা হতে বিরত রাখার চেষ্টা করেন। কিন্তু হযরত ইমাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর কথায় কর্ণপাত করেননি। এমতাবস্থায় হযরত ইবনে উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) অশ্রুসিক্ত নয়নে তাঁকে বিদায় জানান। অতঃপর

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর পালা এলে তিনি বলেন, "ওহে চাচাতো ভাই! আমি আশঙ্কা করি কুফাবাসী তোমাকে আঘাত দিতে পারে। তারা বিদ্বেষভাবাপন্ন লোক। ওখানে যেয়ো না! কোথাও যদি যেতেই হয়, তবে ইয়েমেনে যাও!" ইমাম হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) জবাবে বলেন, "আপনি সঠিক বলেছেন। কিন্তু আমি কুফায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।" হযরত ইবনে আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এ কথাকে অনুমোদন না করে বলেন, "অন্ততঃ তোমার পরিবার-সদস্যদের সাথে নিও না। আমি শঙ্কিত যে হযরত উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর মতোই তোমাকেও তোমার সন্তানদের সামনে শহীদ করা হতে পারে।" হযরত ইমাম হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এই উপদেশের প্রতিও কর্ণপাত করেননি।

'কেসাস-এ-আম্বিয়া' গ্রন্থ হতে উদ্ধৃত এসব বক্তব্য প্রতীয়মান করে যে মক্কা মোয়াযমায় অবস্থানরত সাহাবা-এ-কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) জানতেন ইমাম হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে কুফায় আমন্ত্রণকারী লোকেরা বৈরীভাবাপন্ন ছিল এবং তারা তাঁকে ধোকা দিয়ে ফাঁদে ফেলার অসৎ উদ্দেশ্যেই সেই আমন্ত্রণ জানিয়েছিল।

[১৪]

হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর শাহাদাতের পরে খেলাফতের যোগ্য ছিলেন আমীরে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)

আহলে সুন্নাতের উলেমাবৃন্দ জানান যে হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর শাহাদাতের পরে খেলাফতের অধিকার ছিল ইমাম হাসান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর। তিনি নিজের ইচ্ছাতেই ওই অধিকার হযরত আমীরে মোয়াবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাছে ছেড়ে দেন। কেননা ওই সময় আমীরে মোয়াবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-ই খেলাফতের জন্যে সবচেয়ে যোগ্য ছিলেন। ইমাম হাসান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) খেলাফতের পদটি ভয়ে বা একা হওয়ার কারণে ত্যাগ করেননি, বরং মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত এড়াতে এবং ঈমানদারদের প্রতি সীমাহীন দয়াপরবশ হয়েই তিনি এ কাজ করেছিলেন। ফিতনা এড়ানোর জন্যে অবিশ্বাসী বা ধর্মত্যাগীদের সাথে শান্তি স্থাপনের কোনো অনুমতি ইসলামে নেই। তাদেরকে জয়মাল্য পরানোর ক্ষতি বহন করে যুদ্ধ বন্ধ করা সর্বনিকৃষ্ট ফিতনা বটে। তবু (ওই ধরনের

পরিস্থিতিতে) বিদ্রোহীদের সাথে আপোস করার অনুমতি আছে। ওই সময় পর্যন্ত হযরত আমীরে মোয়াবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর অবস্থা ছিল একজন বিদ্রোহীর মতোই। সেই বছর তিনি অধিকারবলে খলীফা পদে অধিষ্ঠিত হন। কোনো 'বাগী' (বিদ্রোহী)-কে লা'নত তথা অভিসম্পাত দেয়া যায় না। বরঞ্চ তাঁর জন্যে আশীর্বাদ চেয়ে দোয়া করতে হয় যাতে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে 'ক্ষমা' করে দেন। আল-কুরআনের সূরা মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ১৯ নং আয়াতে এরশাদ হয়েছে–

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ ۝

–হে মাহবুব! আপন খাস্ লোকদের এবং মুসলমান পুরুষ ও নারীদের পাপরাশির (জন্যে) এস্তেগফার তথা ক্ষমা প্রার্থনা করুন (মানে সুপারিশ করুন)।[১]

'এস্তেগফার'-এর আদেশের অর্থ হলো অভিসম্পাতকে নিষেধ করা। মহাপাপীদের জন্যে এস্তেগফার করতে এ আয়াতটি আদেশ করে। মন্দ কর্মকে অভিসম্পাত দেয়া হয়তো জায়েয হতে পারে, কিন্তু এতে প্রমাণিত হয় না যে পাপীকে লা'নত দেয়াও জায়েয। সূরা হাশরের ১০নং আয়াতে করীমায় উদ্দেশ্য করা হয়েছে–

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ.

–(তোমাদের) পূর্ববর্তী ঈমানদারদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করো না; বরং তাঁদের শুভকামনায় দোয়া করো।[২]

এ তথ্যটি এমন কি শিয়াদের বইপত্রেও লেখা আছে যে হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু) দামেস্কীয় মুসলমানদেরকে লা'নত দিতে বারণ করেছিলেন। এতে তাঁরা যে মুসলমান, তার আভাস পাওয়া যায়। একটি হাদিস শরীফে হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-কে সম্বোধন করে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ ফরমান, –তোমার সাথে যুদ্ধ করা মানে আমার সাথেই যুদ্ধ করা।

---

১. আল কুরআন : সূরা মুহাম্মদ, ৪৭:২৯।
২. আল কুরআন : সূরা হাশর, ৫৯:১০।

তবু এ হাদিস শরীফে ওই সকল মহান ব্যক্তির সাথে যুদ্ধ করার ঝুঁকি সম্পর্কে সতর্কীকরণই উদ্দেশ্য করা হয়েছে কেবল। আমাদের এ বইয়ের একচল্লিশতম অধ্যায়ে এই হাদিস শরীফের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। বাস্তবে হযরত আমীরে মোয়াবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ও তাঁর উত্তরাধিকারীদের (উমাইয়াদের) গ্রহণকৃত এ পদটি ছিল আমীর বা শাসকের। তাঁরা খলীফার তিনটি ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্বের মধ্যে একটি পালন করছিলেন মাত্র।

[১৫]

আমীরে মুআবিয়া (রা:)-এর অধীনস্থদের অযোগ্যতার অভিযোগ ও তার রদ

হুরুফী বইপত্রে বিবৃত হয়েছে যে হযরত আমীরে মো'আবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর প্রাদেশিক শাসনকর্তাবর্গ মানুষের প্রতি জুলুম-অত্যাচার করতো। এদের একজন হলো শিরাযের শাসনকর্তা যিয়াদ। সে ছিল আবূ সুফিয়ান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর অবৈধ সন্তান; তার মাতার নাম সুমাইয়্যা, যিনি জাহেলীয়্যা যুগে হারিস নামের এক ডাক্তারের দাসী-উপপত্নী ছিলেন। যিয়াদ বড় হওয়ার সময় তার মহৎ আচরণ, বাগ্মিতা ও বুদ্ধিমত্তার জন্যে সুখ্যাতি লাভ করে। তদানীন্তন আরবের প্রতিভাধরদের মধ্যে অন্যতম হযরত আমর ইবনে আস্ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) তার সম্পর্কে বলেন, "এ বাচ্চা কুরায়শী হলে সে এক মহান ব্যক্তিতে পরিণত হতো।" হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-ও তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এমতাবস্থায় আবূ সুফিয়ান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, "সে আমারই পুত্র।" হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু) খলীফা হওয়ার পর যিয়াদকে ইরানের শাসনকর্তা পদে নিয়োগ করেন। সে সুষ্ঠুভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করে এবং অনেক রাজ্য জয়ও করে। হযরত আমীরে মো'আবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর (সৎ)-ভাইয়ের এসব সুকীর্তি সম্পর্কে শোনেন এবং তাকে আমন্ত্রণ জানান। তথাপি যিয়াদ হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর শাহাদাত না হওয়া পর্যন্ত ক্ষমতা ত্যাগ করেনি। আমীরে মো'আবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বৈধভাবে খলীফা পদে আসীন হলে তিনি হিজরী ৪৪তম সালে যিয়াদকে আবূ সুফিয়ানের পুত্র বলে ঘোষণা করেন; আর তিনি তাকে বসরার শাসনকর্তা পদেও নিয়োগ দেন। ফলে সর্ব-হযরত উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ও আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু) কর্তৃক পিতৃপরিচয়হীন কাউকে প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিয়োগদানের দায়ে তাঁদেরকে সমালোচনার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হওয়া থেকে তিনি (আমীরে মো'আবিয়া) রক্ষা করেন। কাজী শোরায়হ'র পুত্র সাঈদ যে অন্যায় হযরত আলী

(কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর প্রতি করেছিল, তার প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে যিয়াদ সংকল্পবদ্ধ ছিল। এ লক্ষ্যে সে তার বাড়ি ও সম্পত্তি জব্দ করেছিল। এমতাবস্থায় সাঈদ মদীনা মোনাওয়ারায় যেয়ে ইমাম হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাছে যিয়াদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। হযরত ইমাম একটি পত্র দ্বারা যিয়াদকে ওই দখলীকৃত সম্পত্তি ফেরত দিতে বলেন। প্রত্যুত্তরে আরেকটি পত্র মারফত যিয়াদ অত্যন্ত কড়া ভাষায় ইমাম হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে জানান, "ওহে ফাতেমার পুত্র! আপনি আপনার নাম আমার নামের ওপরে লেখেছেন। অথচ আপনি হলেন ফরিয়াদী, আর আমি বাদশাহ।" ইমাম হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এ পত্রখানি দামেস্কে খলীফা হযরত মোয়াবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর দরবারে প্রেরণ করেন এবং এর সাথে আরও অনেক অভিযোগের নথি যুক্ত করেন। সে চিঠি পড়ে আমীরে মোয়াবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) অত্যন্ত মর্মাহত হন। তিনি যিয়াদকে এক কঠোর নির্দেশ লিখে পাঠান, যাতে তিনি বলেন, "ওহে যিয়াদ! জেনে রাখো, তুমি হলে আবূ সুফিয়ান ও সুমাইয়া দুজনেরই পুত্র সন্তান! আবূ সুফিয়ানের পুত্রকে নরম মেজাজের ও বিচক্ষণ হওয়া চাই। আর তাই হওয়া চাই সুমাইয়ার পুত্রকেও। তুমি তোমার পত্রে ইমাম হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর পিতার কুৎসা রটনা করেছো। আমি কসম করে বলছি, তুমি তাঁর প্রতি যে দোষারোপ করেছো, সেসব দোষের সমস্তই তোমার মধ্যে বিদ্যমান। আর তিনি ওই ধরনের যাবতীয় ময়লা দাগ থেকে মুক্ত, খাঁটি ও নির্মল। ইমাম হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর নাম মোবারকের নিচে তোমার নাম লেখাটা অপমানের চেয়ে বরং সম্মানেরই বিষয়। আমার এ আদেশ পাওয়া মাত্রই সাঈদের সম্পত্তি তাকে প্রত্যার্পণ করো! তাকে এমন একটি বাড়ি বানিয়ে দিও যা তার পূর্ববর্তী বাড়ির চেয়েও শ্রেয়তর। আমি আমার এ ফরমানের প্রতিলিপি দ্বারা ইমাম হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কেও (বিষয়টি) জানাচ্ছি, আর তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে সাঈদকে এব্যাপারে জানানোর জন্যে তাঁকে অনুরোধ করছি। তিনি চাইলে মদীনা মোনাওয়ারায় থাকতে পারেন, অথবা চাইলে কুফায়ও যেতে পারেন। তাঁদেরকে কখনো হেয় প্রতিপন্ন করো না, তোমার জিহ্বা দ্বারাও নয়, হাত দ্বারা তো নয়-ই! তুমি পত্রে ইমাম হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে তাঁর মায়ের নামে সম্বোধন করেছো। তোমার প্রতি লজ্জা! তোমার ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে তাঁর বাবা হলেন (শেরে খোদা) হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)। আর তার মা হলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কন্যা হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু

আনহা)। তাঁর (ইমাম সাহেবের) মতো সম্মান আর কারো হতে পারে কি? কেন তুমি এটি চিন্তা করো না?"

মুসলমানদের প্রতি যিয়াদ ও তার পুত্র উবায়দুল্লাহ'র কৃত অন্যায়-অত্যাচার সম্পর্কে সবাই ভালোভাবে জানেন। কিন্তু তাই বলে তাকে শাসনকর্তা নিয়োগ করার জন্যে হযরত আমীরে মো'আবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে দোষারোপ করা কখনোই সঠিক হতে পারে না। কেননা, তাকে ইতিপূর্বে সর্ব-হযরত উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ও আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-ই প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিয়োগ করেছিলেন।[১]

[১৬]

হযরত আলী (কা:)-এর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত সাহাবাবৃন্দ কি কাফের?

আমাদের রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

مَنْ آذَى عَلِيًّا فَقَدْ آذَانِي.

–যে ব্যক্তি আলীকে কষ্ট দেয়, সে প্রকৃতপক্ষে আমাকেই কষ্ট দেয়।[২]

কিছু লোক এ হাদিসের সুবিধামতো ব্যাখ্যা করে বলে, "যেহেতু মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে আঘাত দেয়া কুফর তথা অবিশ্বাস, সেহেতু হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর বিরুদ্ধে যারাই যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন সবাই কাফের।"

কুফা ও মিসরে জড়ো হওয়া মোনাফেক-চক্র মদীনা মোনাওয়ারা অভিমুখে রওয়ানা হয়ে খলীফা হযরত উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে শহীদ করে। এ ঘটনার ফলশ্রুতিতে খলীফা পদে আসীন হন হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)। তিনি পাল্টা ব্যবস্থাস্বরূপ খুনীদের দ্রুত খুঁজে বের না করাকে অধিকতর বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত বলে মনে করেন। এই কালবিলম্ব আক্রমণকারীদেরকে আরও উগ্র হয়ে উঠতে সহায়তা করে। তারা (তাদের হাতে শহীদ) হযরত উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে লা'নত তথা অভিসম্পাত দিতে আরম্ভ করে এবং নিজেরা সঠিক এ মর্মে প্রচার করতে থাকে। সর্ব-হযরত তালহা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু), যুবায়র (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু), নো'মান বিন বশীর

[১]. পাঠকবৃন্দ, অনুগ্রহ করে ৩৬তম প্যারাগ্রাফটি পাঠ করুন।

[২]. আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবু আমর ইবনে শা'আশ, ৩২:১৫৭, হাদিস নং : ১৫৩৯৪।

(রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু), কা'আব বিন আজরা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) প্রমুখ উচ্চতর মর্যাদার সাহাবীবৃন্দের কাছে এ ঘটনাপ্রবাহ গভীর শোকের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাঁরা দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, "আমরা যদি জানতে পারতাম যে এর ফলাফল এতো মন্দ হবে, তাহলে আমরা এসব দুর্বৃত্তের হাত থেকে হযরত উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে রক্ষা করতাম।" তাঁদের এ কথা শুনে ওই বদমাইশ লোকেরা এসব সাহাবী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কেও শহীদ করার ফন্দি আঁটে। এমতাবস্থায় তাঁরা (মদীনা মোনাওয়ারা) হতে মক্কা মেয়াযযমায় যান, যেখানে হজ্জের উদ্দেশ্যে ইতোমধ্যেই অবস্থানরত হযরত আয়েশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) তাঁদেরকে আশ্রয় দেন। তাঁরা তাঁকে মদীনা মোনাওয়ারায় যা যা ঘটছিল, সে সম্পর্কে জানান এবং বলেন, " খলীফা (আলী কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-কে এসব দুর্বৃত্তের অত্যাচার সহ্য করতে হবে যতোক্ষণ না বিদ্রোহ দমন হচ্ছে। এ নিষ্ক্রিয়ভাব দ্বারা দুর্বৃত্তরা আরও আস্কারা পাচ্ছে, আর তারা তাদের শত্রুতা ও অন্যায়-অত্যাচার আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। এই রক্তারক্তি থামানো যাবে না, যদি না প্রত্যাঘাত করা হয় এবং দুর্বৃত্তদের শাস্তি দেয়া হয়।" হযরত আয়েশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) তাঁদেরকে উপদেশ দিয়ে বলেন, "এ দুর্বৃত্তের দল মদীনা মোনাওয়ারায় অবস্থান এবং আমীরুল মো'মেনীন তথা খলীফার আশপাশে থাকাকালে আপনাদের সেখানে যাওয়া সমীচীন হবে না। আপাততঃ কোনো নিরাপদ স্থানে চলে যান। সেখানে কোনো সুবিধাজনক সময়ের অপেক্ষায় থাকুন এবং খলীফাকে এসব দুর্বৃত্তের কবল থেকে রক্ষার উপায় খুঁজে বের করুন। খলীফার সাথে সহযোগিতা করার প্রথম সুযোগটি পাওয়ামাত্রই কাজে লাগান; এরপর দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হোন। তখন শাস্তিবিধানে তাদেরকে গ্রেফতার করা সহজ হবে। ফলে আপনারা নিষ্ঠুর লোকদেরকে সমুচিৎ শিক্ষা দিতে পারবেন, যার প্রভাব দুনিয়ার অন্তিমলগ্ন পর্যন্ত বিরাজ করবে! এ মুহূর্তে তা করা সহজ নয়। তাড়াহুড়ো করবেন না।" হযরত আয়েশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)-এর এ কথা সাহাবা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-বৃন্দের মনঃপুত হয়। তাঁরা ইরাক ও বসরার মতো এলাকায় যেতে মনস্থ করেন। এসব এলাকা ছিল মুসলমান বাহিনির সমাবেশস্থল। সাহাবা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-বৃন্দ হযরত আয়েশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)-এর কাছে আরয করেন, "এ ফিতনা নির্মূল ও খলীফার সাথে আমাদের যোগ না দেয়া পর্যন্ত দয়া করে আমাদের রক্ষা করুন। আপনি মুসলমানদের মা ও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সম্মানিত স্ত্রী। আপনি অন্য যে কারো চেয়ে তাঁর কাছে প্রিয়ভাজন। যেহেতু

সবাই আপনাকে শ্রদ্ধা করেন, সেহেতু ওই দুর্বৃত্তরা আপনার বিরুদ্ধে (যুদ্ধে) এগোতে পারবে না। অতএব, আপনি আমাদের সাথে থাকুন এবং আমাদেরকে সমর্থন করুন!" মুসলমানদের কল্যাণে এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাহাবা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-বৃন্দকে রক্ষা করতে হযরত আয়েশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) ওই সাহাবী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-বৃন্দের দলে যোগ দেন; অতঃপর তাঁরা একযোগে বসরা অভিমুখে রওয়ানা হন। অপরদিকে, খলীফা হযরত আলী (কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-কে ঘিরে ওই খুনীচক্র যারা অবস্থান করছিল এবং প্রশাসনিক অনেক কাজে নাক গলাচ্ছিল, তারা (সাহাবা-এ-কেরামের) এই যাত্রা সম্পর্কে খলীফাকে উল্টো এক ধারণা ও মিথ্যে তথ্য দেয়। তারা তাঁকে বসরায় যেতে প্রভাব খাটায়। সর্ব-হযরত ইমাম হাসান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু), ইমাম হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু), আবদুল্লাহ ইবনে জা'ফর তাইয়ার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ও আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর মতো সাহাবী তাঁকে তাড়াহুড়ো না করার এবং মোনাফেকদের মিথ্যে রটনায় কর্ণপাত না করার পরামর্শ দেন। তথাপিও মোনাফেকরা আমীরুল মো'মেনীনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে তাঁকে বসরায় নিয়ে যায়। তিনি প্রথমে হযরত আয়েশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)-এর সাথে অবস্থানরত মানুষদেরকে তাঁরা কী ভাবছেন সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে কা'ক্কা নামের এক লোককে সেখানে পাঠান। তাঁরা জবাবে বলেন যে তাঁরা শান্তি প্রত্যাশী ও ফিতনার অবসানকামী; আর তাঁরা এ-ও জানান যে খুনীদের আগে গ্রেফতার করা উচিত। খলীফা তাঁদের এরাদা তথা ইচ্ছা কবুল বা গ্রহণ করে নেন। এমতাবস্থায় উভয় পক্ষের মুসলমানবৃন্দই আনন্দিত হন এবং তিন দিন পরে এক বৈঠকে মিলিত হবার ব্যাপারে তাঁরা একমত হন। সভার সময় ঘনিয়ে এলে খুনীরা এই ঐকমত্য সম্পর্কে জানতে পারে। এই সভা বানচালে কী করবে তা ভেবে না পেয়ে তাদের নেতা ইহুদী আবদুল্লাহ ইবনে সাবা'র কাছে পরামর্শের জন্যে শরণাপন্ন হয় তারা। ওই ইহুদী তার পরিকল্পনা মোতাবেক বলে, "আমাদের হাতে শেষ উপায় হচ্ছে আজ রাতে খলীফার বাহিনিকে আক্রমণ করা এবং তাঁকে যেয়ে জানানো যে হযরত আয়েশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)-এর সাথে অবস্থানকারী লোকেরা তাঁদের ওয়াদা (প্রতিশ্রুতি) ওয়াফা (পূরণ) করেননি এবং আমাদের প্রতি আক্রমণ পরিচালনা করেছেন।" এই পরিকল্পনা সফলভাবে বাস্তবায়ন করা হয়, আর এরই অংশ হিসেবে আরেকটি অশ্বারোহী বাহিনি সাহাবী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-বৃন্দের অপর দলের ওপর

হামলা করে। আর দুর্বৃত্তদের যেসব গুপ্তচর আগেই তাঁদের সাথে মিশে গিয়েছিল, তারা বন্ধু হওয়ার ভান করে উচ্চস্বরে চেঁচামেচি করতে থাকে এই বলে, "খলীফা তাঁর অঙ্গীকার রাখেননি, আমাদের হামলা করা হয়েছে।" ফলে যুদ্ধ বেধে যায়। এটিকেই জামাল বা উটের যুদ্ধ বলা হয়। আল-কুরতুবী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) ও অন্যান্য সুন্নী ইতিহাসবেত্তা তা-ই লিখেছেন, আর এটি-ই সত্য। অপরদিকে, সাহাবা-এ-কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-এর শত্রুরা খুনীদেরকে সমর্থন করতে এ তথ্যকে বিকৃত করে থাকে। তাদের মিথ্যে কথায় বিশ্বাস করা উচিত নয়।

হযরত উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর খুনীদেরকে গ্রেফতার করে বিচারের আওতায় আনার পক্ষপাতী আরেক সাহাবী হলেন দামেস্কের প্রাদেশিক শাসনকর্তা হযরত আমীরে মোয়াবিয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহু)। ফিতনা-ফাসাদ তখনো দমন না হওয়ায় এবং খলীফা হযরত আলী (কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু) উটের যুদ্ধ নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকার দরুন অন্য কাজ করতে না পারায় হযরত মোয়াবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর পরামর্শ তিনি প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য হন। এতে আমীরে মোয়াবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-ও হযরত আলী (কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-কে খলীফা হিসেবে মানতে অস্বীকার করেন। শিয়াদের *'নাহজুল বালাগা'* পুস্তকেও এ কথা বিবৃত হয়েছে, যেখানে খলীফা হযরত আলী (কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু) বলেন: "আমাদেরকে আমাদের দ্বীনী ভাইদের সাথে যুদ্ধ করতে হবে। (কেননা) তাঁরা সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছেন।" অতএব, পরিদৃষ্ট হচ্ছে যে উটের ও সিফফিনের যুদ্ধে যাঁরা লড়াই করেছিলেন, তাঁরা কখনো হযরত আলী (কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-কে ব্যথা দেয়ার খেয়ালে তাতে অংশগ্রহণ করেননি। উভয় পক্ষের চিন্তা-ভাবনায় ছিল কেবল আল্লাহ পাকের আদেশ পালন ও ফিতনা দমন। তবু ইহুদীবাদের হিংস্র থাবা উভয় পক্ষেরই রক্ত ঝরিয়েছে।

'তাযকিরায়ে কুরতুবী মোহতাসারী' গ্রন্থের ১২৩ পৃষ্ঠায় ইমাম মুসলিমের বর্ণিত একটি হাদিস শরীফ উদ্ধৃত হয়েছে; তাতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ ফরমান:

إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بسيفهما فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ.

–মুসলমানরা অপর মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হলে যারা মারা যাবে এবং যারা হত্যা করবে, তাদের সবাই জাহান্নামে যাবে।[১]

উলামাবৃন্দের মতানুযায়ী, এ হাদিস শরীফে উদ্দেশ্য হলো যারা দুনিয়ার স্বার্থে এরকম করবে, তারাই দোযখে প্রবেশ করবে। কিন্তু এটি ইসলামের খাতিরে লড়াই করাকে, দোষত্রুটি সংশোধন (মোসলেহাত) বা ফিতনা দমনকে উদ্দেশ্য করেনি। বস্তুতঃ আরেকটি হাদিসে (আরও খোলাসা করে) মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ ফরমান,

"দুনিয়ার স্বার্থে লড়াই করলে হত্যাকারী ও নিহত (মুসলমান) সবাই জাহান্নামী হবে।"

হযরত আলী ও আমীরে মোয়াবিয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর মধ্যকার যুদ্ধ কিন্তু দুনিয়ার স্বার্থে সংঘটিত হয়নি। বরঞ্চ তা হয়েছিল আল্লাহ তা'আলার আদেশ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যেই। মুসলিম শরীফে বর্ণিত একটি হাদিস শরীফে হুযূর পূর নূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ ফরমান:

"আমার সাহাবীদের মাঝে বিবাদ-বিসম্বাদ দেখা দেবে। আমার সোহবত তথা সান্নিধ্য লাভের ওয়াস্তে বা খাতিরেই আল্লাহ পাক তাদেরকে মাফ করবেন। তবে পরবর্তীকালে আগত অনেক মানুষ এসব বিবাদে জড়িত আমার সাহাবীদের সমালোচনায় মুখর হবে এবং (ওই সমালোচনার ফলশ্রুতিতেই) জাহান্নামে যাবে।"

এই হাদিস শরীফ ইঙ্গিত করে যে দ্বন্দ্বে লিপ্ত সাহাবী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-বৃন্দকে (খোদার পক্ষ থেকে) ক্ষমা করা হবে।

[১৭]

সাহাবাবৃন্দ (রা:)-কে লা'নত দেয়া যায় না

আসহাবে কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-বৃন্দের ঘোর শত্রু হুরুফী শিয়া গোষ্ঠী অভিযোগ করে যে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের সবাই লা'নত তথা অভিসম্পাতপ্রাপ্ত। অথচ সূরা আলে ইমরানের ১১০ নং আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে,

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ.

–তোমরা হলে ওইসব উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম।[২]

---

১. তাবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবু কতলি আহলিল রিদ্দাতি, পৃ. ৩০৫, হাদিস নং : ৩৫৩৮।
২. আল কুরআন : সূরা আলে ইমরান, ৩:১১০।

এখন দেখুন, এই হুরুফী শিয়াচক্র উম্মত-এ-মুহাম্মদী তথা মুসলমানদেরকে "লা'নতপ্রাপ্ত" বলে ডাকে। তারা প্রত্যেক ওয়াক্ত নামায শেষে সাহাবা-এ-কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-এর মহৎ জনদের লা'নত দেয়াকে বড় ইবাদত বলে বিবেচনা করে। অথচ আল্লাহ তা'আলা ও আম্বিয়া (আলাইহিমুস্ সালাম)-বৃন্দের শত্রু আবূ জাহল, আবূ লাহাব, ফেরাউন, নমরুদ গংকে লা'নত দেয়ার চিন্তাও তাদের মাথায় আসে না। তারা আরও দাবি করে যে তিন খলীফা (সর্ব-হযরত আবূ বকর, উমর ও উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুম) এবং সাহাবা-এ-কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-কে প্রশংসাকারী কুরআনের আয়াতগুলো হচ্ছে আয়াতে মোতাশাবেহাত (ঐশী রহস্যপূর্ণ, দ্ব্যর্থবোধক বা ব্যাখ্যার অযোগ্য আয়াত), আর তাই এগুলো বোধগম্য নয়।

[১৮]

সুন্নী মুসলমান সমাজ আহলে বায়ত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-এর শত্রু নন

হুরুফী শিয়াচক্র আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতকে হযরতে আহলে বায়ত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-এর শত্রু হিসেবে মনে করে থাকে। পক্ষান্তরে, আহলে সুন্নাতের উলামা-এ-কেরাম কর্তৃক রচিত বইপত্র আহলে বায়ত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-এর প্রতি ভালোবাসা অন্তরে পোষণ করতে উপদেশ দেয় এবং তাঁদের মহৎ গুণাবলীর প্রশংসাও করে। সুন্নী আলেম বাহাউদ্দীন আমালী নিজ *'কাশকুল'* শীর্ষক পুস্তকে লেখেন, যে ব্যক্তি আহলে বায়ত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-কে অস্বীকার করে, সে ঈমানদার মুসলমান নয়। আহলে সুন্নাতের সকল তরীকা-ই আহলে বায়ত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) হতে ফায়েয (ঐশী দান/উপহার) লাভ করেছে। চার মাযহাবের ইমামবৃন্দ সবাই আহলে বায়ত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-এর (সাক্ষাৎ) শিষ্য। শিয়া পণ্ডিত ইবনে মুতাহ্হের হুল্লী তার লিখিত *'নাহজুল হাক্ব'* ও *'মিনহাজুল কারামা'* গ্রন্থ দুটোতে স্বীকার করেন যে সর্ব-ইমাম আবূ হানিফা (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) ও মালেক ইবনে আনাস (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) ইমাম জা'ফর সাদেক (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) কর্তৃক প্রশিক্ষিত হয়েছিলেন। ইমাম শাফেঈ (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) ছিলেন ইমাম মালেক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর ছাত্র, আর এর পাশাপাশি ইমাম মুহাম্মদ শায়বানী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এরও শিষ্য। ইমামে আযম হযরত আবূ হানিফা (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) হযরত ইমাম বাকের (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর সোহবত তথা সান্নিধ্যও লাভ করেন এবং তাঁর কাছ থেকে ধর্মীয় জ্ঞান আহরণ করেন। ইবনে মুতাহ্হের সরাসরি এ সত্য স্বীকার করেন।

এরই ফলশ্রুতিতে ইমামে আযম হযরত আবূ হানিফা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) শিয়া ধর্মমত অনুযায়ীও ইজতেহাদের ক্ষমতাসম্পন্ন মুজতাহেদ বলে সাব্যস্ত হন। অধিকন্তু, তাদেরই মতানুযায়ী যে ব্যক্তি তাঁর (মুজতাহিদের) সাক্ষ্য অস্বীকার করবে, সে বে-ঈমান হয়ে যাবে। ইমাম মূসা কাযেম (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) যখন আব্বাসীয় যুগে বন্দিশালায় আটক ছিলেন, তখন সর্ব-ইমাম আবূ ইউসূফ (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) ও মুহাম্মদ শায়বানী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর কয়েদখানায় আসতেন এবং তিনি তাঁদের জ্ঞানশিক্ষা দিতেন। এ সত্যটি শিয়া বইপত্রেও লেখা আছে।

সকল মুসলমানের জন্যে অবিশ্বাসীদের পছন্দ না করা ফরয (অবশ্য কর্তব্য)। এর সপক্ষে অনেক কুরআনের আয়াত বিদ্যমান। অপরদিকে, পাপী হলেও ঈমানদারদের একে অপরের প্রতি মহব্বতশীল হতে হয়। আর সবার বা সব কিছুর চেয়ে আল্লাহ তা'আলাকে মহব্বত করা তাঁদের জন্যে অত্যাবশ্যক। ভালোবাসা ও ঘৃণার মাত্রা রয়েছে। আল্লাহর পরে তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে সবচেয়ে বেশি মহব্বত করা প্রত্যেক ঈমানদারের জন্যে অবশ্য কর্তব্য। আর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ঘনিষ্ঠ ঈমানদার মুসলমানদেরকে এরপর ভালোবাসা উচিত। হুযূর পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ঘনিষ্ঠ মুসলমানবৃন্দ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত:

১. তাঁর আহলে বায়ত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) তথা সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়স্বজন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম আজমাঈন;

২. তাঁর পবিত্র বিবি সাহেবাবৃন্দ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম আজমাঈন। আল্লাহ পাক তাঁর কুরআন মজীদে বংশ-সম্পর্ক ও বিয়ের মাধ্যমে সম্পর্ক দুটোরই উল্লেখ করেছেন;

৩. তাঁর আসহাব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-বৃন্দ। এঁরা নিজেদের জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করেছেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাহায্যে ও খেদমতে। এ ধরনের ঘনিষ্ঠতা অন্য সব ধরনের ঘনিষ্ঠতার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর।

এরপর আসে সকল ঈমানদার মুসলমানকে ভালোবাসা। এদের কেউ যদি ঈমানহারা হয়, তাহলে তার আর সে ভালোবাসা পাওয়ার কোনো অধিকার

থাকে না। ঈমানদারী (বিশ্বাস) ও কুফরী (অবিশ্বাস) শেষ নিঃশ্বাসের সময় নির্ধারিত হয়। অর্থাৎ, ইন্তেকালের সময়েই কেউ ঈমানদার হিসেবে ইন্তেকাল করলেন, না কাফের হয়ে, তা নিশ্চিত হয়। কোনো ঈমানদারের পাপকাজকে পছন্দ করা হয় না, কিন্তু তাঁকে (মানে তাঁর সত্তাকে)-ই মহব্বত করা হয়।

সর্বসম্মতভাবে এ কথা বর্ণিত হয়েছে যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বেসালের (খোদা তা'আলার সাথে পরলোকে মিলনপ্রাপ্তির) পরে তাঁর পবিত্র কোনো বিবি সাহেবা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুন্না) কিম্বা কোনো সাহাবী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-ই কাফের তথা অবিশ্বাসী হননি। জনৈক শিয়া আলেম নাসিরুদ্দীন তুসী বলে, "ইমামে আলী (কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর বিরোধিতা যাঁরা করেছেন, তাঁরা সবাই পাপী। আর যাঁরা তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন, তাঁরা সবাই কাফের।" কিন্তু ওপরের সর্বসম্মত বর্ণনা অনুযায়ী যাঁরা হযরত আমীর (আলী কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন এবং তাঁকে অমান্য করেছিলেন, তাঁদের সবাইকেও মহব্বত করতে হবে।

[১৯]

জামাল ও সিফফীনের যুদ্ধ খলীফা উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর হত্যার বিচার চাওয়ার কারণেই

জামাল (উট) ও সিফফীনের যুদ্ধগুলো হযরত আলী (কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর বিরুদ্ধে লড়াই করার উদ্দেশ্যের ফলশ্রুতি ছিল না। তাঁদের একমাত্র ইসলামসম্মত চিন্তাই ছিল হযরত উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর খুনীদের শাস্তি বিধান করা। হযরত আলী (কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু) তাদের মধ্যে না থাকলেও এ যুদ্ধ সংঘটিত হতো। যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কারোরই অন্তরে হযরত আলী (কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর প্রতি কোনো রকম শত্রুতাভাব ছিল না। যে ব্যক্তি কোনো হারাম কাজ করে, তার নিয়্যত তথা উদ্দেশ্য অনুযায়ীই ওই কাজের বিচার করা হয়। যেমন ধরুন, কেউ একজন বললেন, "যদি কোনো ব্যক্তি এই কাঁচ ভাঙ্গে, তাহলে আমি তাকে শাস্তি দেবো।" অতঃপর এক ব্যক্তি ওই স্থানের পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় হোঁচট খেয়ে ওই কাঁচ ভেঙ্গে ফেললেন। এমতাবস্থায় প্রথম ব্যক্তির উচিত হবে না দ্বিতীয় ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া। হযরত আলী (কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িতদের বেলায়ও একই অবস্থা। হযরত আয়েশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক হযরত আলী (কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর বিরোধিতা করা হযরত মূসা (আলাইহিস্

সালাম) কর্তৃক হযরত হারূন (আলাইহিস্ সালাম)-কে তিরস্কার করার মতোই ব্যাপার ছিল। কুরআন মজীদে ঘোষিত হয়েছে যে হযরত আয়েশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) ঈমানদার মুসলমানদের মাতা। ছেলেকে শাস্তি দেয়ার জন্যে কোনো মাকে তো দোষারোপ করা যায় না, যদি তিনি ভুলও করে থাকেন। হযরত আলী (কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অংশগ্রহণকারী সাহাবা-এ-কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-কে আল-কুরআন ও হাদিস শরীফে প্রশংসা করা হয়েছে। প্রত্যেক সাহাবী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-এরই শাফাআত ও নাজাত পাবার আশা আছে, এমন কি প্রত্যেক ঈমানদারেরও তা আছে। কোনো ব্যক্তি হযরত আলী (কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর প্রতি শত্রুতাভাব অনুভব করলে, তাঁকে অভিসম্পাত (লা'নত) বা গালি দিলে সে কাফের তথা অবিশ্বাসী হয়ে যাবে। কিন্তু কোনো সাহাবী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-ই এই ধরনের মনোভাব পোষণ করেছেন বলে কোনো রেওয়ায়াতে বা বর্ণনায় নেই। যে ব্যক্তি হযরত আলী (কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-কে কাফের বা জাহান্নামী বলে, অথবা জ্ঞান-প্রজ্ঞা, ন্যায়পরায়ণতা, ওয়ারা ও তাক্ওয়ার ক্ষেত্রে ঘাটতির দোষারোপ করে তাঁকে খলীফা হওয়ার অযোগ্য বলে দাবি করে, সে নিজেই কাফের হয়ে যায়। এ রকম ধারণা খারেজী ও ইয়াযীদীচক্রের; তবে তাদের এ ধারণা সন্দেহজনক দলিলের ভুল (বা অপ-) ব্যাখ্যা হতে নিঃসৃত। কোনো ব্যক্তি যদি হযরত আলী (কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর বিরুদ্ধে লড়াই করে থাকে নিজের দুনিয়াবী খায়েশ তথা ধনসম্পত্তি ও পদের লোভে বা ভুল ইজতেহাদের ফলশ্রুতিতে, তাহলে সে কাফের হবে না। প্রথম ক্ষেত্রটিতে ওই ব্যক্তি পাপী হবে; আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রটিতে সে হবে বেদআতী। একটি হাদিস শরীফে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ ফরমান:

وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا فَهُوَ كَقَتْلِهِ.

–কোনো ঈমানদারকে লানত তথা অভিসম্পাত দেয়া তাকে হত্যা করার মতোই ব্যাপার।[১]

কাউকে লা'নত দেয়ার মানে তাকে আল্লাহর দয়া ও করুণা হতে বঞ্চিত করার ইচ্ছা পোষণ। কোনো ব্যক্তির প্রতি ঘৃণা তার মৃত্যুর পরও বিরাজ করে।

১. ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু মা ইনহা মিনাস্ সিবাবি ওয়াল লি'আন, ১৮:৪৭৮, হাদিস নং : ৫৫৮৭।
খ) তাবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, কিতাবুল ইমান ওয়ান্ নুযূর, পৃ. ২৭৬, হাদিস নং : ৩৪১০।
গ) তাবরানী : মু'জামুল কবীর, ২:৮০।

আরেকটি হাদিস শরীফে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ ফরমান: "বেসালপ্রাপ্ত (পরলোকগত)-দের প্রতি অভিসম্পাত দেবে না।"

[২০]

জামাল ও সিফফীনের যুদ্ধের পেছনে ইহুদী কালো হাত

অতএব, এটি পরিদৃষ্ট হয়েছে যে সিফফীন ও উটের যুদ্ধে ইহুদীচক্রের কালো হাতের থাবা কাজ করেছিল। এগুলো ছিল ইহুদী ষড়যন্ত্রের ফলশ্রুতিতে সংঘটিত বিপর্যয়। এই চক্রান্ত ছিল ভাইয়ের বিরুদ্ধে ভাইকে লেলিয়ে দেয়ার, যাতে গৃহযুদ্ধের দ্বারা ভেতর থেকে ইসলামের ধ্বংস সাধন করা যায়। হযরত উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর শাহাদাত যেমন ইহুদী ষড়যন্ত্রের ফসল, ঠিক তেমনি ওই একই ইহুদী গোষ্ঠী উসমানীয় তুর্কী সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদ খানের বিরুদ্ধে সৈন্য জোগাড় করে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পাঠিয়েছিল।

মুসলমান সমাজ তাও ঘুম থেকে জেগে ওঠছেন না। তাঁরা এসব (ঐতিহাসিক) তথ্য দেখতে পাচ্ছেন না। হযরত উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে যারা শহীদ এবং সাহাবা-এ-কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-এর পরস্পর হানাহানির মাধ্যমে ইসলামের ধ্বংস সাধন যারা করেছিল, আর ইউনিয়ন পার্টির নামে ফ্রী-মেইসন (যিনদিক গোষ্ঠী)-দের যারা মুসলমানদের জীবনে উপদ্রব সৃষ্টি করতে দিয়েছিল, যার দরুন হাজার হাজার ধর্মীয় ব্যক্তিকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলতে নয়তো কয়েদখানায় যেতে হয়েছিল, সেই দ্বীনের শত্রুদের লেখা বইপত্র বিপুল সংখ্যায় এখন বিক্রি হচ্ছে এবং এসব বই গ্রাম এলাকায়ও পাঠানো হচ্ছে। ফ্রী-মেইসন ও কমিউনিস্ট-সমর্থিত ধর্ম সংস্কারকবর্গ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। অপরদিকে, মুসলমান সম্প্রদায় এ ব্যাপারে একদম বিস্মৃত এবং গভীর ঘুমে অচেতন। অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতা দ্বারা ইসলামের ধ্বংস সাধনের উদ্দেশ্যে লিখিত বইপত্র তাঁরা অনুবাদ ও প্রচার করছেন।

[২১]

আরেক শিয়া পত্রিকার ধোকাবাজি

আমরা (আল্লামা হুসাইন হিলমী) একটি দৈনিক পত্রিকায় একখানা ধর্মীয় পুস্তকের বিজ্ঞাপন দেখেছি। আমাদের জানানো হয় যে ওই পত্রিকাটি বেশ কিছুদিন যাবত ধর্মীয় বইটির প্রশংসাগীত গাইছে। কোনো এক মুসলমান বইটির একটি কপি আমাদের সরবরাহ করেন। এটি আহলে সুন্নাহর গুণকীর্তনে ভরা; সম্ভবতঃ এখানে-সেখানে মিথ্যে ও কুৎসা লুকোনোর ফন্দিস্বরূপ। আমরা

এগুলো এক্ষণে আমাদের দ্বীনী ভ্রাতাদের সামনে উন্মোচন করবো। আমরা যদি এর দরুন আমাদের তরুণ প্রজন্মকে (বিভ্রান্তির) গভীর খাদে পড়া থেকে রক্ষা করতে পারি, তাহলে আমাদের আকীদা-বিশ্বাস ও দেশ-জাতির প্রতি মহা এক খেদমত আঞ্জাম দিতে সক্ষম হবো।

[২২]

হযরত আয়েশা (রাদ্বিঃ আনহা) নিজ ইজতেহাদের জন্যে অনুতপ্ত হননি

(বইয়ের) লেখক বলে, "(ইসলামী) বইপত্রে বিবৃত হয়েছে যে এমন কি হযরত আয়েশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)-ও নিজ ইজতেহাদী ভুলের ব্যাপারে জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত অনুতপ্ত ও ক্ষমাপ্রার্থী ছিলেন।"

পক্ষান্তরে, ইসলামী বইপত্রে এমন কোনো তথ্যই নেই যে কোনো আলেম নিজ ইজতেহাদের জন্যে অনুতপ্ত হয়েছিলেন বা তাওবা করেছিলেন। কেননা, ইজতেহাদ প্রয়োগ করা প্রয়োজন এমন ধর্মীয় শিক্ষাসমূহে ইজতেহাদ প্রয়োগ করা পাপ নয়। ইজতেহাদের জন্যে অন্ততঃ একটি সওয়াব (পুরস্কার) রয়েছে (যদি তা ভুল হয়)। ওই সকল পুণ্যাত্মা (সাহাবী) রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম আজমাঈন দুঃখ-ভারাক্রান্ত ছিলেন নিজেদের ভুল ইজতেহাদের কারণে নয়, বরং এতোগুলো মুসলমানের রক্ত ঝরার কারণেই।

[২৩]

আসহাব (রাঃ)-বৃন্দ নিজেদের এজতেহাদের জন্যে অনুতপ্ত হননি

ওই লেখক বলে, "দীর্ঘকাল চড়াও হওয়া এক ফিতনা-ফাসাদ, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও ধ্বংসযজ্ঞের পরে উপলুব্ধ হয় যে সাহাবা-এ-কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) তাঁদের ইজতেহাদে ভুল করেছিলেন।"

আমরা ইতিপূর্বে বলেছি, আসহাব-এ-কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) যে এজতেহাদে উপনীত হয়েছিলেন, তাতে হযরত উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর খুনীদের বিচারের আওতায় আনার, মদীনায় অবস্থিত দস্যুদের তাড়িয়ে দেয়ার এবং যতো শিগগির সম্ভব শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার দাবি ছিল। তাঁদের এ ইজতেহাদের সাথে যুদ্ধের কোনো সম্পর্কই ছিল না। ওই তথাকথিত যুদ্ধ বাধিয়েছিল মোনাফেক-চক্র। পরবর্তীকালে ওই একই মোনাফেক-চক্র দাবি করে যে ওই যুদ্ধবিগ্রহের সূত্রপাত হয়েছিল ইজতেহাদী পার্থক্য হতে। ফলে তারা মুসলমানদেরকে দুভাগে বিভক্ত করতে সক্ষম হয়।

[২৪]

আসহাব (রাঃ)-বৃন্দ ঈমানদার হিসেবেই বেসালপ্রাপ্ত হন

শিয়া লেখক একটি হাদিস শরীফ উদ্ধৃত করে যা'তে এরশাদ হয়েছে:

> "আমার আসহাব (সাথী)-দের মধ্যে কিছু লোক (বেহেশতে) আমার হাউজের (জলাধারের) পাশে (আমি বিশ্রাম নেয়ার সময়) আমার কাছে আসবে। আমি তাদের দেখে চিনতে পারবো। অতঃপর তাদেরকে আমার থেকে আলাদা করা হবে। আমি বলবো, 'হে প্রভু, এরা আমারই আসহাব।' এমতাবস্থায় আমাকে প্রত্যুত্তরে বলা হবে, 'এরা আপনার (বেসালের) পরে অমুক অমুক কাজ করেছে'।"

এরপর ওই লেখক একে সহীহ হাদিস প্রমাণ করতে বিভিন্ন বইয়ের নাম উল্লেখ করেছে।

এই হাদিসের এক দীর্ঘতর বর্ণনা সহীহ নামের সুন্নী বইপত্রে বিদ্যমান [অর্থাৎ, হাদিস-শাস্ত্রের উলামাবৃন্দ কর্তৃক সমর্থিত হাদিসের বইপত্র]। এ জাতীয় সবগুলো সহীহ হাদিস-ই সাহাবা-এ-কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-এর মাঝে অবস্থিত মোনাফেকদের দিকে ইঙ্গিত করে। একটি হাদিসে বিবৃত হয়েছে যে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হায়াতে জিন্দেগীর সময়েই সাহাবা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-বৃন্দের মধ্য হতে কিছু লোক মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে গিয়েছিল। তারা সাহাবী হওয়ার মর্যাদাপ্রাপ্তদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এসব লোকদেরকে বনূ হানীফ ও বনূ সাকীফের মতো গোত্রগুলোর পক্ষে প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছিল এবং তারা মুসলমান হওয়ার কথা স্বীকার করে আপন আপন গোত্রে ফিরে গিয়েছিল। পরবর্তীকালে তারা ধর্মত্যাগ করে। এ শ্রেণির একজন হলো হারকুস্ বিন যুবায়র। সে জামাল (উট) ও সিফফীনের যুদ্ধগুলোতে খলীফা হযরত আলী (কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর সাথে ছিল, কিন্তু পরে খারেজীদের দলে যোগ দেয়। আহলুস্ সুন্নাতের উলামা-এ-কেরাম সর্বসম্মতভাবে এ কথা ব্যক্ত করেন যে, সকল আসহাব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) যাঁরা নেক আমল পালন এবং অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে জ্বিহাদে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা ঈমানদার হিসেবে বেসাল (পরলোকে খোদার সাথে মিলন)-প্রাপ্ত হয়েছিলেন। জামাল ও সিফফীনের যুদ্ধে উভয় পক্ষে অংশগ্রহণকারী সাহাবা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-বৃন্দও ওই সৌভাগ্যবান মানুষের দলে অন্তর্ভুক্ত। তাঁদের কেউই একে অপরকে কাফের আখ্যা দেননি। একটি

হাদিস শরীফে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ ফরমান, "আম্মার ইবনে এয়াসার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বিদ্রোহীদের হাতে শহীদ হবে।"

আর হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু) বলেন, "আমাদের ভাইয়েরা আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন।"

এ দুটো কথা প্রমাণ করে যে হযরত আমীরে মোয়াবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ও তাঁর পক্ষাবলম্বনকারী সাহাবা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-বৃন্দ সবাই মুসলমান ছিলেন। তুর্কী ভাষায় রচিত আমাদের *'আসহাব-এ-কেরাম'* গ্রন্থে আমরা সর্ব-হযরত মোয়াবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ও আমর ইবনে আস্ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর জীবন-সায়াহ্নে ব্যক্ত কথাগুলো উদ্ধৃত করেছি এবং মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি তাঁদের গভীর ভালোবাসা ও ভক্তি-শ্রদ্ধার বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছি। পাঠককুল যারা ওই বই পড়বেন, তাঁরা বুঝতে পারবেন ওই দুই সাহাবী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)'র দৃঢ় ঈমানদারী সম্পর্কে এবং তাঁরা কখনোই সাহাবী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) দুজনের সমালোচনা করবেন না। আহলে সুন্নাতের আলেম-উলেমাবৃন্দ মুরতাদ-চক্রের পক্ষ সমর্থন করেন না। পক্ষান্তরে, উলামা-মণ্ডলী খলীফা হযরত আবূ বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর শাসনামলে ধর্মত্যাগী (রিদ্দাহ্)-দের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ওই সাহাবা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-বৃন্দের উচ্চ নৈতিক গুণাবলীর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। ওই সকল সাহসী ব্যক্তি যাঁরা আল্লাহর ওয়াস্তে ধর্মত্যাগীদের দমন করেছিলেন, ইরানী ও বাইজেনটিনীয় বাহিনীগুলোর সফল মোকাবেলা করে তাদেরকে ধূলিস্মাৎ করেছিলেন, তাঁরা কতো মহান ছিলেন তা সুন্নী উলামাবৃন্দ ব্যাখ্যা করেছেন। ওই বীর মুসলমানদের কারণেই অসংখ্য মানুষ ঈমানদার হয়েছিলেন। তাঁরা নও-মুসলিমদেরকে কুরআনের বাণী, নামায ও ইসলাম-ধর্ম সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছিলেন। কুরআন মজীদ খোশ-খবরী দেয় যে তাঁরা সবাই বেহেশতী হবেন এবং এ-ও অঙ্গীকার করে যে তাঁরা অফুরন্ত আশীর্বাদপ্রাপ্ত হবেন। আল্লাহ পাক ঘোষণা করেন যে তিনি তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট আছেন। এই খোদায়ী সুসংবাদ ও ওয়াদা সাক্ষ্য দেয় যে সকল আসহাব-এ-কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-ই ঈমানদার হিসেবে বেসালপ্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং তাঁদের কেউই মুরতাদ্দ হননি।

শাহ ওলীউল্লাহ দেহেলভী তাঁর *'কুররাত আল-আয়নাঈন'* পুস্তকের শেষাংশে ওপরোক্ত হাদিস শরীফটি উদ্ধৃত করেন এবং এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেন।

আমরা এ বইটির সারাংশ তুর্কী ভাষায় অনুবাদ করে *'আসহাব-এ-কেরাম'* শিরোনামে প্রকাশ করেছি।

[২৫]

আমীরে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) আল-কুরআনেই প্রশংসিত

ওই লেখক বলে, "ইমাম ইবনে জারির তাবারী 'তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির কল্যাণে প্রেরিত হয়েছো'– শীর্ষক আয়াতটির তাফসীর তথা ব্যাখ্যাকালে (সহীহ সনদে) হযরত উমর ফারূক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে উদ্ধৃত করেন, যিনি বলেন: 'এই মহৎ বৈশিষ্ট্য আমাদের পূর্ববর্তী (ইসলাম গ্রহণকারী) মানুষদের মধ্যেই নিহিত। পরবর্তী প্রজন্ম এতে অন্তর্ভুক্ত নয়।' ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) ও ইবনে শিরিনের মতে, পূর্ববর্তী মুসলমানবৃন্দ হলেন তাঁরাই, যাঁরা দুটো কেবলার দিকে ফিরে নামায পড়েছিলেন। অপর পক্ষে, শা'বী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর মতানুযায়ী, তাঁরা সেসব মানুষ যাঁরা রিদওয়ান গাছের নিচে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাতে বায়া'ত গ্রহণ করেছিলেন।"

এভাবে এই (শিয়াপন্থী) লেখক হযরত আমীরে মো'আবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর প্রতি আক্রমণ হানার পথ পরিষ্কার করেছে। কিন্তু যে ধারণার ভিত্তিতে সে এটি করতে চেয়েছে, তা সমর্থনযোগ্য নয়। আয়াতে প্রশংসিত 'সাবিকূন' বলতে পূর্ববর্তী সাহাবী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-বৃন্দকে বুঝিয়েছে বলে ওই লেখক পরবর্তী সময়ে ইসলাম কবুলকারী আমীরে মো'আবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ও হযরত আমর ইবনে আল-আস্ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে ওই প্রশংসিত দলে অন্তর্ভুক্ত নন বোঝাতে চেয়েছে। কিন্তু সে সূরা তওবার ১০০ আয়াতের কেবল প্রথমাংশই উদ্ধৃত করেছে, যা'তে বিবৃত হয় السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ "সাবিকূন আল-আউয়ালীন"; আর সে শেষাংশ ধামাচাপা দিয়েছে। আয়াতোক্ত প্রথমাংশের পরে যা এরশাদ হয়েছে, তার তাফসীর নিম্নরূপ:

وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.

–এসকল পুন্যাত্মাকে যারা ঈমানদারী ও এহসানে অনুসরণ করে, তাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট আছেন। আর তারাও আল্লাহ

তা'আলার প্রতি সন্তুষ্ট। আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্যে বেহেশতের বাগানসমূহ তৈরি করে রেখেছেন।[১]

সমস্ত তাফসীরের কিতাব সর্বসম্মতভাবে ব্যক্ত করে যে সকল সাহাবী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ও দুনিয়ার শেষ সময় পর্যন্ত আগত মুসলমান সাধারণ, যাঁরা সাহাবী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-দেরকে অনুসরণ করবেন, তাঁরা সবাই তাঁদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। *'তিবইয়্যান'* শিরোনামের তাফসীরগ্রন্থটি এই বিষয়টি উল্লেখ করে মুহাম্মদ বিন কা'আব (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)-কে উদ্ধৃত করে, যিনি বলেন, "সকল সাহাবা-এ-কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-ই বেহেশতে অবস্থান করছেন, এমন কি তাঁদের মধ্যে যাঁরা পাপী তাঁরাও।" তাফসীরগ্রন্থটি আরও বলে যে হযরত কা'আব (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর কথার পক্ষে দলিলস্বরূপ ওপরোক্ত আয়াতে করীমার উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন। জনৈক হুরুফী পুরোহিতকে জিজ্ঞেস করা হয় কেন সে একদম নামায পড়ে না। জবাবে সে নিচের আয়াতটিকে মান্য করার কথা বলে; আয়াতের প্রথমাংশে ঘোষিত হয়েছে, لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ "নামাযের নিকটবর্তী হয়ো না![২]" কিন্তু وَأَنْتُمْ سُكَارَى "তোমরা যখন মদ্যপ থাকো[৩]"– আয়াতের এই শেষাংশ ধামাচাপা দিয়ে ওই পুরোহিত খোদা তা'আলার কালামের সম্পূর্ণ উল্টো অর্থ করেছে এবং ফলশ্রুতিতে অবিশ্বাসীতে পরিণত হয়েছে। অনুরূপভাবে, ওপরে উল্লেখিত শিয়া লেখকও আয়াতে করীমার প্রথমাংশ প্রকাশ করেছে এবং সর্ব-হযরত আমীরে মো'আবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ও আমর ইবনে আস্ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) যে বেহেশতী মানুষদের অন্তর্ভুক্ত সেই সত্যটি ধামাচাপা দিয়েছে।

[২৬]

হযরত আবূ সুফিয়ান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) নৈকট্যপ্রাপ্ত

অতঃপর ওই শিয়া লেখক প্রথম আক্রমণ হানে এ কথা বলে, "কুফর তথা অবিশ্বাসের নেতৃবৃন্দ হচ্ছে হিন্দের স্বামী ও মোয়াবিয়ার বাবা আবূ সুফিয়ান এবং তার দলবল।" অথচ সে এ কথা ভুলেই গিয়েছে যে ওই দিনগুলোতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর চাচা হযরত আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-ও অবিশ্বাসীদের দলে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি বদর যুদ্ধে

[১]. আল কুরআন : সূরা তাওবা, ৯:১০০।
[২]. আল কুরআন : সূরা নিসা, ৪:৪৩।
[৩]. আল কুরআন : সূরা নিসা, ৪:৪৩।

হযরত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে কুফ্ফার সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন। বন্দি হওয়ার পর তিনি হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর কাছে গর্ব করে বলেছিলেন যে তাঁরা 'মসজিদে হারাম মেরামত, কা'বা গৃহের ছাউনির কাপড় ও হাজ্বীদেরকে পানি সরবরাহ করছিলেন।' এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা একখানা আয়াতে করীমা অবতীর্ণ করেন, যা'তে উদ্দেশ্য করা হয়েছে,

> –মুশরিকবর্গ কর্তৃক মসজিদ মেরামত সহীহ (বৈধ/গ্রহণীয়) নয়; তারা যে কাজের বড়াই করে আমি তা নিশ্চিহ্ন করবো এবং তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো।

ফলে হযরত আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর প্রাপ্য জবাব তিনি পেয়ে যান। তবে এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, যার উদ্দেশ্য নিম্নরূপ:

> –যারা বিশ্বাস করেছে, মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেছে এবং আল্লাহর খাতিরে জ্বিহাদ করেছে, তাদের মকাম উচ্চে; আমার রহমত (করুণা), রেযামন্দি (সন্তুষ্টি) ও বেহেশতের সুসংবাদ তাদের প্রতি। তারা বেহেশতে চির কল্যাণপ্রাপ্ত।

অতঃপর সর্ব-হযরত আব্বাস ও আবূ সুফিয়ান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা ঈমানদার হন। ফতেহ মক্কার (মক্কা বিজয়ের) বছর তাঁরা মক্কা হতে মদীনায় হিজরত করেন। তাইফ যুদ্ধে আবূ সুফিয়ান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর এক চোখ হারান। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে শুভসংবাদ দেন যে তিনি বেহেশতী হবেন। খলীফা আবূ বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর শাসনামলে সংঘটিত ইয়ারমুকের পবিত্র জ্বিহাদে তিনি তাঁর দ্বিতীয় চোখটিও হারিয়ে ফেলেন এবং অল্প কিছু সময় পরে ওই একই যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন।

[২৭]

সিফফীনের যুদ্ধে ষড়যন্ত্রের হোতা ইবনে সাবা' ও তার দল

শিয়া লেখক বলে, "সিফফীনের যুদ্ধে উভয় বাহিনীর সত্তর হাজার মানুষ মারা যায়। এদের মধ্যে পঁচিশ হাজার ছিলেন হযরত আলী মুরতযা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর সমর্থক। এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধের হোতা কে?"

'তোহফা' শীর্ষক পুস্তকের একটি অধ্যায় ইতিপূর্বে আমাদের এ বইয়ের ১৬ নং অধ্যায়ে অনুবাদ করে আমরা ব্যাখ্যা করেছি যে ওই যুদ্ধটি আবদুল্লাহ ইবনে

সাবা' নামের এক ইহুদী ও তার অনুসারী 'সাবা'ইয়্যা' যিনদিক গোষ্ঠীর উস্কানিতে সংঘটিত হয়েছিল। তথাপিও সাবা'ইয়্যা গোষ্ঠীর অনুসারীরা আজো এই ইহুদী চক্রান্তের দায় হযরত আমীরে মোআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর ঘাড়ে চাপাতে এবং এর ফলশ্রুতিতে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিতে অপতৎপর।

[২৮]

সর্ব-হযরত তালহা (রাঃ) ও যুবায়র (রাঃ) এজতেহাদ প্রয়োগ করেননি

ওই শিয়া লেখক বলে, "আশারা-এ-মোবাশশারা'র দুজন তালহা ও যুবায়র, যারা জঙ্গে জামাল তথা উটের যুদ্ধে আয়েশা সিদ্দীকার পক্ষাবলম্বন করেছিলেন, তারা নিজেদের পূর্ববর্তী ভুল ইজতেহাদ বুঝতে পেরে যুদ্ধস্থল ত্যাগ করেন।"

এই দুই সাহাবী, যাঁদেরকে বেহেশতপ্রাপ্তির সুসংবাদ দেয়া হয়েছিল, তাঁরা হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে ইজতেহাদ প্রয়োগ করেননি। উত্থাপিত এ অভিযোগ দ্বারা বিভ্রান্ত চক্রটি ওই দুজন মহান ব্যক্তিকে কলঙ্কিত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত; অথচ দুজন সাহাবী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-কেই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অত্যন্ত পছন্দ করতেন এবং তাঁদেরকে তিনি বেহেশতের আগাম সুসংবাদ জানিয়েছিলেন। হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু) তাঁদের সাথে সাক্ষাৎ হওয়ার পর যখন বলেন যে তিনি মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করতে অনিচ্ছুক, তখন তাঁরা বুঝতে পারেন যে ইহুদী চক্র তাঁদেরকে ধোকা দিয়েছিল। আর তাই তাঁরা যুদ্ধ ত্যাগ করেন।

[২৯]

হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে যাওয়া সাহাবাবৃন্দ মূলতঃ সন্ধি করতে চেয়েছিলেন

ওই লেখক বলে, "হযরত তালহা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর বেসালপ্রাপ্তির সময় তাঁর পাশ দিয়ে অতিক্রমকারী হযরত আলী মোরতাদা (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর জনৈক অনুসারীকে তিনি চিনতে পেরে তাকে বলেন, 'আপনার হাত বাড়িয়ে দিন! হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর নামে আমি আপনার হাতে বায়ত হবো'।"

হযরত আয়েশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) ও তাঁর পক্ষাবলম্বনকারী সাহাবা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-বৃন্দ বলেন যে তাঁরা বসরায় এসেছিলেন হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর সাথে যুদ্ধ করতে নয়, বরং তাঁরই সাথে একটি সন্ধি করতে, তাঁরই হাতে বায়ত গ্রহণ করতে এবং ফিতনা-ফাসাদের অবসান ঘটাতে। *'কেসাস-এ-আম্বিয়া'* গ্রন্থের ৪১৮ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ আছে: "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বেসালপ্রাপ্তির পর খলীফা কে হবেন তা নিয়ে আলাপ-আলোচনা যখন চলছিল, তখন যুবায়র ইবনে আওয়াম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) নিজ তরবারি বের করে বলেন যে হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর হাতে বায়া'ত (আনুগত্য স্বীকার) না হলে তিনি তরবারি খাপবদ্ধ করবেন না।" এই একই যুবায়র (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু), যিনি বেহেশতী হবার আগাম সুসংবাদপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, তিনি হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর বিরুদ্ধে (যুদ্ধরত) হযরত আয়েশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)-এর দলে ছিলেন। *কেসাস-এ-আম্বিয়া* গ্রন্থের এ উদ্ধৃতি প্রমাণ করে যে ওই সকল সাহাবী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) যাঁদের ইজতেহাদ হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর ইজতেহাদের সাথে মিলে নি, তাঁরাও তাঁকে খেলাফতের জন্যে তাঁদের চেয়ে উত্তম ও যোগ্য মনে করতেন এবং তাই তাঁর সাথে একটি সন্ধিতে উপনীত হতে তাঁরা আগ্রহী ছিলেন। আমরা এ বইয়ের ১৬তম অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করেছি ইহুদী ষড়যন্ত্রের ফলশ্রুতিতে কীভাবে জঙ্গে জামাল (উটের যুদ্ধ) আরম্ভ হয়েছিল। ওপরে উদ্ধৃত গ্রন্থের লেখনী থেকে প্রতীয়মান হয় যে আমাদের এই সিদ্ধান্তটি সঠিক। মুজতাহিদবৃন্দের জন্যে ইজতেহাদ প্রয়োগ করা পাপ নয়। তাহলে তাঁদের এজতেহাদ পরিবর্তন করাটা কেন তাঁদের জন্যে নেক (পুণ্যদায়ক) কর্ম হবে?

[৩০]

মা আয়েশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)-এর সন্ধি উপলক্ষে বাইরে বেরোনো নিয়ে কূটতর্ক ও তার জবাব

ওই লেখক বলে, "একটি আয়াতে করীমায় আদেশ করা হয়েছে: 'তোমাদের ঘরে অবস্থান করো। বাইরে যেয়ো না! যুদ্ধবিগ্রহে জড়িয়ে পড়ো না!' তিনি (আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা) এই আয়াত থেকে নিজের ভুল উপলব্ধি করেন।"

এ আয়াত শরীফ যদি কখনোই ঘরের বাইরে যেতে নেই বলে বেরোনোকে বারণ করে থাকে, তাহলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এটি

নাযিল হওয়ার পর তাঁর বিবি সাহেবাবৃন্দকে হজ্জ, উমরাহ কিম্বা জ্বিহাদের ময়দানে যাত্রার সময় সাথে করে নিতেন না। তাঁদের (বাপের বাড়িতে) পিতা-মাতাকে দেখার জন্যে বা অসুস্থ ও শোকসন্তপ্তদের দেখাশোনা করার উদ্দেশ্যেও বেরোতে দিতেন না। এটি নিশ্চিত যে বাস্তব অবস্থা একেবারেই ভিন্ন। প্রকৃতপক্ষে, ওপরোক্ত আয়াতে মহিলাদেরকে পর্দা ছাড়া বেরোতে নিষেধ করা হয়েছে। ধর্মীয় কারণে বাইরে যেতে এটি নিষেধ করে না, শুধু শর্তারোপ করে যে তাঁরা নিজেদেরকে আচ্ছাদিত করবেন। হযরত আয়েশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) ছিলেন আসহাবে কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-দের মধ্যে অন্যতম সেরা একজন। আসহাব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-মণ্ডলীর অনুরোধক্রমে তিনি খেলাফতের হক্কদার হযরত উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর হত্যার বিচার চাইতে সেখানে যান। শিয়া মতবাদের বইপত্র অনুযায়ী, খলীফা হযরত আবূ বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর খেলাফত আমলে হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু) তাঁর স্ত্রী হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)-কে একটি জানোয়ারের পিঠে সওয়ারী করে সারা মদীনা নগরী ঘুরিয়ে আনেন। দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ফারূক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর শাসনামলে যওজাত-এ-তাহেরাত (মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র বিবি সাহেবান)-বৃন্দ আসহাব-এ-কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-মণ্ডলীর সাথে হজ্জে যেতেন।

[৩১]

আমীরে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বাগী/বিদ্রোহী নন, বীর মোজাহিদ

ওই লেখক বলে, "রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আম্মার ইবনে ইয়াসারের মুখে আঘাত করে বলেন, 'তুমি একদল বিদ্রোহীর হাতে নিহত হবে।' এই বর্ণনা প্রতীয়মান করে যে মোয়াবিয়া ও তার সহযোগীরা বিদ্রোহী ছিল। আম্মার যখন শহীদ হন, এই রিওয়ায়াতটি সম্পর্কে যাঁরা জানতেন তাঁরা তখন মোয়াবিয়ার দলত্যাগ করে হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর দলে যোগ দেন। বাগী অর্থ বিদ্রোহী, অভ্যুত্থানকারী।" লেখক আরো জানায় এই তথ্য সে *'কেসাস-এ-আম্বিয়া'* গ্রন্থ হতে উদ্ধৃত করেছে।

আমরা *'কেসাস-এ-আম্বিয়া'* গ্রন্থে এব্যাপারে অনুসন্ধান করেছি এবং তাতে এমন কোনো লেখা দেখিনি যার মধ্যে বলা হয়েছে হযরত আম্মার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর শাহাদাতের বর্ণনাটি সম্পর্কে ওয়াকেফহাল সাহাবী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-বৃন্দ হযরত আমীরে মোয়াবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর দলত্যাগ করে

হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর দলে যোগ দিয়েছিলেন। ওই গ্রন্থটিতে লিপিবদ্ধ আছে যে যুদ্ধ আরও গুরুতর আকার ধারণ করেছিল এবং হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর দলেই কিছু মতপার্থক্য দেখা দিয়েছিল। হযরত আম্মার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-সম্পর্কিত হাদিসটি, যেটি ওই লেখকও উদ্ধৃত করেছে, সেটি প্রমাণ করে যে হযরত আমীরে মোয়াবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ও হযরত আমর ইবনে আস্ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর মতো অন্যান্য সাহাবী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-বৃন্দ অবিশ্বাসী ছিলেন না। এসব ব্যক্তি কুফ্‌ফারদের সাথে জ্বিহাদে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে যোগ দিয়েছিলেন।

'কেসাস-এ-আম্বিয়া' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে: মক্কা বিজয়ের একই সালে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আম্মানের (জর্দানের) শাসক জাফরকে একটি চিঠি লেখেন এবং হযরত আমর ইবনে আস্ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর মাধ্যমে তা প্রেরণ করেন।

তায়েফ নগরীর মানুষেরা মুসলমান হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আবূ সুফিয়ান বিন হারবকে সেখানে পাঠিয়ে তাঁকে দিয়ে আল-লাত মূর্তির ধ্বংস সাধন করান। আবূ সুফিয়ান ও তাঁর পুত্র ইয়াযীদ এবং মোআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) ছিলেন মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাতেব (ওহী-লেখক)। সর্ব-হযরত খালেদ বিন যায়দ আবূ আইয়ুব আনসারী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এবং আমর ইবনে আস্ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-ও ছিলেন তাঁর সম্মানিত কাতেব। শেষোক্ত জনকে (আমরকে) হযরত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সেনাপ্রধান পদে নিয়োগ দেন। আবূ সুফিয়ান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে তিনি নাজরান অঞ্চলের প্রাদেশিক শাসনকর্তা পদে নিয়োগ করেন। আর তাঁর ছেলে ইয়াযীদকে (মোআবিয়ার ছেলে নন) মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তায়মা এলাকায় বিচারক পদে নিয়োগ করেন।

রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বেসালপ্রাপ্তির সময় হযরত আমর ইবনে আস্ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) আম্মানে অবস্থান করছিলেন। মদীনায় ফেরার পর সাহাবা-এ-কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) তাঁকে ঘিরে ধরে জিজ্ঞেস করেন তিনি পথে কী দেখে এসেছেন। তিনি বলেন, "আমি দেখলাম আম্মান থেকে মদীনা পর্যন্ত স্থানসমূহে বসবাসকারী আরবীয় গোত্রগুলো ইতোমধ্যেই

বিদ্রোহী (রিদ্দাহ) হয়ে গিয়েছে এবং আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে তৈরি রয়েছে।" এমতাবস্থায় খলীফা আবূ বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) সাহাবী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-বৃন্দের বিভিন্ন দলকে বিভিন্ন রিদ্দাহ গোত্রের দমনে প্রেরণ করেন। হুদা'আ বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে হযরত আমর ইবনে আস্ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর সেনাপতিত্বে এক দল সৈন্যকেও তিনি প্রেরণ করেন।

আসর আস্ সা'আদা তথা কল্যাণ ও সমৃদ্ধির যুগে হযরত আমর ইবনে আস্ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে সা'আদ, হুযাইফা ও উযরা গোত্রগুলো থেকে যাকাত সংগ্রহের দায়িত্ব ইতিপূর্বে দেয়া হয়েছিল। পরবর্তীকালে তাঁকে আম্মানে বিচারক পদে নিয়োগ করা হয় এবং তিনি আম্মান থেকে প্রত্যাবর্তন করলেই তাঁকে তাঁর পূর্ববর্তী দায়িত্ব ফেরত প্রদানের প্রতিশ্রুতিও দেয়া হয়। আম্মান থেকে ফেরার পর খলীফা হযরত আবূ বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) তাঁকে আগে তিনি যে কাজ করতেন সেই যাকাত সংগ্রহের উদ্দেশ্যেই বাইরে পাঠান; ফলে তাঁর প্রতি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কৃত ওয়াদা পূরণ হয়ে যায়। রিদ্দাহ তথা ধর্মত্যাগীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে খলীফাতুল মুসলেমীন তাঁকে কোনো গোত্রের কর্তৃত্ব-ক্ষমতা দিতে মনস্থ করেন। তিনি তাঁকে পত্র-মারফত জানান, "আমি তোমাকে তোমার পূর্ববর্তী দায়িত্বে পুনর্বহাল করেছি যাতে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অঙ্গীকার পূরণ হয়। এক্ষণে আমি তোমাকে এমন এক দায়িত্বভার দিতে চাই যা তোমার জন্যে ইহ ও পরকাল উভয় জগতেই অধিকতর উপকারী হবে।" হযরত আমর ইবনে আস্ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) উত্তর দেন: "আমি হলাম ইসলামের তীরগুলোর মধ্যে একটি। আল্লাহ তা'আলার পরে আপনিই সে ব্যক্তি যিনি ওই তীরগুলো ছুঁড়বেন এবং সেগুলো সংগ্রহ করে ফেরত নেবেন। যে তীর সবচেয়ে শক্তিশালী ও কার্যকর, তা-ই নিক্ষেপ করুন।" এমতাবস্থায় হযরত খলীফা তাঁকে একটি গোত্রের দায়িত্ব অর্পণ করেন। তিনি তাঁকে ফিলিস্তিন হয়ে আয়লায় প্রেরণ করেন। আর আবূ সুফিয়ান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর পুত্র ইয়াযীদকে আরেকটি গোত্রের প্রধান করে বেলকা হয়ে দামেস্কের সন্নিকটে একটি এলাকায় পাঠানো হয়। আবূ সুফিয়ান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর দ্বিতীয় পুত্র মুয়াবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে তাঁরই ভাইয়ের অধীনে অপর এক গোত্রের আমীর করা হয়। সম্রাট হিরাক্লিয়াস্ তাঁর ভাইয়ের নেতৃত্বে এক লক্ষ সৈন্যের একটি দলকে হযরত আমর ইবনে আস্ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্রেরণ করেন। আর ইয়র্গী নামের এক বাইজেন্টাইনীয় রোমান সেনাপতির নেতৃত্বে আরেকটি

শক্তিশালী বাহিনীকে তিনি ইয়াযীদের বিরুদ্ধে পাঠান। এ সময় সম্রাট হিরাক্লিয়াস হুমস্ নগরীতে অবস্থান করতে থাকেন। খলীফা হতে প্রাপ্ত নির্দেশ অনুযায়ী ইসলামী বাহিনী ইয়ারমুকে সমবেত হন। বাইজেন্টাইনীয় রোমান বাহিনীও তাঁদের মুখোমুখি জড়ো হয়। মুসলমানবৃন্দ আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থাকে বেছে নেন এবং খলীফার কাছে সাহায্য চেয়ে দূত পাঠান। খলীফার নির্দেশক্রমে হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু), যাঁকে 'আল্লাহর তরবারি' বলে ডাকা হতো, তিনি দশ হাজার সৈন্যের একটি শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে ইরাক ছেড়ে হযরত আমর ইবনে আস্ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর নেতৃত্বাধীন মুসলিম বাহিনীতে যোগ দেন। আজনাদিন এলাকায় সংঘটিত রক্তক্ষয়ী এক যুদ্ধে বাইজেন্টাইনীয় রোমান বাহিনীর শোচনীয় পরাজয় ঘটে। অতঃপর ইয়ারমুকে সংঘটিত আরেকটি কঠিন যুদ্ধে দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার বাইজেন্টাইনীয় সেনার মোকাবেলা করেন ছিচল্লিশ হাজার মুসলিম সৈন্য, যাঁদের মধ্যে ছিলেন এক হাজার সাহাবা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)। আর এই এক হাজারের মধ্যে এক'শ জন ছিলেন বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)। হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে সর্বসম্মতিক্রমে সেনাপতি নির্বাচন করা হয়। হযরত আমর বিন আস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ও শারহাবিল (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) সেনাবাহিনীর ডান দিকের অংশকে নেতৃত্ব দেন; আর ইয়াযীদ বিন আবি সুফিয়ান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ও কা'ক্কা বাঁ দিকের অংশের নেতৃত্বে থাকেন। আবূ সুফিয়ান বিন হারব্ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর বীরত্বপূর্ণ অবদানগুলো দ্বারা সৈন্যদের উৎসাহিত করেন। এই যুদ্ধ খুবই রক্তক্ষয়ী হয়। এক লাখ বাইজেন্টাইনীয় রোমান সৈন্য তাদের সম্রাটের ভাইসহ মৃত্যুবরণ করে। আবূ সুফিয়ান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর পবিত্র চোখে তীর বিঁধলে তিনি অন্ধ হয়ে যান। বাইজেন্টাইনীয় বাহিনী জর্দানে অবস্থিত আশি হাজার সৈন্যের একটি শক্তিশালী দলকে দিয়ে আরেকটি আক্রমণ পরিচালনা করে। হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) মুসলিম বাহিনীর কেন্দ্রভাগে অবস্থান নেন এবং সর্ব-হযরত আমর ইবনে আস্ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ও আবূ উবায়দা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) দুপ্রান্ত থেকে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। এতে বাইজেন্টাইনীয় রোমান বাহিনী শোচনীয় পরাজয় বরণ করে। তাদের সামান্য কয়েকজন প্রাণে রক্ষা পায়।

খলীফা হযরত উমর ফারূক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর শাসনামলে মুসলমানবৃন্দ দামেস্ক অবরোধ করেন। ওর একটি ফটক হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ

(রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) দখল করেন, আরেকটি দখল করেন হযরত আমর ইবনে আস্ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু); তৃতীয় আরেকটি ফটক দখল করেন ইয়াযীদ বিন আবি সুফিয়ান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)। ইয়াযীদ তাঁর ভাই (আমীরে মোয়াবিয়া)-কে সৈন্যবাহিনীর অগ্রভাগের সেনাপতি পদে নিয়োগ করেন। অতঃপর তিনি (আমীরে মোয়াবিয়া) সায়দা (সিডোন) ও বৈরুত জয় করে নেন। অপরদিকে, হযরত আমর ইবনে আস্ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) জয় করেন প্যালেস্টাইন। তিনি ফিলিস্তিন রাজ্যে মুসলিম সেনাবাহিনীর প্রধান ছিলেন। আমীরুল মো'মেনীন খলীফা হযরত উমর ফারূক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ঘনঘন হযরত আমর ইবনে আস্ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাছে (সেনা) সাহায্য পাঠাতে থাকেন। হযরত আমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর বুদ্ধিমত্তা সর্বজনবিদিত ছিল এবং তিনি ছিলেন খুব পারদর্শী প্রশাসকও। তিনি একটি সেনাদল জেরুসালেমে প্রেরণ করেন; আরেকটি প্রেরণ করেন রামাল্লায়। অপরদিকে, হযরত আমীরে মোয়াবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) কায়সারিয়্যা নগরী অবরোধ করেন। নগরীতে অনেক শত্রুসেনা অবস্থান করছিল, তারা মুসলিম বাহিনীকে আক্রমণ করে বসে। কিন্তু হযরত মোয়াবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) তাদের সমস্ত আক্রমণ প্রতিহত করেন। ইত্যবসরে হযরত আমর ইবনে আস্ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বাইজেন্টাইনীয় রোমান বাহিনীর প্রধান সেনাপতিকে মোকাবেলা করে তাকে সম্পূর্ণভাবে পরাভূত করেন। ফলে গাযা ও নাবলুস শহরগুলো তাঁর কব্জায় চলে আসে। খলীফা হযরত উমর ফারূক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) জেরুসালেম অভিমুখে যাত্রা করেন, আর হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-কে তাঁর অনুপস্থিতিতে মদীনায় শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে যান। খলীফাকে সর্ব-হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু), আমর ইবনে আস্ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ও শারহাবিল (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) কোলাকুলি করে স্বাগত জানান। অতঃপর বাইজেন্টাইনীয় রোমানবর্গ হযরত উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাছে জেরুসালেম সমর্পণ করে। ইরানে সংগৃহীত গনীমতের মালামাল যিয়াদ ইবনে আবিহ কর্তৃক মদীনায় স্থানান্তরিত হয়। তিনি খলীফার কাছে ইরানে সংঘটিত বিভিন্ন যুদ্ধের স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল বর্ণনা দেন। ইয়াযীদকে দামেস্কের প্রাদেশিক শাসনকর্তা পদে নিয়োগ করা হয়। হযরত মোয়াবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) কায়সারিয়্যা নগরী জয় করে নেন। দামেস্কের শাসনকর্তা ইয়াযীদ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করলে তাঁর ভাই আমীরে মোয়াবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে দামেস্কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করা

হয়। এছাড়াও সিরীয় বাহিনীর সেনাপতি হযরত আবূ উবায়দা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এবং তাঁর স্থলাভিষিক্ত হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন। যখন হযরত আমর ইবনে আস্ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) সেনাপ্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তিনি সর্বসাধারণকে পাহাড়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন; এর ফলে ওই মহামারী দূর হয়। হযরত আমর ইবনে আস্ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে মিসর অভিযানেও সেনাবাহিনীর প্রধান পদে নিয়োগ করা হয়। এক মাসব্যাপী যুদ্ধশেষে বাইজেন্টাইনীয় বাহিনী পরাজয় বরণ করে। মুসলমান বাহিনী মিসরে প্রবেশ করেন। এই যুদ্ধে হযরত আমর বিন আস্ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বড় পাথর নিক্ষেপের জন্যে গুলতি তথা উৎক্ষেপক যন্ত্র ব্যবহার করেন। রোমান রাজা হেরাক্লিয়াস ইস্তাম্বুলে বিশাল বাহিনী প্রস্তুত রেখেছিলেন; তারা হযরত আমর ইবনে আস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর বিরুদ্ধে অগ্রসর হতে থাকে। এমতাবস্থায় রাজা হেরাক্লিয়াস পথিমধ্যে মারা যান, আর হযরত আমর ইবনে আস্ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) তিন মাস দীর্ঘ এক যুদ্ধশেষে আলেকজান্দ্রিয়া জয় করে নেন। এরপর তিনি ত্রিপোলী (বর্তমান লিবিয়ার রাজধানী)-এর দিকে অগ্রসর হন, যেটি তিনি মাসব্যাপী এক যুদ্ধশেষে জয় করেন। খলীফা হযরত উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর শাহাদাত হলে তাঁর পুত্র উবায়দুল্লাহ পিতার হন্তা মনে করে সাবেক পারসিক রাজা হরমুযানকে হত্যা করেন। এতে হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু) বলেন উবায়দুল্লাহর বিরুদ্ধে বদলা নিতে হবে। মিসরের শাসনকর্তা হযরত আমর ইবনে আস্ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) যিনি ওই সময় ছুটিতে ছিলেন, তিনি হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর সাথে দ্বিমত পোষণ করেন এ কথা বলে, "কোনো পুত্র সন্তানকে তার বাবার মৃত্যুর অল্পকাল পর হত্যা করার ন্যায্যতা কীভাবে প্রতিপাদনযোগ্য হতে পারে?" হযরত উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) যিনি তখন খলীফা পদে দায়িত্বরত ছিলেন, তিনি এই বক্তব্যকে অনুমোদন করেন এবং রক্তের বদলে রক্ত, এ শাস্তি মওকুফ করে আর্থিক ক্ষতিপূরণের হুকুম দেন; আর ওই ক্ষতিপূরণ খলীফা তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তি থেকেই পরিশোধ করেন। এটি ছিল ইজতেহাদগত মতপার্থক্য। হযরত আমীরে মোয়াবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ইতোমধ্যে এশিয়া মাইনরে বেশ কিছু জিহাদ পরিচালনা করেছিলেন এবং 'আমুরিয়্যা' নগরী পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন। খলীফা উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হযরত আমর ইবনে আস্ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে মিসরের শাসনকর্তার পদ থেকে অব্যাহতি দেন। খলীফার

পরিকল্পনা ছিল আন্দালুসিয়া (স্পেন) হয়ে ইস্তাম্বুল তিনি জয় করবেন। তাই তিনি আন্দালুসিয়ায় সৈন্য অবতরণ করান। দামেস্কের সেনাপ্রধান আমীরে মোয়াবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) সাইপ্রাসে জাহাজে করে সৈন্য প্রেরণ করেন। এই সেনাবাহিনী মিসর থেকে প্রেরিত বাহিনীর সহায়তা নিয়ে পরপর অনেক যুদ্ধশেষে ওই দ্বীপটি জয় করে নেন।

কনস্টান্টাইন ৩য়, যিনি ইস্তাম্বুল নগরীর কায়সার (সিজার) ছিলেন, তিনি ৪৭ হিজরী মোতাবেক ৬৬৮ খৃষ্টাব্দে বাইজেন্টাইনীয় সম্রাট পদে অধিষ্ঠিত হন এবং ৬৬ হিজরী/ ৬৮৫ খৃষ্টাব্দে মারা যান। তিনি বিশাল এক নৌবহর নিয়ে ভূমধ্যসাগরে পাড়ি জমান। এদিকে, হযরত আমীরে মোয়াবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ও মিসরীয় প্রাদেশিক শাসনকর্তা আবদুল্লাহ আপন আপন নৌবহরসহ অগ্রসর হন। এই প্রসিদ্ধ নৌযুদ্ধে মুসলমান নৌবাহিনী বিজয় লাভ করেন। হিজরী ৩৩ তম সালে হযরত আমীরে মোয়াবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) যখন দামেস্কের প্রাদেশিক শাসনকর্তা ছিলেন, তখন তিনি বাইজেন্টাইনীয় এলাকাগুলোর ভেতরে অভিযান পরিচালনা করে বসফোরাস্ পর্যন্ত পৌঁছে যান। এই হযরত মোয়াবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-ই হলেন সেই সম্মানিত সাহাবী, যিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাতেব তথা সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

ইসলাম ধর্মের প্রতিষ্ঠাকল্পে হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু) নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সিংহের মতো শত্রুর মোকাবেলা করেন। অনেক অবিশ্বাসী তাঁর তরবারির আঘাতে নিহত হয়। হযরত মোয়াবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-ও আরেকজন নির্ভীক ব্যক্তি, যিনি ইসলামের প্রচারে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিতে কুণ্ঠিত হননি; আর তিনি পূর্ব ও পশ্চিমে ধর্মের জ্যোতি বিচ্ছুরণের উদ্দেশ্যে বাইজেন্টাইনীয় বাহিনীকে মোকাবেলা করেন। অনেক রাজ্য তাঁর দ্বারা বিজিত হয়।

আবদুল্লাহ ইবনে সাবা' নামের জনৈক ইহুদী জাতি হতে ধর্মান্তরিত নও-মুসলিম মিসরে বহু লোককে পথভ্রষ্ট করে। খেলাফত একমাত্র হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এরই হক্ক (অধিকার), এ মর্মে ধারণা মানুষের মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়ে সে তাদেরকে বিদ্রোহ করতে উস্কানি দেয়। হযরত আমর ইবনে আস্ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) যদি ওই সময় মিসরীয় প্রাদেশিক শাসনকর্তার দায়িত্বে থাকতেন, তাহলে তিনি এই ফিতনার বিস্তার হতে দিতেন না। কুফা

নগরীতে কিছু লোক কোনো কারণে তাদের দেশের প্রাদেশিক শাসনকর্তার প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে খলীফা উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর প্রতি কুৎসা রটনা আরম্ভ করে। খলীফা তাদেরকে দামেস্কে নির্বাসন দেন, আর দামেস্কের প্রাদেশিক শাসনকর্তা আমীরে মোয়াবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে এক পত্র-মারফত বলেন, "এই লোকদেরকে (সৎ)-পরামর্শ দিন!" হযরত মোয়াবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এই লোকদের কাছে কুরাইশ গোত্রের প্রশংসা করেন এবং বলেন, "রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে তাঁর সেবায় নিয়োগ করেন। অতঃপর তাঁর তিনজন খলীফাও আমাকে প্রাদেশিক শাসনকর্তা পদে নিয়োগ দিয়েছেন এবং আমার প্রতি রাজি (সন্তুষ্ট) হয়েছেন।" তিনি ওই লোকদেরকে খুব আন্তরিকভাবে পরামর্শ দেন। কিন্তু তারা তাঁর কথা শুনতে রাজি হয়নি। তাই তিনি তাদেরকে হুমস্ নগরীতে পাঠিয়ে দেন। ওই নগরীর প্রাদেশিক শাসনকর্তা আবদুর রাহমান বিন ওয়ালীদ তাদের সাথে কঠোর আচরণ করেন এবং তাদেরকে তাওবা করার হুমকি প্রদান করেন। খলীফা হযরত উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) সর্ব-হযরত আমীরে মোয়াবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু), আমর ইবনে আস্ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এবং আরো তিনজন প্রাদেশিক শাসনকর্তাকে মদীনায় ডেকে পাঠান এবং তাঁদের মতামত জানতে চান। আমীরে মোয়াবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) অভিমত পোষণ করেন এই মর্মে যে খলীফার উচিত "শাসনকর্তাদেরকে আরো বেশি উদ্যোগ নেয়ার সুযোগ দেয়া।" কিন্তু হযরত আমর ইবনে আস্ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, "মহামান্য খলীফা, আপনি ও বনী উমাইয়্যা (উমাইয়া বংশ), মানুষের প্রতি আপনাদের আস্থা স্থাপন করেছেন। আপনারা তাদের প্রতি অতিশয় (মানে অতি মাত্রায়) করুণাশীল হয়েছেন। হয় শক্ত হোন, নয়তো (ক্ষমতা) ছেড়ে দিন, নতুবা আরো কর্তৃত্ব প্রদর্শন করুন।"

ইত্যবসরে মিসরে অবস্থানকারী ইবনে সাবা' তার লোকদের সাথে সময় মাফিক যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছিল। "অমুক প্রাদেশিক শাসনকর্তা মানুষের প্রতি অত্যাচার করেন", এ জাতীয় মিথ্যে কাহিনী বানিয়ে তারা কাছে ও দূরে ছড়িয়ে দিচ্ছিল। খলীফা উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) মিথ্যে অভিযোগগুলো সম্পর্কে শুনেছিলেন (যেগুলোর বেশির ভাগই প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের বিরুদ্ধে ছিল)। তিনি প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের ডেকে এসব অভিযোগের কারণ জিজ্ঞেস করেন। হযরত আমীরে মোয়াবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, "আপনি আমাকে প্রাদেশিক শাসনকর্তার পদে নিয়োগ করেছেন। আর আমি অনেক

মানুষকে (সরকারি) কর্মকর্তা পদে নিয়োগ দিয়েছি। আপনি তাদের কাছ থেকে উত্তম কর্ম ও ভালাই পাবেন। প্রত্যেকেই তার নিজ নিজ রাজ্যকে অধিকতর ভালোভাবে চেনেন এবং শাসন করে থাকেন।" সা'আদ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, "এই গুজবের সবই কুৎসাপূর্ণ। এগুলো গোপনে প্রচার করা হচ্ছে। আর মানুষ তাতে বিশ্বাসও করছে। যারা এগুলো বানিয়ে প্রচার করছে, তাদেরকে খুঁজে বের করে হত্যা করতে হবে।" হযরত আমর ইবনে আস্ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, "আপনি (খলীফা) খুবই নরম আচরণ করেছেন। প্রয়োজনে আপনাকে আরো কঠোর হতে হবে।" এমতাবস্থায় খলীফা উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) প্রাদেশিক শাসনকর্তাদেরকে সাথে নিয়ে মদীনা মনোওয়ারায় গমন করেন। তিনি সেখানে সর্ব-হযরত তালহা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ও যুবায়র (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে তলব করেন। তাঁরা তাঁর সাথে দেখা করতে এলে হযরত মোয়াবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, "আপনারা (সাহাবীদ্বয়) হলেন আসহাব-এ-কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-এর মাঝে শ্রেষ্ঠজন। আপনারাই খলীফা নির্বাচন করেছেন। তিনি এখন বৃদ্ধ বয়সী। আপনারা তাড়াহুড়ো করে এগোবেন না।" এ কথায় ব্যথিত হয়ে হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু) বলেন, "আপনি চুপ করুন।" অতঃপর তাঁরা সবাই সভাস্থল ত্যাগ করেন। হযরত আমীরে মোয়াবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) খলীফাকে দামেস্কে আসার জন্যে আমন্ত্রণ জানান, কিন্তু খলীফা উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) তা ফিরিয়ে দেন। আমীরে মোয়াবিয়া এরপর প্রস্তাব করেন, "তাহলে আপনার সুরক্ষায় আমাকে একটি সেনাদল পাঠানোর সুযোগ দিন।" জবাবে খলীফা বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতিবেশীদের ওপর অন্যায়-অত্যাচার চাপিয়ে দিতে চাই না।" সবশেষে হযরত আমীরে মোয়াবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) যখন তাঁকে সতর্ক করেন এ কথা বলে, "আমি আশঙ্কা করি যে তারা আপনাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করতে পারে", তখন খলীফা বলেন, "আল্লাহ তা'আলা যা ডিক্রি (বিধান জারি) করে রেখেছেন, তা-ই ঘটবে।" অতঃপর হযরত মোয়াবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) নিজের সফরের পোশাক পরে সর্ব-হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু), তালহা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু), যুবায়র (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ও অন্যান্য সাহাবী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-বৃন্দের সাথে আলাপ সেরে খলীফাকে তাঁদের যত্নে রেখে সবার কাছ থেকে বিদায় নেন এবং দামেস্কের পথে রওয়ানা হন। যাবার আগে তিনি বলেন, "হযরত আবূ বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু

আনহু) এই দুনিয়া চাননি, দুনিয়াও তাঁর কাছে আসার চেষ্টা করেনি। দুনিয়া হযরত উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাছে আসার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। হযরত উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) দুনিয়ার সামান্য কিছু পেয়েছেন। আর আমাদের ক্ষেত্রে আমরা দুনিয়াতে ডুব দিয়েছি।"

ইবনে সাবার দলবল মিসর ও কুফায় জড়ো হয়ে হজ্জের বাহানায় মদীনা অভিমুখে যাত্রা করে। তারা সেখানে পৌঁছুলে হযরত উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে শহীদ করা হয়। দামেস্ক ও কুফা থেকে যখন উদ্ধারকারী সেনাদল পাঠানো হয়, ততোক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে।

"কেসাস-এ-আম্বিয়া" গ্রন্থের প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়কার সংস্করণ থেকে আমাদের উদ্ধৃত ওপরের লেখনী স্পষ্ট প্রতীয়মান করে সর্ব-হযরত আমীরে মোয়াবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ও আমর ইবনে আস্ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) কতো ঈমানদার ও প্রকৃত মুসলমান ছিলেন; সাহাবা-এ-কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর মাঝে তাঁদের মর্যাদা কতো উচ্চে ছিল; তাঁরা ইসলামের কতো বড় খেদমত করেছিলেন; কতো সক্রিয়ভাবে তাঁরা কাফেরচক্রের মোকাবেলা করেছিলেন। যদিও *'কেসাস-এ-আম্বিয়া'* গ্রন্থটির রচনায় আব্বাসীয় শাসনামলে রাষ্ট্রীয় সুবিধা অর্জনের উদ্দেশ্যে উমাইয়া শাসকদের সমালোচনাকারী পক্ষপাতদুষ্ট ইতিহাসবিদদের লেখনীর প্রভাব পড়েছিল, তবুও সেটি সঠিক তথ্য সরবরাহ করেছে যা আমরা ওপরে তুলে ধরেছি। জামাল (উটের) ও সিফফীনের দুটো যুদ্ধ সম্পর্কে আব্বাসীয় ইতিহাস পুস্তকগুলোতে যে কুৎসা বিদ্যমান, তা এই গ্রন্থে যুক্ত করা হয়েছে। এসব বর্ণনা ওই দুজন সাহাবা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) এবং হযরত আবূ সুফিয়ান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর শান-মান ও মর্যাদার সাথে একদম বেমানান। তবে আমরা ওপরে যেসব বিবরণ তুলে ধরেছি, সেগুলো দূরদৃষ্টি ও উপলব্ধিসম্পন্ন মানুষের জন্যে আসহাব-এ-কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য স্বীকারে এবং *'কেসাস-এ-আম্বিয়া'* গ্রন্থে তাঁদের বিরুদ্ধে বিদ্যমান অভিযোগ ও কুৎসার অসারতা অনুধাবনের বেলায় পর্যাপ্ত হবে।

[৩২]

মুহাম্মদ বিন আবী বকরের ঘটনা নিয়ে ধোকাবাজি ও তার জবাব

হুরুফী ওই লেখক বলে, "মুআবিয়া বিন হাদীদ, যিনি একজন সাহাবী ছিলেন এবং যাকে আমীরে মুআবিয়া কর্তৃক আমর ইবনে আসের সাহচর্যে মিসরে

পাঠানো হয়েছিল, তিনি হযরত আলী মুরতাদা (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর দূতদের একজন হযরত মুহাম্মদ বিন আবি বকরকে হত্যা করেন এবং তাঁকে একটি গাধার মৃতদেহের ওপর রেখে আগুন দ্বারা পুড়িয়ে ফেলেন। এই পৈশাচিকতা সম্পর্কে কী বলা উচিত তা কেউ ভাবতেই পারেন না।" হুরুফী লেখক আরো বলে যে এই তথ্য সে 'রওদাতুল আবরার' গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করেছে।

চলুন, এবার আমরা দেখি এই ব্যাপারে *'কেসাস-এ-আম্বিয়া'* গ্রন্থটি কী বলে: "হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর নিযুক্ত মিসরীয় প্রাদেশিক শাসনকর্তা মুহাম্মদ ইবনে আবি বকর মানুষের প্রতি এমন অত্যাচার-নিপীড়ন করেছিলেন যে সাধারণ মানুষ শেষমেশ তার বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নেন। অপর পক্ষে, সাহাবী মুআবিয়া বিন হাদীদ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু), যিনি ওই সময় মিসরে অবস্থান করছিলেন, তিনি খলীফা উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর রক্তের বদলা নেয়ার জন্যে আন্দোলন গড়ে তোলেন এবং মানুষজনকে নিজের অধীনে ঐক্যবদ্ধ করেন। হযরত আমীরে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) মিসরের নিয়ন্ত্রণ পুনরুদ্ধারের জন্যে হযরত আমর ইবনে আস্ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে সেখানে পাঠান। তথাপি মুহাম্মদ ইবনে আবি বকর (কেন্দ্রের বিরুদ্ধে) সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়েন। হযরত মুআবিয়া ইবনে হাদীদ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-ও (সৈন্যসহ) সেখানে উপস্থিত হয়ে হযরত আমর ইবনে আস্ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর বাহিনীর সাথে যোগ দেন। এতে মিসরীয় বাহিনী পরাজয় বরণ করে এবং মুহাম্মদ ইবনে আবি বকর আত্মগোপন করেন। মুআবিয়া ইবনে হাদীদ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) তাকে খুঁজে পান এবং হত্যা করেন। তিনি তার লাশ একটি গাধার মরদেহের ওপর রেখে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলেন। কেননা, মুহাম্মদ ইবনে আবি বকর ওই সব গুণ্ডা-বদমাইশদের দলেই যোগ দিয়েছিলেন, যারা মিসর হতে মদীনায় গিয়েছিল এবং হযরত উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে হত্যা করার জন্যে লোকজনকে উস্কানি দিয়েছিল। খলীফার বাড়ি ঘেরাওকারীদের একজন ছিলেন তিনি। হযরত ইমাম হাসান বিন আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) যিনি ওই সময় খলীফার বাড়ি পাহারা দিচ্ছিলেন, তিনি একটি তীরবিদ্ধ হয়ে মারাত্মক আহত হন। তাঁর মোবারক শরীর থেকে দরদর করে রক্ত বের হতে দেখে ভয়ে মুহাম্মদ ইবনে আবি বকর বলেন, 'বনূ হাশেম গোত্রের সন্তানবৃন্দ যদি এটি দেখেন, তাহলে তাঁরা আমাদের আক্রমণ করবেন এবং সবকিছু ভেস্তে যাবে। চলুন, আমরা আরো সংক্ষিপ্ত একটি উপায়/পন্থা

খুঁজে বের করি।' তিনি দুজন দুর্বৃত্তকে সাথে নিয়ে পার্শ্ববর্তী একটি বাড়ির দেয়াল টপকে হযরত উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর গৃহে প্রবেশ করেন। মুহাম্মদ ইবনে আবি বকরই সর্বপ্রথম ওই ঘরে প্রবেশ করেন। 'মুআবিয়া আপনাকে রক্ষা করতে পারবেন না', এ কথা বলে তিনি খলীফার পবিত্র দাড়ি মোবারক ধরে রাখেন। খলীফা উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ওই সময় কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন। তিনি মুহাম্মদ ইবনে আবি বকরের মুখের দিকে তাকান এবং বলেন, 'যদি তোমার বাবা এই অবস্থায় তোমাকে দেখতেন, তাহলে কতো বেদনার্তই না তিনি হতেন।' এ কথা শুনে ইবনে আবি বকর ওই স্থান ত্যাগ করেন। অতঃপর তার সাথীরা গৃহে প্রবেশ করে খলীফাকে শহীদ করে।" *'কেসাস-এ-আম্বিয়া'* গ্রন্থের এই উদ্ধৃতি থেকে পরিস্ফুট হয় যে খলীফার শাহাদাতের বদলা নেয়ার জন্যেই ইবনে আবি বকরকে হত্যা করা হয়েছিল। তথাকথিত ওই বইয়ের হুরুফী লেখক এই লোককে পোড়ানোর জন্যে আক্ষেপ করছে এবং এ ঘটনার জন্যে তরুণ বয়সীদের সম্পৃক্ততার কথা বলেছে। কিন্তু সে যদি বর্ণনা করতো অধিকাংশ উমাইয়া বংশীয় খলীফাদের কীভাবে আব্বাসীয় বংশ জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মেরেছে, কিংবা আহলুস্ সুন্নাহর জ্ঞান বিশারদদের, বিশেষ করে শিরওয়ানশাহ ও বাগদাদের প্রাদেশিক শাসনকর্তা বাকের পাশাকে জীবন্ত কীভাবে হুরুফী শিয়ারা আগুনে পুড়িয়ে মেরেছে, আর কীভাবে তারা হযরত ইমাম বায়দাবী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর হাড়গোড় কবর থেকে খুঁড়ে বের করে তা আগুনে জ্বালিয়ে দিয়েছে, তাহলে সহজেই সিদ্ধান্ত নেয়া যেতো কারা বেশি পৈশাচিকতা দেখিয়েছিল। হযরত আমীরে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) যখন মিসরের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেন, তখন তিনি হযরত আমর ইবনে আস্ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে সেই রাজ্যের প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। হযরত আমর ইবনে আস্ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ইতোমধ্যেই মিসরের প্রাদেশিক শাসনকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন; চার বছর খলীফা উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর খেলাফত আমলে এবং আরো চার বছর খলীফা উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর শাসনামলে। তেতাল্লিশ হিজরী সালে তিনি বেসালপ্রাপ্ত হলে হযরত আমীরে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর পুত্র আব্দুল্লাহকে মিসরে তাঁরই স্থলাভিষিক্ত করেন। দুবছর পর তিনি আব্দুল্লাহকে অব্যাহতি দেন এবং হযরত মুআবিয়া ইবনে হাদীদকে মিসরের প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। পঞ্চাশ হিজরী সালে তিনি হযরত মুআবিয়া ইবনে হাদীদ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কেও অব্যাহতি দেন এবং

তাঁর পক্ষীয় সাহাবী হযরত মাসলামা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে মিসর ও আফ্রিকার প্রাদেশিক শাসনকর্তা পদে নিয়োগ করেন। হযরত মুআবিয়া ইবনে হাদীদ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ৭৩ হিজরী সালে বেসালপ্রাপ্ত হন।

[৩৩]

হযরত আব্বাস (রা:)'র সন্তানদের কাল্পনিক হত্যাকাণ্ড ও আসল ইতিহাস

হুরুফী লেখক অভিযোগ করে, "মুআবিয়া হারামাইন শরীফাইনে (মক্কা ও মদীনায়) বুসর বিন আরতাদের নেতৃত্বে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন এবং নারী ও নিরপরাধ শিশুদেরকে হত্যা করান। এই ঘটনায় হযরত আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর নাতি পাঁচ বছর বয়সী আবদুর রহমান ও ছয় বছর বয়সী কুসামকে শহীদ করা হয়। এই শিশুদেরকে তাদের মা আয়েশার চোখের সামনেই হত্যা করা হয়। নিরুপায় মা এ বীভৎস হত্যাকাণ্ডে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন এবং জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত মাথা ও পা না ঢেকে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ান।" ওই হুরুফী লেখক আরো জানায় এই তথ্য সে 'আল-কামেল' ও 'আল-বয়ান ওয়াত্ তাবঈন' গ্রন্থ দুটো থেকে সংগ্রহ করেছে।

লেখকের উত্থাপিত অভিযোগের সমর্থনে যে বইগুলোকে সে পেশ করেছে, সেগুলো তারই হায়া-শরমহীনতার পরিচয় দেয়। কেননা, 'আল-বয়ান ওয়াত্ তাবঈন' বইটি আহলুস্ সুন্নাহর ঘোর বিরোধী এক মোতাযেলীর রচিত। এই ব্যাপারে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় সংস্কৃত *'তাযকিরা-এ-কুরতুবী'* পুস্তকে, যা নিম্নরূপ:

"সালিশ নিষ্পত্তিকারীদের সর্বসম্মত রায়ে খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পরে হযরত আমীরে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) তিন হাজার সৈন্যের এক বাহিনীকে বুসর বিন আরতাদের অধীনে হেজায অঞ্চলে প্রেরণ করেন, যাতে সেখানকার মানুষের আনুগত্য লাভ করা যায়। সেনাপতি প্রথমে মদীনায় গমন করেন। ওই দিনগুলোতে মদীনার প্রাদেশিক শাসনকর্তা ছিলেন হযরত খালেদ বিন যায়দ আবূ আইয়ুব আল-আনসারী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি), যিনি ছিলেন হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু) কর্তৃক নিযুক্ত। এই শাসনকর্তা গোপনে কুফার উদ্দেশ্যে নগরী ছাড়েন, যাতে সেখানে হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর সাথে যোগ দেয়া যায়। বুসর (মসজিদে নববীর) মিম্বরে আরোহণ করে বলেন, 'আপনারা খলীফা (উসমান)-এর জন্যে কী করেছেন, যাঁর কাছে আমি এক সময় বায়ত হয়েছিলাম? আমীরে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) আমাকে

নিষেধ না করলে আমি (এতোক্ষণে) আপনাদের সবাইকেই তরবারির মুখে দিতাম।' অতঃপর হযরত জাবের (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর নেতৃত্বে মদীনাবাসী জনগণ আনুগত্যের শপথ নেন। বুসর এরপর মক্কাবাসীদের কাছ থেকেও আনুগত্যের শপথ নেন। 'কাউকে না মারার' হযরত মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর নির্দেশ রয়েছে মর্মে বুসরের বক্তব্য থেকে পরিস্ফুট হয় যে তিনি মক্কা বা মদীনায় কাউকে হত্যা করেননি। তিনি এরপর ইয়েমেন গমন করেন। সেখানকার প্রাদেশিক শাসনকর্তা উবায়দুল্লাহ বিন আব্বাস কুফায় পালিয়ে যান, যেখানে হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু) অবস্থান করছিলেন। উলামা-এ-কেরামের মতানুযায়ী, উবায়দুল্লাহর পলায়নের পরই বুসর তাঁর দুই ছেলেকে হত্যা করেন। এমতাবস্থায় হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু) দুই হাজার সৈন্যের একটি বাহিনীকে হারিসাত ইবনে কুদামার নেতৃত্বে বুসরের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন [বুসর কোনো সাহাবী ছিলেন না]। হারিসা ইয়েমেনে এসে হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর শাহাদাত না হওয়া পর্যন্ত প্রাদেশিক শাসনকর্তার দায়িত্ব পালন করেন। তিনি অনেক মানুষকে হত্যা করেন। তাঁর মদীনায় গমনের পর সেখানকার আমীর হযরত আবূ হোরায়রাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) স্থান ছেড়ে চলে যান। হারিসা বলেন, 'আমি বিড়ালের বাবাকে পেলে হত্যা করতাম'।" অতএব, এটি পরিস্ফুট যে হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর নিযুক্ত সেনাপতি অত্যন্ত প্রিয়ভাজন ও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র প্রশংসিত একজন সাহাবীকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন এবং মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এরই দেয়া ডাক-নাম (আবূ হোরায়রাহ তথা বিড়ালের বাবা) নিয়ে উপহাস করেছিলেন। সর্ব-হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু) ও আমীরে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর মতো মহান ব্যক্তিত্বদের নিযুক্ত প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের নিষ্ঠুর কাজের দায় তাঁদেরই ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টা করা এবং বানোয়াট কাহিনী দ্বারা তা উপস্থাপনের প্রয়াস পাওয়া নেহাত-ই অন্যায় একটি কাজ।

[৩৪]

আমীরে মুআবিয়া (রা:) লা'নত প্রথা চালু করেননি

হুরুফী লেখক বলে, "মুআবিয়া তাঁর প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের প্রতি ফরমান জারি করেছিলেন যেন মসজিদের মিম্বরে হযরত আলী মুরতাদা (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু) ও তাঁর সন্তানদেরকে লা'নত তথা অভিসম্পাত দেয়া হয়। খলীফা উমর বিন আব্দিল আযীয এই অভিসম্পাতের প্রথা রহিত করেন। সাহাবা-এ-

কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-এর মধ্যে হযরত হাজর বিন আদী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে এবং সাতজন সাহাবীকে শহীদ করা হয়, কেননা তাঁরা হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-কে লা'নত দিতে অস্বীকৃতি জানান।" এ কথার পক্ষে সে *'আগানী'*, *'নাহজুল বালাগা'* ও *'আকদ-উল-ফরীদ'* গ্রন্থগুলোর উদ্ধৃতি দেয়।

হুরুফী লেখকের হায়া-শরমহীনতার তুলনা মেলা ভার; আর তার এ কলঙ্ক লেপনের নোংরামি ইতিপূর্বেকার সকল নজিরকে পেছনে ফেলে দিয়েছে। প্রথমতঃ আমরা এর আগে 'তোহফা' গ্রন্থের অনুবাদের সময় তার প্রদর্শিত বইগুলো সম্পর্কে বলেছি সেগুলো হুরুফীদের প্রকাশনা। 'আসমাউল মুয়াল্লাফীন' পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে যে 'আগানী' বইয়ের লেখক আবূল ফারাজ আলী বিন হুসাইন ইসফাহানী একজন বেদআতী। এই লোক তার *'মুকাতিল-এ আ'ল-এ-আবি তালেব'* পুস্তকে আসহাব-এ-কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-বৃন্দের শ্রেষ্ঠজনদেরকে আক্রমণ করেছে এবং বেয়াদবিপূর্ণ ভাষায় তাঁদের প্রতি কটূক্তিও করেছে। আমরা ওপরে দশম উক্তির জবাবে বিবৃত করেছি যে ইবনে আব্দিল হাদিদ গোমরাহ মোতাযিলী ছিল। অত্যন্ত পরিতাপের সাথে পরিলক্ষিত হচ্ছে যে এসব কুৎসা সুন্নী বইপত্রেও অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। মহান সুন্নী আলেম ও ওলী হযরত ইমাম মুহাম্মদ মা'সূম ফারূকী সেরহিন্দী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) এসব কুৎসার প্রতি যথাযথ দলিল-প্রমাণসহ খণ্ডনমূলক জবাব দিয়েছেন। তাঁর ওই মূল্যবান জবাব অনুবাদ করে আমরা তা আমাদের (Documents of the Right Word/সত্যের দলিল) বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায়ে সন্নিবেশিত করেছি।

হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-কে আমীরে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) লা'নত দিয়েছিলেন বলা হযরত মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এরই কুৎসা রটনা ছাড়া আর কিছু নয়। তাঁর সমালোচনা করার কোনো অনুমতি-ই নেই। হ্যাঁ, অল্প কয়েকজন উমাইয়া খলীফা নির্দিষ্ট কয়েকজনের প্রতি লা'নত দিয়েছিলেন। কিন্তু উমাইয়া খলীফাদের মধ্যে একজন হওয়ার কারণে তাঁকে এই দোষে দায়ী করা যায় না। হুরুফী চক্র (প্রথম) তিন খলীফা (সর্ব-হযরত আবূ বকর, উমর ও উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুম) ও আমীরে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে এবং তাঁদের অনুসারীদেরকে গালিগালাজ করে থাকে। তারা দাবি করে যে সকল সাহাবা-এ-কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-ই

পরবর্তীকালে মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে গিয়েছিলেন। তারা তাঁদের সবারই সমালোচনা করে। তবে আহলুস্ সুন্নাহ'র মতানুযায়ী, আসহাব-এ-কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-এর প্রশংসা ছাড়া অন্য কোনো (সমালোচনামূলক) মন্তব্য করা বৈধ নয়।

হযরত আমীরে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ও তাঁর সমর্থকদের সম্পর্কে খলীফা হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু) বলেছিলেন, "আমাদের (দ্বীনী) ভাইয়েরা আমাদের সাথে একমত হতে পারছেন না। কিন্তু তাঁরা কাফের বা পাপী নন। তাঁরা নিজেদের ইজতেহাদ (গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত) অনুযায়ী আমল তথা অনুশীলন করছেন।" হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর এই মন্তব্য তাঁদেরকে কুফরী (অবিশ্বাস) ও গুনাহ হতে মুক্ত করে দিয়েছে। লা'নত তথা অভিসম্পাত দেয়া ইসলাম ধর্মে আদিষ্ট কোনো ইবাদত নয়; আর চরম অবিশ্বাসীকে অভিসম্পাত দেয়ার ব্যাপারেও এর কোনো ব্যতিক্রম নেই। আসহাব-এ-কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-এর পক্ষে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায শেষে দোয়া করার পরিবর্তে লা'নত দেয়ায় নিজেদের জিহ্বাকে ব্যস্ত রাখা কি আদৌ সম্ভব? কে এই জঘন্য মিথ্যায় বিশ্বাস করবেন?

লা'নত দেয়া যদি পুণ্যের কাজ তথা ইবাদত-বন্দেগী হতো, তাহলে অভিশপ্ত শয়তানকে তা দেয়া এবং মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি আঘাত দানকারী ও সত্য ধর্ম ইসলামের বিরোধিতাকারী আবূ লাহাব, আবূ জাহেল ও কুরাইশ বংশের অন্যান্য নিষ্ঠুর কাফেরদেরকে অভিসম্পাত দেয়াও ইসলামের একটি শর্ত হতো। শত্রুদেরকে যেখানে লা'নত দেয়া কোনো (ঐশী) আজ্ঞা নয়, সেখানে বন্ধুদেরকে অভিসম্পাত দেয়া কি সওয়াব (পুণ্য) হতে পারে? *'সায়াদাতে আবাদিয়্যা'* শীর্ষক তুর্কী বইয়ের ২য় খণ্ডের ২২তম অধ্যায়ে এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

[৩৫]

আমীরে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ইমাম হাসান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)'র স্ত্রীকে তাঁর হত্যাকাণ্ডে প্ররোচিত করেননি

হুরুফী লেখক বলে, "মুআবিয়া ইমাম হাসান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর স্ত্রীকে প্রচুর গহনাগাঁটি দিয়ে এবং স্তোকবাক্যে ভুলিয়ে বিষপ্রয়োগে তার স্বামী হত্যায় প্ররোচিত করে।"

ইতিপূর্বে দশম অধ্যায়ে আমরা 'তাবারী' নামের ইতিহাস পুস্তকে লিপিবদ্ধ কুৎসা সম্পর্কে আলোকপাত করেছিলাম। তবে 'তাবারীর ইতিহাস' গ্রন্থটি মহামূল্যবান। এটি রচনা করেছিলেন আহলুস্ সুন্নাতের জ্ঞান বিশারদ ইমাম মুহাম্মদ ইবনে জারির তাবারী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি), যিনি ৩১০ হিজরী সালে ইন্তেকাল করেন। জনৈক হুরুফী একই নাম গ্রহণ করে 'তারিখে তাবারী' (তাবারীর ইতিহাস) শিরোনামে একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রণয়ন ও প্রকাশ করে। তাবারীর ইতিহাস পুস্তকের বর্তমান তুর্কী সংস্করণটি ওই সংক্ষিপ্ত সংস্করণেরই একটি অনুবাদ। মূল সংস্করণটি অবশ্য অনেক বড়। 'তোহফা' পুস্তকের উদ্ধৃতি যেটি আমরা অনুবাদ করে দশম অধ্যায়ে পেশ করেছি, তাতে আমরা ব্যাখ্যা করেছিলাম *'মুরাউইজুয্ যাহাব'* ইতিহাস বইটি কুৎসায় পরিপূর্ণ। কোনো মুসলমানের পক্ষে কি শোভা পায় এ ধরনের জঘন্য ও বাজে মিথ্যাচার, যা হযরত আমীরে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর মর্যাদার একেবারেই পরিপন্থী, তা পরিবেশন করে ধর্মীয় পুস্তকের অবমাননা করা এবং (ঐতিহাসিক) দলিল রচনার নামে (ওপরোক্ত) দুটি ছাইপাশ প্রকাশনার উদ্ধৃতি দেয়া?

সূরা ফাতাহর একটি আয়াতে করীমায় বোঝানো হয়েছে,

وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ.

–হে রাসূল, আপনার আসহাব একে অপরের প্রতি করুণাশীল/ দয়াপরবশ। আর তারা অবিশ্বাসীদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর।[১]

অপর পক্ষে, ইসলামের শত্রুরা বোঝাতে চায় যে আসহাব-এ-কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) পরস্পর পরস্পরের প্রতি এমনই বৈরীভাবাপন্ন ছিলেন যে তারা একে অপরকে বিষপ্রয়োগ পর্যন্ত করেছিলেন। নিশ্চয় মুসলমান সাধারণ আল্লাহ তা'আলার বাণীতেই বিশ্বাস করবেন। তাই আমরা বলি, আসহাব-এ-কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) পরস্পর পরস্পরকে অত্যন্ত মহব্বত করতেন। খলীফা হযরত উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে বদলা নেয়া হবে কি না, এ প্রশ্নে সাহাবা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-বৃন্দ ইজতেহাদ (গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত) প্রয়োগ করেন। এটি ছিল একটি ধর্মীয় বিষয়। তাঁরা নিজ নিজ ইজতেহাদে একে অপরের সাথে ভিন্নমত পোষণ করেন। এ ধরনের

[১]. আল কুরআন : সূরা ফাতাহ, ৪৮:২৯।

ইজতেহাদী মতপার্থক্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগেও হয়েছিল। বস্তুতঃ তাঁদের ইজতেহাদগুলো কখনো কখনো খোদ মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ইজতেহাদের সাথেও ভিন্নমত পোষণ করতো। আর এই মতপার্থক্যকে গুনাহ তথা পাপ হিসেবে বিবেচনা করা হতো না। পক্ষান্তরে, (হাদিসে) জ্ঞাত করা হয়েছে যে (তাঁদের ইজতেহাদের জন্যে) তাঁদেরকে সওয়াব প্রদান তথা পুরস্কৃত করা হবে। দুবার ওহী মারফত আয়াতে করীমা নাযিলের মাধ্যমে জ্ঞাত করানো হয় যে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ইজতেহাদের বিপরীত (সাহাবীদের) এজতেহাদই সঠিক। এটি এ কারণে যে দ্বীন ইসলাম মানুষদেরকে চিন্তার স্বাধীনতা দিয়েছে এবং তা প্রকাশের স্বাধীনতাও দিয়েছে। ইসলাম হচ্ছে মানবাধিকার ও মানুষের স্বাধীনতার উৎস। বদলা নেয়ার প্রশ্নে প্রয়োগকৃত ইজতেহাদের ভিত্তিতেই সাহাবা-এ-কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-এর মধ্যে এই মতানৈক্য দেখা দিয়েছিল। এ ধরনের মতানৈক্য আল্লাহ তা'আলা, বা তাঁর পয়াগম্বর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), অথবা সাধারণ জ্ঞান-বিবেকসম্পন্ন মানুষের কাছে পাপ হিসেবে বিবেচিত নয়। তাঁরা একে মানবতার প্রতি প্রদত্ত একটি অধিকার হিসেবেই বিবেচনা করেন। যেসব সাহাবী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) একে অপরের সাথে ইজতেহাদগত ভিন্নমত পোষণ করেছিলেন, তাঁরা যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হওয়ার কথা ভাবেননি, এমনকি পরস্পর পরস্পরকে হেয় প্রতিপন্ন করার চিন্তাও করেননি। কেননা, এ ধরনের মতপার্থক্য উদ্ভবের ঘটনা এই প্রথমবার ছিল না, ইতিপূর্বেও বহুবার এরকম মতভেদ হয়েছিল। আর তাঁরা একথাও ভাবেননি যে তাঁরা একে অপরকে আঘাত দেবেন। তাঁদের কয়েকজন সন্তান অবশ্য বিভিন্ন সময়ে নিজেদের পিতাদের মধ্যকার ইজতেহাদী মতপার্থক্যকে ভুল বুঝে নিজেরা নিজেরা সামান্য কলহে লিপ্ত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের পিতৃমণ্ডলী, যাঁরা এমনকি নিজেদের সন্তানদের মধ্যে এধরনের ক্ষুদ্র ক্রোধও সহ্য করতে পারতেন না, তাঁরা নিজ নিজ সন্তানদেরকে বকাঝকা করে থামিয়ে দিতেন। এই বাস্তবতা সম্পর্কে শিয়া সম্প্রদায়ও ওয়াকেফহাল। তথাপিও যিনদিক গোষ্ঠী অন্যান্য মানুষকে বোঝাতে চাচ্ছে যে সাহাবা-এ-কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) একে অপরের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন ছিলেন, আর তাঁরা নোংরা ও জঘন্য কর্মে লিপ্ত হয়েছিলেন। এভাবে দ্বীনের শত্রুরা চক্রান্ত করছে এ কথা প্রচার করার জন্যে যে সাহাবা-এ-কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) অবিবেচক, অশিক্ষিত ও বদরাগী এক জনগোষ্ঠী ছিলেন; আর এরই ধারাবাহিকতায় শত্রুরা ইসলাম

ধর্মের বিনাশ সাধনের মোক্ষম সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছে। কেননা, আসহাব-এ-কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) মোট যতোগুলো রিওয়ায়াত বা বিবরণ প্রদান করেছেন, ইসলাম ধর্ম সেগুলোর সবের সমষ্টি। কুরআন মজীদ ও হাদিস শরীফ আমাদের কাছে সাহাবা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-বৃন্দই পৌঁছে দিয়েছেন। ইসলামী শিক্ষার পুরোটুকুই কুরআন মজীদ, হাদিস শরীফ ও সাহাবা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-বৃন্দের মধ্যে কারো না কারোর বক্তব্য ও আচার-আচরণ থেকে বের করা হয়। ইসলামী বিদ্যার উৎস ও দলিল-প্রমাণসমূহ হচ্ছে সাহাবা-এ-কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-এর বাণীসমূহ। আসহাব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-বৃন্দের প্রতি কলঙ্কলেপন করার মানে হলো তাঁরা যা আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন তাকে অর্থাৎ, ইসলাম ধর্মকে স্বাভাবিকভাবে প্রত্যাখ্যান ও হেয় প্রতিপন্ন করা। সাহাবা-এ-কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-এর সবাই সকল ক্ষেত্রেই অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতকালের সমগ্র মানবজাতির চেয়ে শ্রেষ্ঠ, এর ব্যতিক্রম শুধু আম্বিয়ামণ্ডলী (আলাইহিমুস্ সালাম)। ইসলাম ধর্মের মূল্যায়ন করতে ও প্রকৃত মুসলমান হতে হলে এই সূক্ষ্ম বিষয়টি অবশ্যই ভালোভাবে অনুধাবন করতে হবে। যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শ্রেষ্ঠত্ব, মাহাত্ম্য ও সুউচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে জানেন এবং যিনি আল্লাহর পয়গাম্বর হওয়ার মানে বোঝেন, তিনি সহজেই এই বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পারবেন যে এসব সম্মানিত ব্যক্তিবৃন্দ, যাঁদেরকে মহাসম্মানিত নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রশিক্ষণ দান করেছিলেন এবং তাঁর সব ধরনের কাজে নিয়োজিত করেছিলেন, তাঁরা নিশ্চয় অত্যন্ত উচ্চস্তরে আসীন ছিলেন।

হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু) অথবা হযরত আমীরে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) কিংবা তাঁদের সাথে অবস্থানকারী সাহাবা-এ-কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-এর কেউই পরস্পর পরস্পরকে আঘাত দেয়ার কথা চিন্তাও করেননি। উটের বা সিফফীনের দুটো যুদ্ধেই তাঁদের বৈঠক ছিল একটি ঐকমত্যে পৌঁছুনোর চেষ্টা এবং মুসলমানদের শান্তি ও স্বস্তি নিশ্চিত করার উদ্যোগ। দুই পক্ষই তাঁদের উদ্দেশ্য এটি বলে মতামত ব্যক্ত করেছিলেন। সুন্নী উলামাবৃন্দের লিখিত কালামশাস্ত্রের ও ইতিহাসের বইপত্রে এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে বিবৃত হয়েছে। হুরুফীদের বানোয়াট কাহিনী এবং হঠাৎ গজিয়ে ওঠা ধর্ম সংস্কারকদের বইপত্র ও ম্যাগাজিনের কোনো মূল্যই নেই। ইতিহাসের আরো গভীর গবেষণা পরিস্ফুট করবে যে সাহাবা-এ-কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) কখনোই একে অপরকে হত্যা করেননি। বরঞ্চ তাঁরা নিজেদের মধ্যে

কারো বেসালে (পরলোকে আল্লাহর সাথে মিলনপ্রাপ্তিতে) শোকাহত হয়েছেন এবং কেঁদেছেন।

'কেসাস-এ-আম্বিয়া' গ্রন্থের ১৭০ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ আছে: ইমাম হাসান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে যে তাঁরই স্ত্রী জা'দা বিষপ্রয়োগে হত্যা করেছিল, তা সর্বজনবিদিত একটি ঘটনা। বিয়ে করে অনতিবিলম্বে স্ত্রীকে তালাক দেয়া হযরত ইমাম হাসান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর একটি স্বভাবে পরিণত হয়েছিল, যার দরুন তাঁর পিতা হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু) কুফা নগরীর মানুষজনকে সতর্ক করে বলেছিলেন, "তোমাদের কন্যাদেরকে হাসানের সাথে বিয়ে দেবে না! সে তাদেরকে তালাক দেবে।" তাঁর শ্রোতামণ্ডলী তাঁকে উত্তর দেন, "তিনি যে কনেকে বিয়ে করতে চান, তাকেই আমরা সম্প্রদান করবো। তিনি চাইলে তার সাথে সংসার করতে পারেন, আবার তালাকও দিতে পারেন।" ইমাম হাসান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) অত্যন্ত সুদর্শন ছিলেন, ঠিক তাঁর দাদা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মতো। তিনি যে নারীকে বিয়ে করতেন, সে-ই তাঁর প্রেমাসক্ত হতো। কোনো এক কারণে তাঁর স্ত্রী (জা'দা) তাঁকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয়।

[অনুবাদকের নোট: এখানে ইমাম হাসান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর কয়েকবার বিয়ে করার ও তালাক দেয়ার কথা উঠে এসেছে। সম্ভবতঃ স্ত্রীদের সাথে বনিবনা হয়নি বলেই তিনি তালাক দিয়েছিলেন। বিয়েতে বনিবনা আসলে ভাগ্যের ব্যাপার। তাঁর সর্বশেষ স্ত্রী জা'দা অর্থসম্পদের লোভে তাঁকে হত্যা করতেও কুণ্ঠিত হয়নি। বউয়ের মতো বউ পাওয়াও তাকদীর বটে। অনেক স্ত্রী পয়সার লোভে যে স্বামীকে হত্যা করতে পারে, তা এ ঘটনায় দিবালোকের মতো স্পষ্ট।]

'মি'রাত আল-কায়নাত' গ্রন্থে বিবৃত হয়েছে: আমীরে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এই বিষয়টি নিশ্চিত করার সিদ্ধান্ত নেন যে খলীফা হিসেবে ইমাম হাসান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-ই হবেন তাঁর উত্তরাধিকারী। তিনি তাঁর সিদ্ধান্তের কথা মানুষদেরকে জানান। কিন্তু তাঁর পুত্র ইয়াযীদ বাবার উত্তরাধিকারী হবার অভিলাষ মনের মধ্যে লালন করছিল। তাই সে ইমাম হাসান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর স্ত্রী জা'দার কাছে কিছু বিষ পাঠিয়ে (তাকে) বলে, "তুমি যদি এই বিষ (ইমাম) হাসানকে খাওয়াতে পারো, তাহলে আমি তোমাকে বিয়ে করবো এবং তোমার আপাদমস্তক স্বর্ণালঙ্কারে ও সম্পত্তিতে পূর্ণ করবো।" এই মিথ্যে

আশ্বাসের ফাঁদে পা দিয়ে ওই নারী কয়েকবার হযরত ইমাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে বিষপ্রয়োগ করে। কিন্তু প্রতিবার-ই তিনি আরোগ্য লাভ করেন। তিনি কিছুই বলতেন না, যদিও জানতেন যে তাঁর স্ত্রী-ই এটি করছে। তিনি আলাদা বিছানায় ঘুমোনো এবং নিজ খাবারও সতর্কতার সাথে গ্রহণ করা আরম্ভ করেন। এক রাতে অবশ্য জা'দা গোপনে তাঁর ঘরে প্রবেশ করে এবং তাঁর পানপাত্রে হীরের গুড়ো মিশিয়ে দেয়। ওই রাতে হযরত ইমাম হাসান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) তা পান করলে তাঁর অন্ত্র ফেটে যায়। মৃত্যুশয্যায় তাঁর ছোট ভাই হযরত ইমাম হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বিষপ্রয়োগকারীর নাম তাঁর কাছ থেকে জানতে চেয়েও ব্যর্থ হন। ইমাম হাসান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) জিজ্ঞেস করেন, "হত্যা প্রচেষ্টার সাথে জড়িত কে তা জানলে কি তুমি এর বদলা নেবে?" ইমাম হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) জবাব দেন, "অবশ্যই নেবো। আমি তাকে হত্যা করবো।" ছোট ভাইয়ের এ কথা শুনে ইমাম হাসান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) নিজ স্ত্রীর বিশ্বাসঘাতকতার বিন্দুমাত্র ইঙ্গিত না দিয়েই বলেন, "তার যা শাস্তি প্রাপ্য, তা-ই যথেষ্ট হবে।" চল্লিশ দিন পর তিনি শাহাদাতপ্রাপ্ত হন। তাঁকে বাক্কী কবরস্থানে তাঁর মায়ের পাশে সমাধিস্থ করা হয়। ইয়াযীদের সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের দায় তার বাবা আমীরে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর ঘাড়ে চাপানো এমনই এক জঘন্য অপরাধ যা ওই হত্যাকাণ্ডের চেয়ে কোনো অংশে কম মন্দ নয়। কেননা, এই কুৎসা মহান পয়গাম্বর নূহ (আলাইহিস্ সালাম)-এর পুত্র কেন'আনের অবিশ্বাসকে তার বাবার প্রতি আরোপ করার মতোই একটি ব্যাপার।

[৩৬]

আমীরে মুআবিয়া (রাঃ) কারবালার ঘটনার জন্যে দায়ী নন

হুরুফী লেখক বলে, "মুআবিয়া নিজস্ব চরম বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ ও নিষ্ঠুর ভবিষ্যত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ভিত্তিস্বরূপ তাঁর বাবা আবূ সুফিয়ানের অবৈধ সন্তান যিয়াদ ইবনে আবিহ নামের অত্যন্ত নিষ্ঠুর, বিশ্বাসঘাতক ও হত্যাকারী লোকটিকে তাঁরই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করেন। এই বদমাইশের পুত্র, ডাকাত-সর্দার উবায়দুল্লাহকে তাঁর জীবিত থাকাকালেই প্রাদেশিক শাসনকর্তা পদে নিয়োগ দিয়ে তিনি ইচ্ছাকৃত ও উদ্দেশ্যমূলকভাবে তাকে কারবালার ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড সংঘটনের ষড়যন্ত্র আঁটা এবং তা বাস্তবায়নের জন্যে তৈরি করেন। এসব কূটচাল ও চক্রান্ত কীভাবে ইজতেহাদী ত্রুটি-বিচ্যুতি হতে পারে?" এ

কথা বলে ওই হুরুফী লেখক দাবি করে যে এই উদ্ধৃতি সে 'কেসাস-এ-আম্বিয়া' গ্রন্থ হতে সংগ্রহ করেছে।

পরিতাপের বিষয় এই যে, *'কেসাস-এ-আম্বিয়া'* গ্রন্থটিতে হযরত আমীরে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর প্রতি কিছু অসম্মানসূচক ও অসৌজন্যমূলক সমালোচনা ও মন্তব্য বিধৃত হয়েছে। তবে ওপরে উদ্ধৃত (হুরুফীটির) গোস্তাখিপূর্ণ বক্তব্য (কেসাস-এ-আম্বিয়া) বইটির লেখক আহমদ জওদাত পাশা (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর বিশ্বস্ত কলমে খুঁজে পাওয়া যায় না। আর তিনি এরকম নোংরা কথা দ্বারা তাঁর বইয়ের পৃষ্ঠাগুলোকে অপবিত্র করার মতো ব্যক্তিত্ব-ও ছিলেন না। এসব ঘটনা তিনি তাঁর 'কেসাস-এ-আম্বিয়া' পুস্তকে কীভাবে বর্ণনা করেছেন, চলুন তা-ই দেখা যাক:

ফারিস্ তথা পারস্যের লোকেরা হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসে। তারা 'উশর' ও 'খারাজ' নামের রাষ্ট্রীয় কর দিতে অস্বীকার করে। হিজরী ৩৯ সালে খলীফাতুল মুসলেমীন হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু) বসরা নগরীর বায়তুল মাল (রাষ্ট্রীয় কোষাগার)-এর কর্মকর্তা যিয়াদ ইবনে আবিহকে ফারিস (পারস্য) ও কারমান অঞ্চলের প্রাদেশিক শাসনকর্তা পদে নিয়োগ করেন। বসরার আমীর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) কিছু সৈন্যসহ যিয়াদকে পারস্য দেশে পাঠান। যিয়াদ ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ, প্রতিভাবান ও দূরদর্শী প্রশাসক। তার দক্ষতাপূর্ণ শাসনের দরুন সৈন্য-সামন্তের ব্যবহার ছাড়াই তিনি (বিদ্যমান) সমস্যার একটি সুষ্ঠু সমাধান করতে সক্ষম হন। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি ফারিস ও কারমান অঞ্চলে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন, আর বিদ্রোহীদেরও দমন করা হয়। খলীফা হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু) যখন বসরার আমীর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ পান, তখন তিনি তাঁর কাছ থেকে 'জিযইয়া' সম্পত্তি সংক্রান্ত হিসেব-খাতা (নথিপত্র) চেয়ে পাঠান। এতে অপমানিত বোধ করে হযরত ইবনে আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) একটি জবাব লিখে পাঠান, যাতে তিনি এ কথাও লিখেন, 'খলীফা চাইলে এই সেবামূলক পদে অন্য কাউকে স্থলাভিষিক্তও করতে পারেন।' অতঃপর তিনি বসরা ত্যাগ করেন। হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর শাহাদাতের পরে আমীরে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর প্রতি যিয়াদ আনুগত্য প্রকাশ করতে রাজি হননি। তিনি ছিলেন

অত্যন্ত মেধাসম্পন্ন ও বাগ্মী এক ব্যক্তিত্ব। ইতিপূর্বে তিনি বসরার প্রাদেশিক শাসনকর্তা হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর সহকারী ছিলেন। হযরত খলীফা উমর ফারূক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর খেলাফত আমলে তিনিও যিয়াদকে কিছু প্রশাসনিক দায়িত্ব দিয়েছিলেন। উটের যুদ্ধের পর খলীফা হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু) তাঁকে বসরায় অর্থদপ্তরের প্রধান করে পাঠান এবং পরবর্তীকালে ফারিসের (পারস্যের) আমীর পদে নিয়োগ দেন। সুপ্রশাসক হিসেবে তিনি ওই প্রদেশে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর সুকীর্তিগুলো দেখে হযরত আমীরে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) তাঁকে আপন ভাই বলে ঘোষণা করেন। এমতাবস্থায় খলীফা আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু) যিয়াদকে এক পত্রে সতর্ক করেন এভাবে: "আমি তোমাকে এই প্রদেশের শাসনকর্তা নিয়োগ করেছি। এই কাজে তুমি হলে বিশেষজ্ঞ! তবু তুমি আবূ সুফিয়ান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর বংশধর বা সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারো না শুধুমাত্র তাঁরই কথার ভিত্তিতে। মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) চালাকির সাথে অপরদিক, পেছন দিক, ডান বা বাঁ দিক হতে কাউকে ঘায়েল করে থাকেন। তাঁর বিরুদ্ধে ভালোভাবে আত্মরক্ষা করো।" প্রাক-ইসলামী যুগে আরব ভূখণ্ডে বিয়ের বিভিন্ন রীতি চালু ছিল। ইসলাম ধর্ম সেগুলো রহিত করে দেয়। তবে ওই (প্রাক-ইসলামী) যুগে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী এক বিয়ে দ্বারা আবূ সুফিয়ান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর ঔরসে যিয়াদের জন্ম হয়।

হিজরী ৪৫ সালে হযরত আমীরে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) যিয়াদকে বসরা, খোরাসান ও সিজিস্তানের প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। ওই বছর বসরায় অবৈধ যৌনাচার ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। এমতাবস্থায় যিয়াদ মিম্বরে আরোহণ করে অত্যন্ত স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল ভাষায় এক ভাষণ দেন, যা'তে তিনি পাপ, অবৈধ যৌনাচার ও (চারিত্রিক) দোষত্রুটি হতে মানুষজনকে সতর্ক থাকার উপদেশ প্রদান করেন। তিনি তাদেরকে কঠোর শাস্তির হুমকিও দেন। (এশা'র নামাযের সময় যখন-ই হতো) যিয়াদ জামা'আতে ইমামতি খুব ধীরে ধীরে করতেন, আর দীর্ঘ সূরাগুলো তেলাওয়াত করতেন; অতঃপর তিনি তাদেরকে অনেক রাতে বাড়ি ফিরতে দিতেন এই নিষেধাজ্ঞাসহ যে এরপর তারা যেন বাড়ির বাইরে আর না যায়। এই সামরিক কানুন জারি করে তিনি বসরায় শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন, যার দরুন হযরত আমীরে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর শাসন সুসংহত হয়। তিনি এমনই কঠোর নিয়ম প্রতিষ্ঠা করেন যে, কেউ নিজস্ব কোনো জিনিস রাস্তায় (ভুলে) ফেলে রেখে

গেলেও দীর্ঘ সময় পরে ফিরে এসে তা খুঁজে পেতো। কেউই ঘরের দরজা (রাতে) বন্ধ করতো না। দশ হাজার পুলিশের (কোতওয়াল) এক বাহিনী তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। গ্রাম এলাকায় ও মহাসড়কে তিনি আইন-শৃঙ্খলা ও জননিরাপত্তা নিশ্চিত করেন। হযরত উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর সময়ে যেভাবে জনসাধারণ নিরাপদ অনুভব করতেন, যিয়াদের শাসনেও অনুরূপ নিরাপত্তাবোধ ফিরে আসে। তিনি সাহাবা-এ-কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-বৃন্দের মধ্যে হযরত আনাস্ বিন মালেক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর মতো গণ্যমান্যদেরকে গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে নিযুক্ত করেন; এভাবে তিনি তাঁদেরকে কাজে লাগান। অপরদিকে, হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর শত্রু খারেজী গোষ্ঠী বিদ্রোহ করলে যিয়াদ কোনো করুণা ছাড়াই তাদেরকে আগাম প্রতিহত করেন এবং তাদের নেতাসহ বেশির ভাগ লোককেই হত্যা করেন। ফলে তারা (ইতিহাসের পাতা) থেকে বিস্মৃত হয়। হিজরী ৪৯ সালে হযরত আমীরে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ইস্তাম্বুলে (কনস্টিনটিনোপোল/কুসতুনতুনিয়া) একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। তিনি তাঁর পুত্র ইয়াযীদকে ওই সেনাদলে যোগ দেয়ার আদেশও দেন। বিত্ত-বৈভবে বেড়ে ওঠা ও বখে যাওয়া সন্তান ইয়াযীদ বড্ড দেরি করে ফেলে (তার বাবার আদেশ মানার ক্ষেত্রে)। (শাস্তিস্বরূপ) হযরত আমীরে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ইয়াযীদকে ওই সেনাদলের সাথে যোগ দিতে বাধ্য করেন। সর্ব-হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু), আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু), আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়র (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ও খালেদ বিন যায়দ আবি আইয়ুব আল-আনসারী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) সে অভিযানে শরীক হন। হিজরী ৫৩ সালে যিয়াদ ৫৩ বছর বয়সে কুফা নগরীতে বেসালপ্রাপ্ত হন। এ খবর শুনে তাঁর পুত্র উবায়দুল্লাহ দামেশক গমন করে। হযরত আমীরে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) তাকে খোরাসানের সেনাপ্রধান পদে নিয়োগ করেন। ওই সময় উবায়দুল্লাহর বয়স ২৫ বছর। আদেশ পেয়ে সে খোরাসান গমন করে। 'আমু দরিয়া' (Oxus river) পার হয়ে সে বুখারায় অসংখ্য বিজয় অভিযান পরিচালনা করে। এর ফলে সে সাথে করে অনেক গনীমতের মালামাল নিয়ে ফেরে। হিজরী ৫৫ সালে সে বসরার প্রাদেশিক শাসনকর্তা পদে অধিষ্ঠিত হয়। ওই সময় বসরা ছিল খারেজীদের সম্মিলনস্থল। নতুন প্রাদেশিক শাসনকর্তা উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ তাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে এবং তাদের মূলোৎপাটন করে।

হিজরী ৬০ সালে ইয়াযীদ ইবনে মুআবিয়া খলীফা পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার সময় বসরার প্রাদেশিক শাসনকর্তা ছিল উবায়দুল্লাহ। কুফাবাসী ইয়াযীদের কাছে লেখা এক পত্রে ফরিয়াদ করে যাতে তাদের অঞ্চলে একজন কর্তৃত্বশীল প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিয়োগ করা হয়। এমতাবস্থায় ইয়াযীদ প্রাদেশিক শাসনকর্তা ইবনে যিয়াদকে কুফায় প্রেরণ করে। সেখানে পৌঁছে উবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ ওই নগরীকে বিশৃঙ্খল অবস্থায় দেখতে পায়। সে মানুষজনকে তার আনুগত্যের প্রতি আহ্বান করে। অপরদিকে কুফাবাসীদের কাছ থেকে আমন্ত্রণ পেয়ে হযরত ইমাম হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর আপন চাচাতো ভাই হযরত মুসলিম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে সেখানে পাঠান। প্রায় ত্রিশ হাজার কুফাবাসী ওই নগরীতে সমবেত হয়ে ইমাম হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে খলীফা নির্বাচন করে। তারা ইবনে যিয়াদের গৃহের চারপাশে ঘেরাও দিয়ে রাখে। ইবনে যিয়াদ তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করে দেয় এবং তাদের প্রধান হযরত মুসলিম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে হত্যা করে। ওই একই দিন হযরত ইমাম হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) কুফা অভিমুখে মক্কা মোয়াযযমা ত্যাগ করেন।

আশারা-এ-মুবাশশারা (হাদিসে জান্নাতের শুভসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবী)-এর মধ্যে একজন হযরত সা'আদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর পুত্র উমরকে ইতিপূর্বে রাঈ নগরীর আমীর নিযুক্ত করা হয়েছিল। উমর চার হাজার লোক নিয়ে রওয়ানা দেয়ার মুহূর্তে খবর আসে ইমাম হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) খলীফা হওয়ার উদ্দেশ্যে কুফা অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছেন। ইবনে যিয়াদ তাঁর বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনার জন্যে উমরকে নির্দেশ দেয়, যা করতে উমর অস্বীকৃতি জানায়। এতে ইবনে যিয়াদ তার কাছ থেকে রাঈ নগরীর আমীর পদটি কেড়ে নেয়ার হুমকি তাকে প্রদান করে। বিষয়টি বিবেচনার জন্যে উমর একদিনের সময় চেয়ে নিয়ে সময়শেষে নিজের সম্মতি জ্ঞাপন করে। উভয় পক্ষ কারবালায় মুখোমুখি হয়। ইমাম হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) "ফিরে যেতে রাজি" বলে জানান। কিন্তু ইবনে যিয়াদ জানায় যে তিনি ফিরতে পারবেন শুধু এক শর্তে, আর তা হলো তাঁকে "ইয়াযীদের খেলাফতের প্রতি বায়ত হতে হবে, অর্থাৎ, বশ্যতা স্বীকার করতে হবে"; নতুবা "তাঁকে কোনো পানি পর্যন্ত দেয়া হবে না।" অতঃপর ইমাম হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এ শর্ত মেনে নিতে অস্বীকার করেন। এমতাবস্থায় উমর সৈন্যসহ যুদ্ধে অগ্রসর হয়। হিজরী ৬১সালের ১০ই মহররম তারিখে ইমাম হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ও তাঁর সত্তরজন সাথী শাহাদাত বরণ করেন। দুই দিন

পরে উমর বিন সা'আদ ইমাম হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাফেলায় অবস্থিত নারী-শিশু ও ইমাম যাইনুল আবেদীন আলী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)-কে কুফায় নিয়ে যান। সেখানে ইবনে যিয়াদ মসজিদে সবাইকে সমবেত করে এবং মিম্বরে আরোহণ করে ভাষণ দেয়: "আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা যে তিনি হক্ক (সঠিক) এবং আমীরুল মু'মেনীন ইয়াযীদকে জয়ী করেছেন।" (যুদ্ধের ময়দান থেকে) মহিলাদের কুফায় নেয়ার এবং ইমাম হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর শাহাদাতের খবর দামেস্কে পৌঁছুলে ইয়াযীদের চোখ অশ্রুসিক্ত হয়। সে বলে, "ইবনে সুমাইয়ার প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত!" উল্লেখ্য, উবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদকে 'ইবনে সুমাইয়া' ও 'ইবনে মারজানা' নামে ডাকা হতো। ইয়াযীদ ইমাম হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর জন্যে দোয়া করে বলে, "আমি হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে মুক্ত করে দিতাম যদি তিনি আমার কাছে আসতেন।" সে (এ হত্যার) সংবাদবাহক যুবায়রকে কোনো এনাম দেয়নি। ইয়াযীদ আরো বলে, "আল্লাহ তা'আলার লা'নত ইবনে যিয়াদের প্রতি অবতীর্ণ হোক; সে তাড়াহুড়ো করেছে এবং হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে শহীদ করেছে।" অতঃপর কুফা থেকে সবাইকে তার সামনে এনে সে নিম্নোক্ত কথাগুলো বলে: "আপনারা কি জানেন কেন হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) জীবন দিয়েছেন? হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেছিলেন, 'আমার পিতা আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু) তার (ইয়াযীদের) পিতা মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে উত্তম। আমার মাতা ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) তার মায়ের চেয়ে উত্তম; আর আমার দাদা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার দাদার চেয়েও উত্তম। অতএব, আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তাই খেলাফত আমারই হক্ক (অধিকার)।' তাঁর বাবা (হযরত আলী) এবং আমার বাবা (মুআবিয়া) সালিশদের কাছে (খেলাফতের) বিষয়টি ছেড়ে দিয়েছিলেন। সবাই জানেন কে নির্বাচিত হয়েছিলেন। আমি আল্লাহর খাতিরে এ কথা বলছি: তাঁর মা ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) অবশ্যই আমার মায়ের চেয়ে শ্রেষ্ঠ; আর দাদার ব্যাপারে বলবো, আল্লাহ ও পুনরুত্থানে যে ব্যক্তি বিশ্বাস করেন, তিনি কখনোই কাউকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সমকক্ষ বিবেচনা করতে পারেন না। তবে হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ফিক্‌হ-সম্পর্কিত নিজস্ব জ্ঞান ও ইজতেহাদের ওপর ভিত্তি করেই কথা বলেছিলেন এবং আমল করেছিলেন। তিনি ভুলে গিয়েছিলেন এই কুরআনের আয়াত সম্পর্কে, যেটিতে উদ্দেশ্য করা হয়েছে–

اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ.

–আল্লাহ তা'আলাই সকল কিছুর মালিক। তিনি যাকে পছন্দ করেন তাকে রাজত্ব দান করেন।[১]

ইয়াযীদের প্রাসাদে অবস্থিত মানুষেরা ইমাম হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর জন্যে অনেক কান্নাকাটি ও শোক প্রকাশ করে। তাঁর কাছ থেকে কেড়ে নেয়া ধনসম্পদ ও সম্পত্তির বহুগুণ ফেরত দেয়া হয়। বস্তুতঃ ইমাম হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর কন্যা সুকায়না স্বীকার করেন, "আমি (হযরত) মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর পুত্র ইয়াযীদের চেয়ে বেশি বদান্যতার অধিকারী আর কোনো ব্যক্তিকেই দেখিনি" [এই বক্তব্য লা-মাযহাবীরাও অস্বীকার করেনি। তবু তারা যখন এই উদ্ধৃতি দেয়, তখন 'ব্যক্তি'র স্থলে 'অবিশ্বাসী' শব্দটি ব্যবহার করে থাকে]। ইয়াযীদ প্রতিদিন সকালে ও রাতে ইমাম যাইনুল আবেদীন (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)-কে তার সাথে খেতে দাওয়াত করতো, আর উভয়ে এক সাথে সকালের নাস্তা ও রাতের খাবার গ্রহণ করতেন। একে অপরের কাছ থেকে বিদায় নেয়ার সময় ইয়াযীদ বলে, "ইবনে মারজানার ওপর আল্লাহর লা'নত পড়ুক! আল্লাহর কসম, আমি তার জায়গায় হলে আমি আপনার বাবার (ইমাম হুসাইনের) সমস্ত ইচ্ছা মেনে নিতাম। এটি আসলে আল্লাহ তা'আলারই পূর্ব-নির্ধারিত (তাকদীর/নিয়তি) ছিল। আপনার কোনো কিছুর প্রয়োজন হলে আমাকে লিখে জানাবেন, আমি তা-ই প্রেরণ করবো।" ইয়াযীদ ৬৪ হিজরী সালে ত্রিশ বছর বয়সে মারা যায়। আর ইবনে যিয়াদ ৬৭ হিজরী সালের মুহররম মাসে দস্যু-সরদার মুখতারের সাথে বেশ কিছু যুদ্ধে লিপ্ত অবস্থায় তার দ্বারা নিহত হয়। ওই সময় খলীফা পদে আসীন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়র (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর ভাই মুস'আবকে বসরার প্রাদেশিক শাসনকর্তা পদে নিয়োগ করেন। মুস'আব তাঁর আমীরদের মধ্যে মুহাল্লাবকে দস্যু-সরদার মুখতারের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর হিজরী ৬৭ সালে মুখতার নিহত হয়। *['কেসাস-এ-আম্বিয়া' গ্রন্থের উদ্ধৃতি শেষ হলো]*

'কেসাস-এ-আম্বিয়া' গ্রন্থ হতে ওপরে উদ্ধৃত বক্তব্য বিচার-বিবেচনাসহ পাঠ করলে পরিদৃষ্ট হবে যে ইমাম হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর শাহাদাত তাঁর

[১]. আল কুরআন : সূরা আলে ইমরান, ৩:২৬।

বা তাঁর পিতার প্রতি লালিত আক্রোশের ফলশ্রুতিতে ঘটেনি, বরং দুনিয়াবী উচ্চাভিলাষ হতেই ঘটেছিল। কারণ যা-ই হোক না কেন, এমন কি ইয়াযীদও এই হীন বর্বরতার দায়দায়িত্ব নিতে চায়নি। সে ইবনে যিয়াদকে এ জঘন্য কর্মের জন্যে অভিসম্পাত দিয়েছিল। ইয়াযীদের এ অপরাধ যতোই গুরতর হোক না কেন, তার এ অপরাধের জন্যে তার বাবা হযরত আমীরে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে দায়ী করার অপচেষ্টা একই পর্যায়ের অন্যায় হবে। এটি হযরত আদম (আলাইহিস্ সালাম)-কে তাঁর পুত্র কাবিল কর্তৃক হাবিলের হত্যার জন্যে দোষী সাব্যস্ত করার মতোই ব্যাপার হবে।

হযরত আমীরে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক উবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদকে প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিয়োগ ইমাম হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে শহীদ করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল মর্মে অভিযোগ উত্থাপন করা সত্যেরই অপলাপ মাত্র। *'কেসাস-এ-আম্বিয়া'* গ্রন্থে যেমনটি লেখা রয়েছে, হযরত আমীরে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) তাকে নিয়োগ করেছিলেন, কারণ সে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে সফলভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করেছিল এবং হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর প্রতি বৈরী ভাবাপন্ন খারেজীদেরকেও দমন করেছিল। দ্বীন ইসলামের খেদমত করতে দেখে তিনি তাকে বসরার আমীর পদে নিয়োগ দেন। ওই সময় ইমাম হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) মদীনা মোনাওয়ারায় অবস্থান করছিলেন। আমীরে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর যদি হযরত ইমাম সাহেব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর প্রতি কোনো বিদ্বেষভাব থাকতোই, তাহলে তিনি উবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদকে হেজাযের (মক্কা ও মদীনার) আমীর পদে নিযুক্ত করতেন। যেসব লোক ইয়াযীদের দোষের ভাগ হযরত আমীরে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর প্রতি আরোপ করে, তারা কেন ইমাম হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে মুক্ত করার পরিবর্তে শহীদকারী উমরের দোষ তার বাবা (হযরত সা'আদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর প্রতি আরোপ করে না? অথচ হযরত সা'আদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হলেন 'আশারায়ে মোবাশশেরা'-এর একজন, অর্থাৎ, ওই দশজন সাহাবী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) যাঁরা দুনিয়াতেই বেহেশতের শুভসংবাদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। কেননা, এই শত্রুরা জানে তারা ওই মহান সাহাবী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর সমালোচনা করলে তাদের গোপন চক্রান্ত ফাঁস এবং মিথ্যে অপপ্রচার প্রকাশ হয়ে পড়বে।

ইমাম আবদুল ওয়াহহাব শারানী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর প্রণীত *'তাযকিরাত-উল-কুরতুবী'* গ্রন্থের ১২৯ পৃষ্ঠায় লেখেন: ইয়াযীদ ইমাম হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর পবিত্র শির মোবারক ও বন্দীদেরকে দামেস্ক হতে মদীনায় প্রেরণ করে। মদীনার প্রাদেশিক শাসনকর্তা উমর ইবনে সা'আদের আদেশে হযরত ইমাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর পবিত্র শির মোবারককে কাফনে ঢেকে 'জান্নাতুল বাকী' কবরস্থানে তাঁর মা হযরত ফাতেমাতুয্ যাহরা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)-এর মাযারের পাশে দাফন করা হয়। মিসরের ফাতেমী বংশীয় ১৩তম শাসক সুলতান ফায়যকে পাঁচ বছর বয়সে ৫৪৯ হিজরী মোতাবেক ১১৫৪ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে বসানো হয় এবং তিনি ৫৫৫ হিজরী সালে ইন্তেকাল করেন। তাঁর রাজত্বকালে রাষ্ট্রীয় শাসন ছিল প্রধান উজির তালাঈ বিন রুযাইকের অধীনে। এই ব্যক্তি কায়রোতে 'মাশহাদ' নামের কবরস্থান নির্মাণের পর চল্লিশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করে ইমাম হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর পবিত্র শির মোবারককে মদীনা হতে কায়রোতে স্থানান্তর করেন। ওই শির মোবারককে একটি প্রাচ্যদেশীয় রেশমের বস্ত্র দ্বারা মোড়ানো হয়েছিল, আর আবলুস কাঠের তৈরি একটি কফিনের ভেতরে রেখে তা মাশহাদে অবস্থিত ইমাম শাফেঈ (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) ও সাইয়্যেদাতুন্ নাফিসা (রাহমাতুল্লাহি আলাইহা)-এর মাযারের পাশে দাফন করা হয়।

এই ঘটনাও হুরুফীদের দ্বারা বিকৃতভাবে প্রচার করা হয়েছে। তারা বলে, ইমাম হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর শাহাদাতের চল্লিশ দিন পরে তাঁর শির মোবারককে কারবালায় ফেরত নিয়ে তাঁরই দেহ মোবারকের পাশে দাফন করা হয়।

পাকিস্তানের (দেওবন্দী মাসলাকের) আলেম হাফেয হাকীম আবদুশ্ শাকূর এলাহী মির্যাপুরী হানাফী 'শাহাদাতে হুসাইন' শীর্ষক একখানা পুস্তক লিখেছে। এই বইটি প্রথমে উর্দূতে লেখা হলেও করাচীতে অবস্থিত 'মাদরাসা-এ-ইসলামিয়্যা'র ছাত্র মৌলভী গোলাম হায়দার ফারুকী কর্তৃক পরে পারসিক ভাষায় অনূদিত হয়। মাদ্রাসাটির প্রতিষ্ঠাতা দেওবন্দী আলেম ইউসূফ বিন নূরী (মৃত্যু: ১৪০০হিজরী/ ১৯৮০খৃষ্টাব্দ) ওই বইতে সন্নিবেশিত তথ্যের প্রশংসাসূচক একটি বাণী তাতে দেয়। ১০২ পৃষ্ঠাসম্বলিত বইটির লেখক বলে যে ইসলামের শত্রুরা মুসলমানদের ছদ্মবেশ ধারণ করে অন্তর্ঘাতমূলক অপতৎপরতায় লিপ্ত রয়েছে এবং তারা 'আহলে বায়ত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-

এর আশেক' হওয়ার ভান করে তাঁদের প্রতি বৈরী মনোভাব উস্কে দিচ্ছে। লেখক তার বইয়ে শিয়া বইপত্র থেকে দালিলিক প্রমাণ পেশ করে এ কথার সত্যতা তুলে ধরে। বইয়ের ১১ পৃষ্ঠায় সে বলে: শিয়া আলেম মুহাম্মদ বাকির খোরাসানী, যিনি মোল্লা মুহসিন নামে বেশি পরিচিত, তিনি ১০৯১ হিজরী/ ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দ সালে মাশহাদে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি তাঁর প্রণীত 'জিলা-উল-উইয়ূন' গ্রন্থের ৩২১ পৃষ্ঠায় বলেন, "আমীরে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বেসাল হওয়ার সময় ইয়াযীদকে উপদেশ দেন এই বলে: তুমি তো জানো রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে ইমাম হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর ঘনিষ্ঠতা সম্পর্কে এবং তিনি যে তাঁর পবিত্র রক্তেরই সে ব্যাপারেও তুমি জানো। ইরাকবাসী সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁকে তাদের দেশে আমন্ত্রণ করবে। কিন্তু তারা তাঁকে সাহায্য করবে না বরং একা ফেলে পালাবে। তুমি যদি তাঁর বিরুদ্ধে জয়ী হও, তাহলে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করবে। তোমার প্রতি তিনি কোনো আঘাত করলেও তুমি তাঁকে কখনোই পাল্টা আঘাত করবে না! আমি তাঁর প্রতি যে সদাচরণ করেছি, তদনুরূপ আচরণ করবে।" মুহাম্মদ তকী খান নামের জনৈক শিয়া ইতিহাসবিদ (মৃত্যু: ১২৯৭ হিজরী/ ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ) তাঁর 'নাসিখ-উত-তাওয়ারিখ' শিরোনামের পারসিক পুস্তকে লেখেন, "আমীরে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর উপদেশ ছিল নিম্নরূপ: হে বৎস, তোমার নফসকে অনুসরণ করো না! ইমাম হুসাইন বিন আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর রক্তে রঞ্জিত হাত নিয়ে আল্লাহ তা'আলার সামনে উপস্থিত হয়ো না! নতুবা তুমি অনন্ত শাস্তি ভোগ করবে। ভুলে যেয়ো না হাদিসের এ বাণী– 'হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর প্রাপ্য সম্মান যে ব্যক্তি প্রদর্শন করে না, আল্লাহ তা'আলাও তাকে বরকত (আশীর্বাদ) দেন না'।"

একই শিয়া ইতিহাস পুস্তকের ৩৮ পৃষ্ঠায় আরো লেখা আছে, "হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর সমর্থক তথা শিয়া গোষ্ঠী দামেস্কে এসে আমীরে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর সমালোচনা করতো। কিন্তু তিনি তাদেরকে কোনো শাস্তি তো দিতেনই না বরং 'বায়তুল মাল' (রাষ্ট্রীয় কোষাগার) হতে প্রচুর উপহার সামগ্রী প্রদান করতেন।" *'জিলা-উল-উইয়ূন'* গ্রন্থের ৩২৩ পৃষ্ঠায় বিবৃত হয়েছে, "ইমাম হাসান ইবনে আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: আল্লাহর কসম! আমার আশপাশে জড়ো হওয়া সমর্থক দাবিদার লোকদের চেয়ে আমীরে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) শ্রেয়তর। এসব লোক একদিকে নিজেদের শিয়া

দাবি করছে, অপরদিকে আমাকে হত্যা করে আমারই সম্পত্তি হস্তগত করার জন্যে অপেক্ষা করছে।"

(ওপরোক্ত শিয়া বইপত্রের ভাষ্যানুযায়ী) ইয়াযীদ তার বাবার উপদেশ ভুলে যায়নি। তাই সে ইমাম হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে কুফায় ডাকেনি। সে তাঁকে হত্যার নির্দেশও দেয়নি। তাঁর শাহাদাতে সে উল্লসিতও হয়নি। পক্ষান্তরে, সে এই শোক সংবাদে কেঁদেছিল, আর শোক পালনের আদেশও দিয়েছিল। সে আহলে বায়ত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-কে শ্রদ্ধা করতো। *'জিলা-উল-উইয়ুন'* শীর্ষক শিয়া পুস্তকের ৩২২পৃষ্ঠায় বিবৃত হয়: "ইয়াযীদ আহলে বায়ত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-এর প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা পোষণকারী হিসেবে সুপরিচিত ওয়ালীদ ইবনে আকাবাকে মদীনার প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিয়োগ করে। অপরদিকে, আহলে বায়ত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-এর প্রতি বৈরীভাবাপন্ন মারওয়ানকে সে প্রাদেশিক শাসনকর্তা পদ হতে অব্যাহতি দেয়। এক রাতে ওয়ালীদ হযরত ইমাম হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে ডেকে নিয়ে তাঁকে জানায় যে আমীরে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বেসালপ্রাপ্ত হয়েছেন এবং ইয়াযীদের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করতে হবে। ইমাম হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'তার প্রতি গোপনে আনুগত্য স্বীকার করলে তো তুমি সন্তুষ্ট হবে না। তুমি চাও আমি জনসমক্ষে আনুগত্য প্রকাশ করি'।" শিয়া পুস্তকের এই লেখনী প্রতীয়মান করে যে ইমাম হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ইয়াযীদকে পাপী (গুনাহগার) বলেননি, লম্পটও বলেননি, কিংবা কাফের (অবিশ্বাসী)ও বলেননি। তিনি যদি তাকে তা-ই মনে করতেন, তবে তিনি গোপনে তার প্রতি আনুগত্য স্বীকারের কথা বলতেন না। জনসমক্ষে আনুগত্য স্বীকারকে তাঁর এড়িয়ে যাওয়ার কারণ হলো তিনি শিয়াদের শত্রুতার পাত্র হতে চাননি। বস্তুতঃ তারা (শিয়াচক্র) হযরত আমীরে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর সাথে শান্তি স্থাপনের কারণে তাঁর বাবা (হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু)'র দলত্যাগ করেছিল এবং খারেজী হয়ে গিয়েছিল। তারা তাঁর বাবার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল। আর তারা তাঁর বড় ভাই ইমাম হাসান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর প্রতি বৈরীভাবাপন্ন হয়ে পড়েছিল, কেননা তিনি আমীরে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাছে খেলাফতের দাবি ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়িয়েছিলেন।

ওপরোক্ত (শিয়া) পারসিক *'জিলা-উল-উইয়ুন'* শীর্ষক ইতিহাস পুস্তকে আরো লেখা হয়েছে: "জাযর বিন কায়স্ যখন ইমাম হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর

শাহাদাতের দুঃসংবাদ ইয়াযীদের কাছে নিয়ে আসে, তখন সে বেশ কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে থাকে। অতঃপর সে বলে, 'তাঁকে হত্যার খবর হতে তাঁর প্রতি তোমাদের আনুগত্য স্বীকারের খবর আমার জন্যে শ্রেয় হতো। আমি সেখানে থাকলে তাঁকে ছেড়ে দিতাম।' মাহদার বিন সা'লাবী যখন ইমাম হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর তিরস্কার আরম্ভ করে, তখন ইয়াযীদ ক্রোধান্বিত হয়ে বলে, 'আহা, যদি মাহদারের মা এতো নিষ্ঠুর ও হীন সন্তানের জন্ম না দিতেন। আল্লাহ তা'আলা যেন মারজানার পুত্র (ইবনে যিয়াদ)-এর বিনাশ সাধন করেন।' শাম্মার (বাংলায় শিমার নামে পরিচিত) ইমাম হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর পবিত্র শির মোবারক ইয়াযীদের কাছে নিয়ে আসে এবং তাকে বলে, 'আমি মনুষ্যজাতির সেরা জনের পুত্র (পৌত্র)-কে হত্যা করেছি। অতএব, আমার ঘোড়ার পিঠে ঝুলানো থলেগুলো স্বর্ণ ও রৌপ্য দ্বারা আপনার পূর্ণ করতেই হবে!' উত্তেজিত হয়ে ইয়াযীদ চেঁচিয়ে বলে, 'আল্লাহ যেন ওই থলেগুলো (নরকের) অগ্নি দ্বারা পূর্ণ করেন! কোন্ কারণে তুমি মনুষ্যজাতির সেরা জনকে হত্যা করলে? এখান থেকে বের হয়ে যাও! দূর হও! তোমাকে কিছুই দেয়া হবে না'।" শিয়া *'খুলাসাত-উল-মাসা'য়েব'* গ্রন্থের ৩৯৩ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে: "ইয়াযীদ খুব কেঁদেছিল, শুধু জনসমক্ষে নয়, একাকীও। তার কন্যারা এবং বোনেরাও তার সাথে কেঁদেছিল। একখানা সোনার থালায় ইমাম হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর শির মোবারক স্থাপন করে সে বলে, 'ইয়া হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)! আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন! কতো না সুন্দর আপনার স্মিতহাস্য'!" শিয়া পুস্তকের এই সাক্ষ্য দ্বারা এটি স্পষ্ট যে 'ইয়াযীদ ইমাম হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর দাঁতে একটি লাঠি দিয়ে আঘাত করেছিল' মর্মে কিছু লোকের অভিযোগটি একেবারেই ডাহা মিথ্যে কথা। *'জিলা-উল-উইয়ুন'* পুস্তকে বিবৃত হয়েছে, "ইয়াযীদ ইমাম হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর পরিবার-সদস্যদেরকে তার প্রাসাদে থাকতে দেয়। সে পরম আতিথেয়তা প্রদর্শন করে। ইমাম যাইনুল আবেদীন (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর সাথে সে প্রাতঃরাশ ও রাতের খাবার গ্রহণ করতো।" *'খুলাসাত-উল-মাসা'য়েব'* পুস্তকে লেখা আছে, "ইমাম হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর পরিবার-সদস্যদেরকে ইয়াযীদ জিজ্ঞেস করে, 'আপনারা কি আমার মেহমান হিসেবে এখানে দামেস্কে থেকে যেতে চান, না মদীনায় ফেরত যেতে চান?' উম্মে কুলসূম জানান যে তাঁরা নির্জনে শোক জ্ঞাপন করতে ইচ্ছুক। এমতাবস্থায় ইয়াযীদ তার প্রাসাদের একটি বড় কক্ষ তাঁদেরকে ছেড়ে দেয়।

ওই কক্ষে তাঁরা এক সপ্তাহ যাবত শোক জ্ঞাপন করেন। অতঃপর ইয়াযীদ তাঁদেরকে ডেকে তাঁরা কী চান তা জিজ্ঞেস করে। তাঁরা তাকে মদীনায় প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা সম্পর্কে জানান। সে তাঁদেরকে অনেক সম্পত্তি, সুসজ্জিত সওয়ার (ঘোড়া) ও ২০০স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করে। সে তাঁদেরকে বলে, 'আপনাদের কোনো কিছুর প্রয়োজন হলে আমাকে জানাবেন। আমি তৎক্ষণাৎ পাঠিয়ে দেবো।' অতঃপর তাঁদের খেদমতে নু'মান বিন বশীরকে এবং ৫০০ অশ্বারোহী সৈন্যকে নিযুক্ত করে সে তাঁদেরকে বিদায় সম্বর্ধনার মাধ্যমে মদীনা অভিমুখে যাত্রা করতে দেয়।"

ওপরের লেখাগুলোতে এবং অন্যান্য সুবিবেচনাশীল ও নিরপেক্ষ শিয়া লেখকদের বইপত্রে পরিস্ফুট হয় যে হযরত আমীরে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) কখনোই ইমাম হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর প্রতি বৈরীভাবাপন্ন ছিলেন না। ইয়াযীদ হযরত ইমাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর হত্যার আদেশ দেয়নি, সেটি সে চায়ও নি। আহলে বায়ত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর শত্রুরা এবং ইমাম হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর হন্তা লোকেরাই নিজেদের বর্বরতা লুকোনোর জন্যে আমীরে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর প্রতি এই কুৎসা রটনা করেছে।

আবদুর রাহমান ইবনে মুলজাম ইতিপূর্বে শিয়া ছিল। পরবর্তীকালে সে খারেজী দলে যোগ দেয় এবং হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-কে শহীদ করে।

ইমাম হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে কারবালায় যেসব লোক শহীদ করে, তাদের মধ্যে দামেস্ক থেকে আগত কোনো সৈন্য ছিল না। তারা সবাই কুফাবাসী ছিল। শিয়া পণ্ডিত কাজী নূরুল্লাহ শুস্তারী এই সত্য বিষয়টি অকপটে স্বীকার করেছেন। একথা *'জিলা-উল-উইয়ূন'* গ্রন্থেও লেখা হয়েছে যে ইমাম যাইনুল আবেদীন (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)-কে যখন কুফা নগরীতে নেয়া হয়, তখন তিনি বলেন যে হন্তা লোকেরা সবাই শিয়াপন্থী ছিল।

ইসলাম ধর্মকে ভেতর থেকে ধ্বংস সাধনের লক্ষ্যে দ্বীনের শত্রুরা আহলে বায়তে নববী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-কে নানা ধরনের বিপদের ফাঁদে ফেলে দিয়েছিল। এসব হত্যাকাণ্ডকে আহলুস্ সুন্নাহ'র প্রতি আরোপ করে তারা দ্বীনের ভিত্তিমূল আসহাব-এ-কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-কে এবং তাঁদের মাধ্যমে তাঁদেরই অনুসারী উলামা-এ-আহল-এ-সুন্নাতকে ঘায়েল করে। তাদের ষড়যন্ত্রের ফাঁদে পা না দেয়ার ব্যাপারে মুসলমানদেরকে অবশ্যই অতিমাত্রায় সতর্ক হতে হবে।

[৩৭]

হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ) মিসরীয় অর্থ আত্মসাৎ করেননি

হুরুফী লেখক বলে, "মুআবিয়ার নিযুক্ত মিসরের প্রাদেশিক শাসনকর্তা আমর ইবনে আস্ তার চার বছর চার মাসব্যাপী শাসনকালে তিন লাখ পনেরো হাজার স্বর্ণমুদ্রা আত্মসাৎ করেন এবং রাহাত নামের একখানা এলাকাও জবরদখল করেন।" সে আরো বলে যে এই তথ্য সে শিয়া *'মুরাওউয়ীয-উয-যাহাব'* শীর্ষক একটি পুস্তক থেকে সংগ্রহ করেছে।

কোনো নির্দিষ্ট মাযহাবহীন (লা-মাযহাবী) লোকেরা ধর্মীয় তথ্যের নামে শিশুদের আনন্দ দেয়ার কাহিনীর মতো কীভাবে যে মিথ্যে বানোয়াট কথাবার্তা তাদের বইপত্রে সন্নিবেশিত করছে, তার একটি জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত হলো ওপরের এই উদ্ধৃতিখানি। হুরুফী লেখক হযরত আমর ইবনে আস্ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর প্রতি কলঙ্ক লেপন করতে অপপ্রয়াস পেয়েছে এই বলে যে তিনি হযরত আমীরে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর প্রাদেশিক শাসনকর্তা ছিলেন। বাস্তব ঘটনা কিন্তু এর ঠিক উল্টো, কেননা তিনি মিসরের প্রাদেশিক শাসনকর্তা পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন খলীফা হযরত উমর ফারূক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর শাসনামলে। অধিকন্তু, তিনি খলীফা উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর শাসনামলেও চার বছর ওই পদে বহাল ছিলেন। হযরত মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) খলীফা পদে অধিষ্ঠিত হলে ইতিপূর্বে হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর নিযুক্ত প্রাদেশিক শাসনকর্তা যিয়াদকে আবারো ওই পদে নিয়োগ দেন। অনুরূপভাবে, তিনি ওই মহান খলীফাদের মনোনীত মিসরের প্রাদেশিক শাসনকর্তা হযরত আমর ইবনে আস্ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কেও পুনরায় প্রাদেশিক শাসনকর্তা পদে নিযুক্ত করেন। তাছাড়া, হযরত আমর ইবনে আস্ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) সিরিয়ায় হযরত আমীরে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর পরিচালিত জ্বিহাদে সামরিক উপদেষ্টা ও সাথী হিসেবে কাজ করেন। হযরত আমীরে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর সুনির্দিষ্ট কোনো দোষত্রুটি বা ঘাটতি খুঁজে না পেয়ে এসব লোকেরা এখন তাঁর সমস্ত সৎকর্ম ও সুকীর্তিকে দোষ হিসেবে উপস্থাপন করতে চাচ্ছে। হযরত আমীরে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ও হযরত আমর ইবনে আস্ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং তাঁর খলীফাবৃন্দ বিভিন্ন পছন্দনীয় (গুরুত্বপূর্ণ) কাজের দায়িত্বভার অর্পণ করেছিলেন, তা-ই তাঁদের উচ্চ মর্যাদার নিদর্শন হিসেবে যথেষ্ট হবে। ইমাম-এ-রব্বানী শায়খ আহমদ ফারূকী

সেরহিন্দী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) নিজ 'মকতুবাত' (পত্রাবলী) গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ১২০তম পত্রে বিবৃত করেন, "রাসূলে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সোহবত তথা সান্নিধ্যের বরকতে (আশীর্বাদে) হযরত আমীরে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর (ইজতেহাদী তথা গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্তের) ভুলত্রুটিও হযরত উয়াইস করনী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) ও খলীফা উমর বিন আব্দিল আযীযের সঠিক কাজগুলো হতে উপকারী হয়েছিল [রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে চর্মচক্ষে দেখার সৌভাগ্য এঁদের হয়নি]। একই নিদর্শনস্বরূপ হযরত আমর ইবনে আস্ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর (ইজতেহাদী) ভুলত্রুটিও (শেষোক্ত) ওই দুইজন অ-সাহাবী মুসলমানের বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত হতে পুণ্যদায়ক ছিল।" এই দুজন সাহাবী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর প্রতি এরকম তীব্র সমালোচনার একমাত্র কারণ হচ্ছে হযরত আলী (কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর সাথে তাঁদের ইজতেহাদগত মতপার্থক্য। এই কারণেই এসব সমালোচক তাঁদের সকল কর্ম এমন কি ইবাদত-বন্দেগীকেও ত্রুটি-বিচ্যুতি হিসেবে পেশ করে থাকে।

হযরত আমর ইবনে আস্ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) কখনোই মিসরের জনগণের অধিকার হরণ করেননি। বরঞ্চ তিনি মিসরে ইসলামী ইতিহাসের গৌরবোজ্জ্বল এক অধ্যায়ের সংযোজন করেন। আমরা এসব খেদমতের একটি উদাহরণ দিতে চাই, যা বন্ধু ও সমালোচক নির্বিশেষে সবাইকেই বিস্মিত করবে। এই মহান খেদমত হলো তাঁর 'আমীরুল মু'মেনীন খাল' উদ্বোধন, যা নীলনদ ও লোহিত সাগরকে সংযুক্ত করেছিল। একবার হিজরী ১৮ সালে সমগ্র আরবে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এমতাবস্থায় খলীফা উমর ফারূক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) প্রদেশগুলোতে খাদ্য সরবরাহ করার হুকুম জারি করেন। মিসর ও দামেস্ক হতে খাদ্যরসদ আসতে তুলনামূলকভাবে দেরি হয়, কেননা এই দুটি প্রদেশ দূরে অবস্থিত ছিল। খলীফা উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) মিসরীয় প্রাদেশিক শাসনকর্তা হযরত আমর ইবনে আস্ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ও তাঁর সহকারীদের ডেকে পাঠান এবং তাঁদের বলেন, "নীলনদ ও লোহিত সাগরের মাঝে যদি কোনো খাল কাটা যায়, তাহলে আরবদেশের খাদ্যঘাটতি মেটানো সম্ভব হবে।" হযরত আমর ইবনে আস্ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) মিসরে ফিরেই কায়রোর ২৪ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত 'ফুসতাত' নগরী হতে খাল খনন আরম্ভ করেন, যা লোহিত সাগর অভিমুখী ছিল। ছয় মাসের মধ্যে ১৩৮ কিলোমিটার দীর্ঘ এই খালটি খনন করা হয়। নীলনদ হতে জাহাজ ছেড়ে এই 'লামীরুল মু'মেনীন

খাল' দিয়ে তা লোহিত সাগরে পাড়ি জমাতো এবং মদীনায় 'জার' নামের জাহাজঘাটে এসে ভিড়তো। পণ্যবাহী জাহাজে প্রথম যে চালান মিসর থেকে মদীনায় এসে পৌঁছে, তাতে অংশগ্রহণ করে ২০টি খাদ্য-বোঝাই জাহাজ, যেগুলোর বহনকৃত মালামালের পরিমাণ ছিল ৬০০০০'এরদাব'। এক 'এরদাব' সমান ২৪ 'সা'। এক 'সা' হচ্ছে ৪.২ লিটার পরিমাণের সমান একটি একক। অতএব, এক 'এরদাব' প্রায় ১০০ লিটারের সমান। এই হিসেব অনুযায়ী সমুদ্রপথে পণ্যবাহী জাহাজের প্রথম চালানে মিসর হতে মদীনায় ৬০ লাখ লিটার, অর্থাৎ, ৬০০০ কিউবিক মিটার খাদ্যসামগ্রী স্থানান্তরিত হয়। খলীফা উমর বিন আবদিল আযীযের শাসনামলের পরে এই খালটি যত্নের অভাবে বন্ধ হয়ে যায়। হিজরী ১৫৫ সালে খলীফা মনসূর এটি পরিষ্কার ও সংস্কার করেন এবং এটি আবারো বহু বছর চালু থাকে। হযরত আমর ইবনে আস্ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সাগরকে সংযুক্ত করার কথাও ভেবেছিলেন। তিনি তাঁর এ ভাবনা সম্পর্কে খলীফা উমর ফারূক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে জানিয়েছিলেনও। কিন্তু সামরিক বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে খলীফা এর অনুমতি দেননি। জনৈক ভারতীয় অধ্যাপক শিবলী নোমানী প্রণীত 'ফারূক' শীর্ষক গ্রন্থে এই খালটি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য রয়েছে। আমরা সে বইয়ের ১৩৫১ হিজরী সালে প্রকাশিত পারসিক সংস্করণ থেকে ওপরের সমস্ত তথ্য ধার করেছি।

এটি ধারণা করা উচিত হবে না যে এসব যিনদিক যারা হযরত আমীরে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ও তাঁর সহযোগী অন্যান্য সাহাবী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-দের কলঙ্ক প্রচারের অবিরাম চেষ্টা করে চলেছে, তারা আহলে বায়ত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর প্রতি মহব্বতের খাতিরেই তা করছে। তারা মুখে তা দাবি করলেও তাদের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে এই মিথ্যে অজুহাতে হযরত আলী (কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর ইজতেহাদ হতে ভিন্ন ইজতেহাদ পোষণকারী সাহাবা-এ-কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-বৃন্দের প্রতি গালমন্দ করা, আর এ (চক্রান্ত) দ্বারা ওইসব মহান ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের মান-মর্যাদা ক্ষুন্ন করে ইসলামের মূলভিত্তি ও অত্যাবশ্যক উৎসগুলোর প্রতি অনাস্থা সৃষ্টি করা এবং সেগুলোকে খণ্ড খণ্ড করে ধ্বংস করা। এক সময় ইহুদীবাদী গোষ্ঠী একই অন্তর্ঘাতী পন্থায় হযরত ঈসা (আলাইহিস্ সালাম)-এর ধর্মেরও বিনাশ সাধন করেছিল; তারা (ঐশীগ্রন্থ) ইঞ্জিলের বিলোপ সাধন করেছিল। অপরদিকে তারা মিথ্যে ইঞ্জিল বানিয়ে নিয়েছিল। এই ইহুদীবাদী চক্রই আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত ঈসায়ী ধর্মকে বর্তমান খৃষ্টধর্মে রূপান্তরিত করে। ইঞ্জিলের আদি বিবরণসম্বলিত পুস্তক

যা বারনাবাসের বাইবেল নামে খ্যাত, তা ১৩৯৩ হিজরী/ ১৯৭৩ খৃষ্টাব্দ সালে পুনরায় প্রকাশ পেলে খৃষ্টবাদ যে মানবসৃষ্ট ওই বাস্তবতা স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে। *'হারকাসা লাযেম ওলান ঈমান'* শীর্ষক (তুর্কী) পুস্তক, যেটি ইস্তাম্বুলে প্রকাশিত এবং ইংরেজি, ফরাসী ও জার্মান ভাষায় অনূদিত হয়েছে, তাতে খৃষ্টধর্ম সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য-উপাত্ত রয়েছে। ইহুদীবাদী চক্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল ইসলাম ধর্মকেও একই পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে একটি অনুরূপ উদ্ভট ব্যবস্থায় পরিণত করা। সৌভাগ্যক্রমে সঠিক পথের অনুসরণকারী মুসলমানবৃন্দ এসব নিকৃষ্ট ইহুদী পরিকল্পনা সম্পর্কে ওয়াকেফহাল ছিলেন। চৌদ্দশ বছর যাবত লক্ষ লক্ষ বই প্রণয়ন করে তাঁরা মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ধর্মকে সারা বিশ্বে প্রচার করে দেন। তাঁরা ইহুদী দুষ্টতা ও মিথ্যাচার (জনসমক্ষে) প্রচার করে তার দলিলভিত্তিক খণ্ডনও পেশ করেন। দ্বীনের এসব শত্রু নিজেদেরকে 'আলাভী' (অথবা শিয়া) বলে প্রচার করতে পারে, আর তাই আমাদের সদাশয় আলাভী (বা শিয়া) ভাইদেরকে এসব শত্রুদের ফাঁদে পা না দেয়ার ব্যাপারে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে; কেননা তারা এই পবিত্র খেতাবকে নিজেদের জন্যে একটি ছদ্মবেশ হিসেবেই ব্যবহার করতে পারে।

'আলাভী' মানে একজন প্রকৃত মুসলমান যিনি হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-কে ভালোবাসেন। কেননা হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু) হলেন ইসলাম ধর্মেরই এক বুনিয়াদি স্তম্ভ। দ্বীন ইসলাম প্রচার-প্রসারকারী সকল মুজাহিদ ও বীরের ইমাম তিনি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর (ঐতিহাসিক) জ্বিহাদ অধ্যায়ের সবচেয়ে কঠিন ও ভয়াবহ পরীক্ষার মুহূর্তে তিনিই সিংহের মতো এগিয়ে আসেন এবং ফলশ্রুতিতে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর রেযামন্দি হাসিল করেন, আর বিপদসঙ্কুল পরিস্থিতি থেকে ইসলাম ও মুসলমানদেরকে রক্ষা করেন। আসাদুল্লাহ তথা আল্লাহ তা'আলার সিংহ নামে খ্যাত হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-কে ইসলামের শত্রুরা তাই পছন্দ করে না। 'আহলুস্ সুন্নাহ' যাঁরা প্রকৃত মুসলমান, তাঁরাই তাঁকে অত্যন্ত ভালোবাসেন। প্রত্যেক সুন্নী মুসলমানের অন্তরই হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর প্রতি মহব্বতে পূর্ণ। সুন্নী উলামা-এ-কেরাম সর্বসম্মতভাবে জ্ঞাত করেন যে আহলে বায়ত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-এর প্রতি ইশক-মহাব্বত হচ্ছে ঈমানদার হিসেবে ইন্তেকাল করার পূর্ব-লক্ষণ। অতএব, 'আলাভী' খেতাবটি আহলুস্ সুন্নাতের জন্যেই বিহিত। সুন্নী জামাআতই এর হক্কদার। এই পবিত্র খেতাব তাঁদেরই মালিকাধীন। ইসলামের

শত্রু যিনদিক গোষ্ঠী এই পবিত্র নামটি সুন্নীদের কাছ থেকে চুরি করে নিয়েছে। মহামূল্যবান এই খেতাবের আড়ালে তারা নিজেদের লুকিয়ে রেখেছে।

আলাভী নামে পরিচয়দানকারী আমাদের ভাইসব! আপনাদের নামের মূল্য সম্পর্কে সচেতন হোন। যে ব্যক্তি এই নামকে আন্তরিকভাবে ভালোবাসেন, এর অর্থ বোঝেন, আর এই নামের সাথে সম্পৃক্ত উচ্চমর্যাদার ব্যাপারে সচেতন, তিনি এর প্রকৃত ধারক ও বাহক আহলুস্ সুন্নাহকেও ভালোবাসবেন! কেননা হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর প্রকৃত ও আন্তরিক মহব্বতকারী এবং ওই মহান ইমামের একনিষ্ঠ অনুসারী মুসলমানবৃন্দ হলেন সুন্নী উলামা-এ-কেরাম। অতএব, যে ব্যক্তি আলাভী হতে চান, তাকে অবশ্যই সুন্নী উলামাবৃন্দের লেখা বইপত্র পড়ে হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর পথ ও মত সম্পর্কে জানতে হবে। যে মুসলমান-ব্যক্তি হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর মতাদর্শ ভালোভাবে শিক্ষা করেন, তিনি আলাভী খেতাবের আড়ালে লেখা বইপত্র ও ম্যাগাজিনের মধ্যে লুক্কায়িত পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্তিকর মতবাদ স্পষ্ট দেখতে পাবেন।

[৩৮]

আমীরে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর উত্তরসূরী নির্বাচন খেলাফতের বৈধ প্রক্রিয়ায় হয়েছিলো

হুরুফী লেখক বলে, "স্বয়ং মুআবিয়া, তার সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন, কর্মকর্তা ও সমর্থকবর্গ যে ফিতনা ও ফাসাদ সৃষ্টি করেছিলেন, তার কুফল ও মন্দ প্রভাব কেবল তাদের সময়কালেই পরিলক্ষিত হয়নি, বরং শতাব্দীর পর শতাব্দী যাবত বিরাজ করেছিল। বিশেষ করে মুআবিয়া তার মদ্যপায়ী, অসচ্চরিত্র ও আহাম্মক ছেলে (ইয়াযীদ)-কে খেলাফতের উত্তরাধিকারী হিসেবে নিয়োগ করেন, (যদিও তিনি তার বদ অভ্যেস সম্পর্কে ওয়াকেফহাল ছিলেন)। এর ফলে মুসলিম উম্মাহর জন্যে এক বিড়ম্বনার সৃষ্টি হয়।"

ইতিহাসবিদ আহমদ জওদাত পাশাও এসব বক্তব্য দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, যার দরুন তিনি বলেন, "আমীরে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক সংঘটিত ভুলগুলোর মধ্যে এটিই সবচেয়ে বড় (মারাত্মক)।" অপরদিকে তাঁর রচিত *"কেসাস-এ-আম্বিয়া"* গ্রন্থে তিনি এই বিষয়টি নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করেছেন এভাবে:

"হযরত আমীরে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) কুফার প্রাদেশিক শাসনকর্তার পদ হতে মুগীরাকে বরখাস্ত করার কথা বিবেচনা করছিলেন। এই কথা শুনে মুগীরা দামেস্কে গিয়ে ইয়াযীদের সাথে দেখা করে তাকে বলেন, 'আসহাব-এ-কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) ও কুরাইশদের শীর্ষস্থানীয় মরুব্বিবৃন্দ সবাই এখন বেসালপ্রাপ্ত হয়েছেন। (কিন্তু) তাঁদের পুত্রবর্গ জীবিত। আপনি তাদের শীর্ষস্থানীয়, আর আপনি সুন্নাহ ও রাজনীতি সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জানেন। আপনার বাবা কি আপনাকে আমীরুল মু'মেনীন পদে অধিষ্ঠিত হতে দেখতে চাইবেন না?' ইয়াযীদ এ কথা তার বাবাকে জানায়। হযরত আমীরে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) মুগীরাকে ডেকে পাঠান। মুগীরা সাহাবী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-দের মধ্যে অন্যতম ছিলেন এবং তিনি বিখ্যাত গাছের নিচে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে আনুগত্যের শপথ নিয়েছিলেন। তিনি আমীরে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে বলেন, 'হে আমীরুল মু'মেনীন! খলীফা হযরত উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর পরে আপনি তো দেখেছেন কতো ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি হয়েছে এবং কতো রক্ত ঝরেছে। ইয়াযীদকে (আপনার পরে) খলীফা মনোনীত করুন, কেননা তিনি মানুষের আশ্রয়স্থল হবেন। এ এক শুভ কাজ হবে। আপনিও এক ফিতনা প্রতিরোধ করতে পারবেন।' মুগীরা কুফা নগরীর দশজন (বিশিষ্ট) ব্যক্তিকে বাছাই করে তাঁর পুত্রের সাথে তাদেরকে দামেস্কে প্রেরণ করেন। তারা খলীফার কাছে এব্যাপারে তদবির করেন। যিয়াদ এ সম্পর্কে শোনার পর ইয়াযীদকে উপদেশ দেন। (উপদেশ অনুযায়ী) ইয়াযীদ নিজের স্বভাব-চরিত্র, চাল-চলন ও অভ্যেস শুধরে নেয়। আমীরে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর অনেক প্রাদেশিক শাসনকর্তাকে দামেস্কে ডেকে তাঁদের সাথে পরামর্শ করেন। দাহহাক নামে তাঁদেরই একজন অনুমতি চেয়ে আরয করেন, 'হে আমীরুল মু'মেনীন! আপনার পরে মুসলমান জাতির সুরক্ষা নিশ্চিত করতে (বলিষ্ঠ) কাউকে প্রয়োজন হবে, যার দরুন মুসলমানদের রক্ত আর ঝরবে না। তাঁরা শান্তি ও সুখ-সমৃদ্ধির মধ্যে বসবাস করতে পারবেন। ইয়াযীদ খুবই চালাক। তিনি জ্ঞান ও নম্রতায় আমাদের মাঝে সেরা। তাকে খলীফা মনোনীত করুন।' দামেস্কীয় (বিশিষ্ট) আরো কয়েকজন অনুরূপ বক্তব্য রাখেন। দামেস্কীয় ও ইরাকী নেতৃবৃন্দও ইয়াযীদের খেলাফতের প্রতি ঐকমত্য পোষণ করেন। এসব কথা শুনে আমীরে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-ও এটি করা সমীচীন ও মঙ্গলজনক মনে করেন। তিনি মক্কা গমন করে সর্ব-হযরত ইমাম হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু

আনহু), আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়র ও আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)'র সাথে এব্যাপারে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে আলাপ-আলোচনা করেন। হজ্জব্রত পালনশেষে তিনি তাঁদের সাথে আবার দেখা করে বলেন, 'আপনারা জানেন আমি আপনাদের প্রতি কতো মহব্বত পোষণ করি। ইয়াযীদ আপনাদেরই ভাই, চাচাতো ভাই। মুসলমানদের পরিত্রাণের খাতিরে আমি চাই আপনারা তার খেলাফতকে মেনে নেন। তথাপিও আমি কিছু শর্তারোপ করছি, যাতে প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের নিয়োগ ও অব্যাহতি, যাকাত, উশর ও অন্যান্য কর আদায় এবং আগত সম্পদ/ সম্পত্তি যথাযথ স্থানে পৌঁছানোর দায়িত্ব ও ক্ষমতা আপনাদের হাতেই থাকবে। এসব প্রক্রিয়ায় ইয়াযীদ কোনো রকম হস্তক্ষেপ করতে পারবে না' [এর মানে দাঁড়ায় তিনি একটি সংবিধান রচনা করতে চেয়েছিলেন]। ওই সাহাবী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-বৃন্দ এই সময় নিশ্চুপ ছিলেন। তিনি তাঁদেরকে কিছু বলতে আরেকবার অনুরোধ করেন। কিন্তু তাঁরা এবারও কোনো জবাব দেননি। অতঃপর খলীফা মিম্বরে আরোহণ করে তাঁর ভাষণে বলেন, 'এই উম্মতের বিশিষ্টজনেরা ইয়াযীদকে খলীফা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। অতএব, তাকে গ্রহণ করুন।' এমতাবস্থায় তাকে তাঁরা স্বীকার করে নেন। এরপর আমীরে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) মদীনায় গমন করেন এবং একই প্রস্তাব সেখানকার মানুষের কাছেও পেশ করেন। তাঁরাও (তাঁর সাথে) একমত পোষণ করেন। এই কাজ শেষে তিনি দামেস্কে ফিরে যান।" [আহমদ জাওদাত পাশা কৃত 'কেসাস-এ-আম্বিয়া']

অতএব, এটি পরিদৃষ্ট হচ্ছে যে হযরতে আমীরে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) (নিজ পুত্র) ইয়াযীদকে খলীফা করার কথা চিন্তা করেননি। তিনি যাদের ওপর আস্থা রাখতেন তাঁরাই এ বিষয়টি তাঁকে সর্বপ্রথমে প্রস্তাব করেন; এরপর বিশিষ্টজনেরা এ ব্যাপারে পরামর্শ দেন; আর সবশেষে জনগণ এর অনুমোদন করেন। এ ধাপগুলো অতিক্রমের পরই কেবল তিনি তাঁর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি ইতিপূর্বে হযরত উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর শাসনকাল-পরবর্তী বিশৃঙ্খলা ও মুসলমানদের রক্তক্ষয় প্রত্যক্ষ করেছিলেন। আর এ সময় ইহুদী চক্রান্তের সমর্থকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং আহলুস্ সুন্নাতের শত্রু খারেজীদের দৌরাত্ম্যে মুসলমানদের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠায় তিনি এ ব্যাপারটি ভালোভাবে চিন্তাভাবনা করেন, আর জনগণের অনুমোদনও নেন। তাঁর দূরদৃষ্টি অনুযায়ী যদি শাসনতন্ত্রটি সমর্থিত হতো, তাহলে একটি নিখুঁত ইসলামি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্ম হতে পারতো। আর এরই ফলশ্রুতিতে তাঁর

এ খেদমতের কারণে সকল মুসলমান এই পৃথিবীর শেষ অবধি তাঁর প্রতি আশীর্বাদ জ্ঞাপন করতেন।

"স্বয়ং মুআবিয়া, তার সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন, কর্মকর্তা ও সমর্থকবর্গ যে ফিতনা ও ফাসাদ সৃষ্টি করেছিলেন, তার কুফল ও মন্দ প্রভাব কেবল তাদের সময়কালেই পরিলক্ষিত হয়নি বরং শতাব্দীর পর শতাব্দী যাবত বিরাজ করেছিল", এই অভিযোগটি উত্থাপন করা খোদ ইতিহাস অস্বীকারেরই নামান্তর। কেননা, তাঁরই পৌত্র (খলীফা) দ্বিতীয় মুআবিয়া তাঁর জ্ঞান, বিচক্ষণতা, ধার্মিকতা, ইসলামের প্রতি আনুগত্য ও ন্যায়পরায়ণতার জন্যে সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি খলীফার পদে দুই মাস খেদমত করার পর ইন্তেকাল করেন। যেহেতু তাঁর কোনো সন্তান তখন আর জীবিতাবস্থায় ছিল না, সেহেতু মারওয়ান বিন হাকাম সৈন্যবলে ক্ষমতা জবরদখল করে নেন। মারওয়ান হযরত আমীরে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর চাচাতো ভাই হলেও তাঁরা একে অপরের ঘনিষ্ঠ ছিলেন না। এই ব্যক্তি বা পরবর্তীকালে আগত কোনো উমাইয়া শাসকের কৃত ভুলভ্রান্তির জন্যে আমীরে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে দোষারোপ করার মতো আর কোনো নির্বোধ আচরণ হতে পারে না। বস্তুতঃ আহলে বায়ত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)'র প্রতি আব্বাসীয় খলীফাদের কৃত অত্যাচার-অবিচার ও নিষ্ঠুরতা উমাইয়া শাসকদের কৃত অপরাধের চাইতেও বেশি ছিল। ইতিহাসের পাঠকমাত্রই এ বাস্তবতা সম্পর্কে ওয়াকেফহাল। আব্বাসীয় শাসকদের দ্বারা সংঘটিত বর্বর ও গুরুতর অপরাধের জন্যে আব্বাসীয়দের প্রপিতা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ও তাঁর পিতা হযরত আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে দোষারোপ করা ও অভিসম্পাত দেয়া যেমন হীন কুৎসা রটনা, তেমনি মারওয়ান ও তার বংশধর খলীফাদের দ্বারা সংঘটিত লঘুতর তাৎপর্যের অব্যবস্থাপনার দায়ে হযরত আমীরে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে দোষারোপ করাও অধিকতর আহাম্মকীপূর্ণ ও নিকৃষ্ট কুৎসা রটনা। যারা অভিযোগ করেন যে হযরত আমীরে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ও তাঁর সন্তান-সন্ততি শতাব্দীর পর শতাব্দী যাবত ফিতনা-ফাসাদ জিইয়ে রেখেছিলেন, তাদের জ্ঞাতার্থে আমরা আরেকটি বাস্তবতা তুলে ধরতে চাই এ মর্মে যে এই মহান সাহাবী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)'র কোনো আত্মীয়-স্বজনই তাঁর পৌত্র, ন্যায়পরায়ণতা ও খোদাভীরুতার জন্যে বিখ্যাত ও সমাদৃত খলীফা দ্বিতীয় মুআবিয়ার পরে আর কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হননি। হযরত মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর খালেদ নামে

আরেকজন পুত্র ছিলেন। এই ব্যক্তি রাজ্য শাসনের প্রতি আগ্রহী ছিলেন না। তাঁর বাবা তাঁকে বৈজ্ঞানিক হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন। প্রখ্যাত রসায়নবিদ জাবের এই খালেদের শিষ্য ছিলেন এবং তিনি শিক্ষকের কাছ থেকে রসায়নবিদ্যা শিক্ষা করেন। অতএব, এসব বদমাইশ কলঙ্ক লেপনকারী তাদেরকে কেউ থামাবার নেই মনে করে এই নিরপরাধ খলীফাকে আক্রমণ করেছে এবং তাঁর প্রতি এমন গোস্তাখিমূলক অপবাদ দিয়েছে, যা তাঁর সম্পর্কে জ্ঞান ও আমাদের মস্তিষ্কের সাথে খাপ খায় না।

আল্লাহ তা'আলা তাই এমন সহস্র সহস্র সুন্নী উলামা সৃষ্টি করেছেন যাঁরা এই নিরপরাধ খলীফা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর পক্ষ সমর্থন করে শত্রুদেরকে বে-ইজ্জত করে দিয়েছেন। এই সকল মহান ইসলামী জ্ঞান বিশারদ হযরতে আমীরে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর পক্ষে বইপত্র লিখে তাঁর অধিকার সংরক্ষণ করেছেন এবং এ মহান সাহাবী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর উন্নত বৈশিষ্ট্য ও মূল্যবোধ সারা বিশ্বকে জানিয়ে দিয়েছেন।

[৩৯]

ইমাম হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর প্রতি অত্যাচারের জন্যে আমীরে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) দায়ী নন

হুরুফী লেখক বলে, "এটি কোনো বিশ্বাসযোগ্য কথা নয় যে ইমাম হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর প্রতি পরবর্তীকালে অকল্পনীয় যে ভয়াবহ মন্দ আচরণ করা হয়েছিল, তা মুআবিয়া তার জীবদ্দশায় পরিকল্পনা করেননি, বা জানেননি, কিংবা অন্তত কল্পনাও করেননি।"

যিয়াদের পুত্র উবায়দুল্লাহ কর্তৃক সংঘটিত কারবালার বিয়োগান্ত ঘটনার ব্যাপারে মুসলমান মাত্রই গভীর শোকাহত হবেন না, এমনটি চিন্তা করা একেবারে অসম্ভব। ওই বিষাদময় দিনগুলোর স্মৃতিচারণ দ্বারা প্রত্যেক সুন্নী মুসলমানের চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে। কেউ কেউ মুহররম মাসের দশম দিবসে শোক পালন করে থাকেন। এরা যেখানে বছরে শুধু একটি দিন শোক জ্ঞাপন করেন, আমরা সেখানে সারা বছরই স্মৃতিচারণ করে থাকি। এরা যেখানে হযরত আলী (কাররামাল্লাহু আনহু)-এর পুত্র হওয়ার কারণে ইমাম হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর জন্যেই কেবল শোক পালন করেন, আমরা সেখানে খোদ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নাতি হওয়ার কারণেই তাঁর স্মৃতিচারণ করে থাকি। আমরা সুন্নী মুসলমান সমাজ হযরত আলী

(কার্‌রামাল্লাহু আনহু)-কে ভালোবাসি, কেননা তিনি মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মেয়ের জামাই ছিলেন এবং তিনি হুযূর পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নির্দেশে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে সাহসী সিংহের মতো যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। আর আমরা হযরত আমীরে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কেও ভালোবাসি, কেননা তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সম্মুন্দি ছিলেন এবং তিনি আল্লাহরই ওয়াস্তে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে জ্বিহাদে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ ফরমান,

فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ.

–আমার আসহাব (সাথী)-বৃন্দকে ভালোবাসো! যে ব্যক্তি তা করে, সে আমাকে মহব্বত করার খাতিরেই তা করে। আমার আসহাবদের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন হয়ো না! যে ব্যক্তি তাদের প্রতি বৈরিতা পোষণ করে, সে প্রকৃতপক্ষে আমারই প্রতি বৈরিতা লালন করে।[১]

সাহাবী হওয়ার কারণেই আমরা হযরত ইমামে আলী (কার্‌রামাল্লাহু আনহু) ও হযরত আমীরে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে ভালোবাসি। ইতিপূর্বেকার অধ্যায়ে আমরা ব্যাখ্যা করেছি যে ইয়াযীদের শাসনামলে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনাগুলোর দায় হযরত আমীরে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর প্রতি আরোপ করা এক মহা ঘৃণ্য কুৎসা বৈ কিছু নয়। তিনি তাঁর বেসালের আগে এগুলোর ব্যবস্থা করেছিলেন বলা আরো জঘন্য ও নীচ একটি অপবাদ। সর্ব-ইমাম হাসান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ও হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর প্রতি আমীরে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর মহব্বত ও শ্রদ্ধাবোধ এবং তাঁদের প্রতি তাঁর উদার ও দয়াপরবশ মনোভাব বিভিন্ন বইপত্রে লিপিবদ্ধ আছে। যাদের মোটামুটি পাঠাভ্যাস আছে, তাদের এসব তথ্য ভালোভাবে জানা প্রয়োজন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দুই নাতি যাঁদেরকে তাঁদের পুতঃপবিত্র নানাজান বেহেস্তের খোশ-খবরী দিয়েছিলেন, তাঁদেরকে যদি হযরতে আমীরে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) আঘাত করার কথা বিবেচনা করতেন, তাহলে তা সহজেই তিনি নিজের খেলাফত আমলে করতে পারতেন।

---

১. ক) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু ফী মান সাব্বা আসহাবিন্ নবী, ১২:৩৬২, হাদিস নং : ৩৭৯৭।
খ) তাবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবু মানাক্বিবিল কুরাইশ..., পৃ. ৩০৯, হাদিস নং : ৬০০৫।
গ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবু হাদিসি আবদিল্লাহ ইবনে মাগফল, ৩৪:১৫৮, হাদিস নং: ১৬২০১।

কেননা, ওই সময় সব কিছু তাঁরই নিয়ন্ত্রণে ছিল। অথবা, তিনি অন্তত তা-ই বলতে পারতেন। বরঞ্চ তিনি সব সময় উল্টো তাঁদের ভালাই নিশ্চিত করতেন; আর তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন; আর যেখানেই থাকুন না কেন সর্বদা তিনি তাঁদের মর্যাদাকে মূল্যায়ন করে প্রশংসা করতেন। হযরতে আমীরে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর বেসালপ্রাপ্তির পর ঘটে যাওয়া রক্তারক্তির ঘটনা তাঁরই গোত্রীয় পূর্ব-পরিকল্পনার ফসল মর্মে অভিযোগ উত্থাপন করা জটিল ও কুটিল অন্তরের পরিচায়ক, অথবা ঘোর শত্রুতা বা বদ্ধ উন্মাদের পরিচায়ক। হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু আনহু) কায়স বিন সা'আদকে মিসরের প্রাদেশিক শাসনকর্তা পদে নিয়োগ দিয়ে তাঁকে আদেশ করেন যেন তিনি খলীফার (হযরত আলীর) আনুগত্য অস্বীকারকারীদের সাথে যুদ্ধ করেন। হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু আনহু)-এর খেলাফত অস্বীকারকারী মিসরীয়দের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন ইয়াযীদ বিন হারিস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ও মাসলামা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর মতো সাহাবীবৃন্দ। শেষোক্ত জন ইতিপূর্বে বদরের জ্বিহাদে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এঁরা সবাই হাজরাজ গোত্রের বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। এমতাবস্থায় কায়স খলীফা হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু আনহু)-কে একটি চিঠি মারফত জানান, "আপনি আমাকে এমন মানুষের সাথে যুদ্ধ করার আদেশ করেছেন, যাঁরা আপনার জন্যে ক্ষতিকর নন। যাঁরা নীরবে বসে আছেন, তাঁদেরকে বিরক্ত না করাই যথাযথ।" এতে খলীফা কায়সকে মিসরের প্রাদেশিক শাসনকর্তার পদ থেকে বরখাস্ত করেন এবং মুহাম্মদ বিন আবি বকরকে তার স্থলাভিষিক্ত করেন। নতুন প্রাদেশিক শাসনকর্তা মুহাম্মদ নিরপেক্ষ মানুষজনকে জানায়, "হয় মান্য করো, না হয় দেশত্যাগ করো।" তারা বলেন, "আমাদেরকে বিরক্ত করবেন না, শেষ সময় পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করবো।" যখন মুহাম্মদ বিন আবি বকর তাদের অজুহাতকে প্রত্যাখ্যান করে, তখন তারা অস্ত্র তুলে নেন হাতে, যার দরুন প্রদেশটিতে বিবাদ-বিসম্বাদ দেখা দেয় এবং এরই পরিণতিতে (প্রাদেশিক শাসনকর্তা) মুহাম্মদ নিহত হয় এবং তাকে পোড়ানো হয়। এক সময় এই মুহাম্মদই ইবনে সাবা'র লোকদের সাথে সহযোগিতা করেছিল, আর খলীফা উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাঁর গৃহের পাশের বাড়ির দেয়াল টপকে জানালা দিয়ে খলীফার ঘরে প্রবেশ করেছিল এবং তরবারি উঁচিয়ে খলীফাকে আক্রমণও করেছিল; অতঃপর আপন সাথীদের হাতে খলীফাকে শহীদ করার দায়িত্ব অর্পণ করে সে স্থান ত্যাগ করেছিল, যা আমরা ইতিপূর্বে এই বইয়ের বত্রিশতম অধ্যায়ে বর্ণনা

করেছি। হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু আনহু) কর্তৃক কায়সের পরিবর্তে এই মুহাম্মদকে মিসরের প্রাদেশিক শাসনকর্তা পদে নিয়োগ করার বিবরণের সাথে *"কেসাস-এ-আম্বিয়া"* বইটি আরো যোগ করে, "হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু আনহু)-কে মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে এই ভ্রান্ত সিদ্ধান্তটি গ্রহণে বাধ্য করেছিল তাঁরই ভাই জাফরের পুত্র।" এক্ষণে আমাদেরকে বিবেকবান হতে হবে। মুহাম্মদ ইবনে আবি বকরের মতো লোক, খলীফা উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর শাহাদাতে যার ঘৃণ্য ভূমিকা ছিল, তাকে মিসরীয় প্রাদেশিক শাসনকর্তা পদে নিয়োগ দেয়ার দায়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র মহান ইমামে আলী (কার্‌রামাল্লাহু আনহু)-কে কি সমালোচনা করা যায়? ধর্মীয় বিদ্যায় আমরা যারা ওই সকল মহান সাহাবী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর চেয়ে অনেক অনেক নিকৃষ্ট এবং অনেক নিকৃষ্ট পাপীও, আমাদের কাছে উত্তরাধিকারসূত্রে এই দায়িত্ব অর্পিত হয়নি যে আমরা আমীরে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর বেসালের পরে ঘটে যাওয়া কদর্য ঘটনাগুলোর জন্যে তাঁকেই দোষী সাব্যস্তকারী লোকদের অনুকরণে হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু আনহু)-কেও দায়ী করবো। আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে ওই সকল মহান ব্যক্তিত্বদেরকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় না করানো, বরং তাঁদেরকে ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা করা। এটিই মুসলমানের কাজ হবে। তবে এটি স্বাভাবিক যে ইসলামের শত্রুদের ফাঁদে যারা পড়ে গিয়েছে এবং নিজেরাই ইসলামের শত্রুতে পরিণত হয়েছে, তারা আমাদের মতো চিন্তা করতে পারবে না। তারা আসহাব-এ-কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-কে গালমন্দ করে ইসলামের ধ্বংস সাধনের পথটি-ই বেছে নেবে।

[৪০]

আমীরে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর শাসন ছিলো গৌরবোজ্জ্বল

হুরুফী লেখক বলে, "মুআবিয়া কর্তৃক সফলভাবে দেশ শাসন ও রাজ্যসীমা সম্প্রসারণ এবং শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠাকরণ তার অসংখ্য হত্যার দায় মোচন করবে না কিংবা ওজর হিসেবেও কাজ করবে না। তার প্রশাসনের আমলা ও কর্মকর্তাবর্গ, আপন আত্মীয়স্বজন ও সমর্থকদের দ্বারা আহলে বায়তে নববী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) ও তাঁদের সমর্থক মুসলমানদের প্রতি যে নৃশংস, নিষ্ঠুর ও নীচ আচরণ করা হয়, তা শতাব্দীর পর শতাব্দী বজায় থাকে। এসব ফিতনা, ফাসাদ, বিশ্বাসঘাতকতা, খুন-খারাবি ও দুষ্টাশয়তা এক নিন্দনীয় ও ভয়ে রক্ত জমে যাওয়ার মতো বীভৎস পন্থায় অব্যাহত থাকে।"

আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি, যিনদিক গোষ্ঠী হযরত আমীরে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর সকল কর্মের প্রতি নিষ্ঠুরতা ও খুন-খারাবির কলঙ্ক লেপন করতে অপতৎপর। আব্বাসীয় খেলাফত আমলে সংঘটিত অন্তহীন হত্যাকাণ্ডের দায়ও এই আশীর্বাদধন্য মহান ব্যক্তির প্রতি চাপাতে তারা লজ্জিত নয়। এটি স্পষ্ট যে ওপরোক্ত বানোয়াট লেখনীর মতো যারা লিখে থাকে, তারা বিকৃত রুচির হোতা; তারা শুষ্ক মদের মতোই সাবানের ফেনারাশি, যা কোনো কিছু স্পর্শ করলেই ময়লা হয়। ইসলামী উলামাবৃন্দের বইপত্রে এসব (ঐতিহাসিক) ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে, যার দরুন এই সত্যটি প্রতীয়মান হয় যে অসৎ লোকদের দ্বারা ওই মহান সাহাবী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর প্রতি ফিতনা-ফাসাদ, দেশদ্রোহিতা, বিশ্বাসঘাতকতা ও খুন-খারাবির কলঙ্ক লেপনের অপচেষ্টা করা হলেও তিনি জলের মতোই পরিষ্কার ও নির্মল (নিষ্কলুষ)। নিচে প্রদত্ত *'মির'আতুল কায়েনাত'* গ্রন্থের উদ্ধৃতিটি এর একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ:

হযরত আমীরে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হলেন হযরত আবূ সুফিয়ান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর পুত্র, তিনি হরব-এর পুত্র, তিনি উমাইয়ার পুত্র, তিনি আব্দু শামস-এর পুত্র, তিনি আব্দ-উ-মানাফ-এর পুত্র। আব্দ-উ-মানাফ হলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর চতুর্থ পিতামহ। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যখন ৩৪ বছর বয়স, ওই সময় আমীরে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) জন্মগ্রহণ করেন। মক্কা বিজয়ের দিন ১৯ বছর বয়সে তিনি তাঁর বাবা আবূ সুফিয়ান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-সহ ইসলাম কবূল করেন। তাঁদের ঈমান সুদৃঢ় ছিল। আমীরে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ছিলেন লম্বা, ফর্সা, দেখতে সুন্দর এবং রাজকীয়। তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সম্মুন্দি ছিলেন এবং কুরআন লিপিবদ্ধকারী তাঁরই সহকারী (কাতেবে ওহী)। তিনি বহুবার হুযূর পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দোয়া অর্জনের সৌভাগ্য দ্বারা আশীর্বাদধন্য হন। এসব দোয়ার কিছু উদাহরণ নিচে দেয়া হলো– "ইয়া রাব্বী (হে আমার প্রভু)! তাকে (মুআবিয়াকে) সত্য, সঠিক পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন এবং অন্যদেরকেও সঠিক পথে হেদায়াত দেয়ার জন্যে তাকে পথপ্রদর্শক বানিয়ে দিন!" এবং "ইয়া রাব্বী! মুআবিয়াকে ভালোভাবে লিখতে ও হিসেব করতে শেখান। আপনার আযাব (শাস্তি) হতে তাকে রক্ষা করুন! ইয়া রাব্বী! বিভিন্ন রাজ্যের ওপর তাকে আধিপত্যশীল করে দিন!" অধিকন্তু, "ওহে মুআবিয়া, মানুষের কল্যাণ

সাধন করো যখন তুমি শাসক হবে"– এই উপদেশ তাঁকে প্রদান করে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর শাসক হওয়ার আগাম সুসংবাদ দিয়েছিলেন। আমীরে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর নিজের বক্তব্য তুলে ধরেন এভাবে, "মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছ থেকে এই শুভ সংবাদ শোনার পর আমি খলীফা হওয়ার আশায় ছিলাম।" একদিন হুযূর পূর নূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোনো জন্তুর ওপর সওয়ারী ছিলেন, আর হযরত মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-ও পেছনে সওয়ারী ছিলেন। এমতাবস্থায় নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, "ওহে মুআবিয়া! তোমার শরীরের কোন্ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আমার সবচেয়ে কাছে অবস্থিত?" তিনি উত্তরে তাঁর পেটের কথা জানানোর পর মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দোয়া করেন, "জ্ঞান দ্বারা এটি (পেট) পূর্ণ করে দিন এবং তাকে একজন নম্র স্বভাবের মানুষে পরিণত করুন!" হযরত ইমামে আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু) আমীরে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) সম্পর্কে বলেন, "মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর প্রশাসন নিয়ে সমালোচনা করো না। তিনি (ইহলোক) ত্যাগ করলে তোমরা দেখবে সবগুলো মাথাই (ইহধাম) ত্যাগ করেছে।" হযরত আমীরে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ছিলেন জ্ঞানী, বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, ক্ষমাশীল ও দয়াবান ব্যক্তি। মহা গুরুত্বপূর্ণ ও কঠিন বিষয়াদি সামলানোর ক্ষমতা ও গুণ তাঁর মধ্যে ছিল। তাঁর নম্রতা ও ধৈর্য বুদ্ধিদীপ্ত হওয়ার খ্যাতি বয়ে এনেছিল। তাঁর ক্ষমাশীলতা ও দয়া বিভিন্ন উপাখ্যানের সৃষ্টি করেছিল, যার দরুন এগুলো সম্পর্কে দুটি গোটা বই লেখা হয়। আরবে চারজন প্রতিভাবান ব্যক্তি সুখ্যাতি অর্জন করেন। এঁরা হলেন আমীরে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু), আমর ইবনে আস্ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু), মুগীরাহ ইবনে শু'বা এবং যিয়াদ ইবনে আবিহ। আমাদের গুরুজনবৃন্দ বিবৃত করেন যে আমীরে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ছিলেন রাজকীয়, সাহসী, বিভিন্ন বিষয় সামলানোর ক্ষেত্রে দক্ষ, অধ্যয়নশীল, দানশীল, উদ্দীপনাময় ও অধ্যবসায়ী। তিনি যেন শাসক হওয়ার জন্যেই সৃষ্টি হয়েছিলেন। বস্তুতঃ হযরত উমর ফারূক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) তাঁকে যখন-ই দেখতে পেতেন, বলতেন, "কতো না সুন্দর আরব সুলতান এ ব্যক্তি!" তিনি এতোই দানশীল ছিলেন যে একদিন ইমাম হাসান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) তাঁকে নিজের ঋণগ্রস্ত হওয়ার কথা জানালে আমীরে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) তাঁকে ৮০০০০ স্বর্ণমুদ্রা উপহারস্বরূপ দেন। সিফফীনের যুদ্ধ জয়ের কারণে তিনি হযরত আমর ইবনে

আস্ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে মিসরের প্রাদেশিক শাসনকর্তার পদ ও সে দেশের জন্যে ৬ মাসের রাজস্ব দান করেন। তিনি দৈহিক সৌন্দর্যমণ্ডিত ঘোড়ায় চড়তেন, দামী জামাকাপড় পরতেন, আর ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করতেন। তবু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সোহবত (সান্নিধ্য)-এর বরকত দ্বারা ধন্য হওয়ার দরুন তিনি কখনোই শরীয়তের বিধি-নিষেধ লঙ্ঘন করতেন না। একবার মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে ডেকে পাঠান। সাহাবী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-বৃন্দ ফিরে এসে জানান তিনি খাচ্ছেন। হুযূর পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আবার ডেকে পাঠান। কিন্তু এবারও তাঁকে জানানো হয় 'তিনি খাচ্ছেন।' এমতাবস্থায় নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, "আল্লাহ তা'আলা যেন তাকে কখনোই পেট পুরিয়ে (খেতে) না দেন।" এরপর থেকে আমীরে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) প্রচুর খেতেন। খলীফা উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর শাসনামলে তিনি দামেস্কের প্রাদেশিক শাসনকর্তা পদে চার বছর খেদমত করেছিলেন; হযরত উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর খেলাফত আমলে করেছিলেন ১২বছর; হযরত ইমামে আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর খেলাফত আমলে ৫বছর, আর ইমাম হাসান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর খেলাফত আমলে ৬মাস। অতঃপর হযরত ইমাম খেলাফত ত্যাগ করলে আমীরে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) সকল মুসলিম রাজ্যের বৈধ খলীফা হন, আর খেলাফতের পদে অধিষ্ঠিত থেকে তিনি ১৯ বছর ৬ মাস শাসন করেন।

"কেসাস-এ-আম্বিয়া" গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে, হিজরী ৬০ সালে খুতবা (ধর্মীয় ভাষণ) পাঠশেষে হযরতে আমীরে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর ভাষণ সমাপ্ত করেন এ কথা বলে, "ওহে মানুষেরা! আমি তোমাদেরকে শাসন করেছি যথেষ্ট সময়। তোমরা আমার দ্বারা হয়রান, আর আমিও তোমাদের দ্বারা হয়রান। আমি এক্ষণে চলে যেতে চাই। আর তোমরাও চাও আমি চলে যাই। তবু আমার পরে আর আমার চেয়ে শ্রেয়তর কেউই আসবে না। বস্তুতঃ আমার পূর্ববর্তী শাসকবৃন্দ আমার চেয়েও শ্রেষ্ঠ ছিলেন। কোনো ব্যক্তি যদি আল্লাহর সান্নিধ্য পেতে চান, তবে আল্লাহ তা'আলাও তাঁকে কাছে পেতে চাইবেন। হে প্রভু! আমি আপনার সান্নিধ্য চাই। আমাকে আপনার এই সান্নিধ্যের সৌভাগ্য দ্বারা আশীর্বাদধন্য করুন। আমাকে আশীর্বাদ দিন এবং সুখি করুন।" কিছুদিন পরই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। এমতাবস্থায় তিনি ইয়াযীদকে ডেকে পাঠান এবং তাকে বলেন, "হে আমার পুত্র! আমি তোমাকে যুদ্ধ দ্বারা হয়রান করিনি,

রাস্তাঘাটে পাঠিয়েও তা করিনি। আমি (নিজেই) শত্রুদের দুর্বল করে দিয়েছি। আরবদেরকেও বাধ্য করেছি তোমাকে মানতে। আমি এতো বড় সম্পত্তি সংগ্রহ করেছি যা খুব কম সংখ্যক মানুষই সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছেন। হেজাযের মানুষদের সুরক্ষা নিশ্চিত করো! তাঁরা তোমারই মূল (শেকড়)। তাঁরাই সবার চেয়ে মূল্যবান, যাঁরা তোমার কাছে আসবেন। ইরাকের জনগণেরও সেবাযত্ন করো! তাঁরা যদি তোমার কর্মকর্তাদের বরখাস্ত করা দেখতে চান, তবে তাঁদের ইচ্ছানুযায়ী তা-ই করো! দামেস্কীয় জনগণেরও কল্যাণ নিশ্চিত করো, কেননা তাঁরা তোমারই সাহায্যকারী। আমি তোমার ব্যাপারে কাউকেই ভয় পাই না। তবু (রাজনীতিতে) ইমাম হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) একজন ভাসাভাসা জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি। কুফার লোকেরা হয়তো তাঁকে তোমার বিরুদ্ধে উসকে দিতে পারে। তাঁকে (যুদ্ধে) যখন তুমি পরাস্ত করবে, তখন তাঁকে ছেড়ে দেবে। তাঁর সাথে সদাচরণ করবে! কেননা তিনি আমাদের ঘনিষ্ঠ জন; আমাদের ওপর তাঁর অধিকার আছে; আর তিনি হলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পৌত্র।" ব্যাধি বৃদ্ধি পেলে হযরতে আমীরে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, "মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে তাঁর একখানি জুব্বা (আলখেল্লা) পরতে দিয়েছিলেন। আমি আজো তা সংরক্ষণ করেছি। একদিন তিনি তাঁর নখ কাটলে তাও একটি বোতলে আমি অদ্যাবধি সংরক্ষণ করেছি। আমি বেসালপ্রাপ্ত হলে ওই জুব্বা মোবারক আমাকে পরিয়ে দেবে, আর ওই নখ দাফনের সময় আমার চোখ ও নাকের ওপর রাখবে। এই বরকতময় বস্তুর অসীলায় হয়তো আল্লাহ তা'আলা আমাকে ক্ষমা করবেন।" অতঃপর তিনি আরো বলেন, "আমার বেসালপ্রাপ্তির পরে কোনো মহত্ত্ব বা দয়া আর অবশিষ্ট থাকবে না। অনেক মানুষের আয় বন্ধ হয়ে যাবে। অভাবী মানুষেরা খালি হাতে ফিরে যাবে।" তাঁর দুঃখ ব্যক্তকারী সবশেষ বক্তব্য ছিল এরকম, "আহা, আমি যদি যি-তুওয়া নামের গ্রামে বসবাসকারী কুরাইশ বংশীয় কেউ হতে পারতাম, নেতা বা শাসক হওয়ার মতো বিষয়ে ব্যস্ত হওয়ার পরিবর্তে।" হযরতে আমীরে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) রজব মাসে বেসালপ্রাপ্ত হন এবং তাঁর মাযার শরীফ দামেস্কে অবস্থিত। *["কেসাস-এ-আম্বিয়া" গ্রন্থের উদ্ধৃতি সমাপ্ত]*

অতএব, এটি পরিদৃষ্ট হচ্ছে যে হযরতে আমীরে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এক আশীর্বাদধন্য সাহাবী ছিলেন।

[৪১]

আসহাব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-বৃন্দের শ্রেষ্ঠ ও নিখুঁত হওয়ার প্রমাণ

হুরুফী লেখক বলে, "বাস্তব ঘটনাগুলো যেমনভাবে আছে, ঠিক সেভাবেই প্রত্যেক মুসলমানকে জানতে হবে, তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং 'আমার আসহাব (সাথী)-দেরকে সমালোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত করো না', এই হাদিসটি অনুযায়ী আমল তথা অনুশীলন করতে হবে। এটি নিশ্চিত যে ওপরে উল্লেখিত বিশ্বাসঘাতকতা ও খুনোখুনির ঘটনার উৎসগুলোকে প্রকৃত ইজতেহাদের সংজ্ঞার আওতায় ব্যাখ্যা করা যাবে না। এতে কোনো সন্দেহই নেই যে এধরনের কর্মকাণ্ড ও আচরণ খোদায়ী গযবের (রুদ্ররোষের) উপলক্ষ হবে। আর এ কথাও ভাবা যায় না যে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সোহবত (সান্নিধ্য) অর্জন দ্বারা খোদায়ী আযাব (শাস্তি) হতে মুক্তি পাওয়া যাবে।"

দেখুন, কীভাবে এই লেখক অনর্থক কথাবার্তা বলছে! একদিকে, সে "আমার সাহাবাদের প্রতি লা'নত দেবে না"– হাদিসটি উদ্ধৃত করেছে; অপরদিকে, আসহাব-এ-কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর শ্রেষ্ঠজনদের প্রতি কল্পনারও অতীত হীন অপবাদ দিয়েছে এবং এমন কুৎসা রটনা করেছে যা অন্যরা প্রকাশ করতেও লজ্জাবোধ করবে। একদিকে কঠোর ডায়েটিংয়ের বুলি, আরেক দিকে আচারমাখা ফুলকপি (মুখে শেখ ফরীদ, বগলে ইট)! সে জানে হযরত আমীরে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর মতো মহান ইসলামী ব্যক্তিত্বকে সে মোটেও কলঙ্কিত করতে পারবে না, কেননা তিনি ছিলেন মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অতি প্রিয়ভাজন ও আপন জন, আর আমরা ইতিপূর্বে যেমনটি বলেছি, তাঁর এসব সৎ গুণ ও বৈশিষ্ট্য সর্বজনবিদিত ছিল। এমতাবস্থায় হুরুফী লেখক পুত্র ইয়াযীদের সংঘটিত হত্যাকাণ্ড ও বর্বরতাকে তারই পিতার মতো মহান সাহাবী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর প্রতি আরোপ করার অপচেষ্টারত। ফলে সে তারই উদ্ধৃত ওপরের হাদিস শরীফকে অবজ্ঞা করেছে। সিফফীন যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু) বলেন, "আমাদের ভাইয়েরা আমাদেরই বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন।" *'কেসাস-এ-আম্বিয়া'* গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে যে যুদ্ধ যখন তুঙ্গে, তখন হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু) তরবারি হাতে সিংহের মতো প্রতিপক্ষব্যূহ ভেদ করে হযরত আমীরে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর তাঁবুতে প্রবেশ করেন এবং তাঁর সাথে কথা বলেন। কোনো মুসলমানই এই দুই মহান সাহাবী (রাদ্বিয়াল্লাহু

আনহু)'র মধ্যকার ইজতেহাদী মতপার্থক্যকে অজুহাত হিসেবে দেখিয়ে হযরত আমীরে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে আক্রমণ করতে পারেন না। বস্তুতঃ এ ধরনের আচরণের পেছনে অন্য কোনো দুরভিসন্ধি লুকিয়ে আছে। ইয়াযীদ, ইবনে যিয়াদ ও সা'আদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর পুত্র উমর কর্তৃক সংঘটিত বিভিন্ন হত্যাকাণ্ডকে বিষাদময় ভাষায় বর্ণনা করে তার দোষ ও কলঙ্ক নিরীহ এবং মহৎ গুণের অধিকারী ওই সাহাবী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু), যিনি এসব দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার জন্যে দায়ী নন এবং যিনি বেসালপ্রাপ্ত হওয়ার কারণে আত্মপক্ষ সমর্থনে অপারগ, তাঁর প্রতি আরোপ করা আর কী-ই বা হতে পারে একমাত্র গোষ্ঠীগত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ ছাড়া? আর এটি এমনই এক চক্রান্ত যা দ্বারা কেউ ভুল বুঝে এবং সমঝদারি হারিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওই হাদিস শরীফের অনুসরণেও ব্যর্থ হতে পারে। আমরা এখানে একটি বিষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করতে চাই, যাতে কেউ আমাদের ভুল না বোঝেন: আমরা এ কথা বোঝাই নি যে হযরত মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) আম্বিয়া (আলাইহিমুস্ সালাম)-বৃন্দের মতোই ভুলের উর্ধ্বে। পক্ষান্তরে, হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-সহ সকল সাহাবা-এ-কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-ই যেমন (ইজতেহাদী) ভুল-ভ্রান্তি করেছেন, তেমনি আমীরে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-ও সে রকম ভুলত্রুটির উর্ধ্বে ছিলেন না। তথাপি আল্লাহ পাক তাঁর আল-কুরআনে উদ্দেশ্য করেছেন,

> –যেসব সাহাবা সৎকর্ম করেছেন এবং আল্লাহরই ওয়াস্তে জ্বিহাদ পরিচালনা করেছেন, তাঁদের অতীত ও ভবিষ্যত সমস্ত গুনাহ (পাপ) মাফ করা হবে। ওইসব মনোনীত ও পছন্দনীয় মানুষ অবিশ্বাসী হবেন না; তাঁরা বেহেশতে প্রবেশ করবেন [আল-কুরআনের ব্যাখ্যা[১]]।

এই উন্মত্ত লোকেরা আয়াতে করীমারই বিরোধিতা করছে! তারা বলে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সোহবত আমীরে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে বাঁচাতে পারবে না। অথচ হুযূরে পূর নূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সোহবত অর্জনকারী ব্যক্তিদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'লার প্রকাশিত কতিপয় আয়াতে করীমা উদ্দেশ্য করে:

[১]. আল কুরআন : সূরা নূর, ২৪:৫৫।

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا.

> –আল্লাহ তা'আলা তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট, আর তাঁরাও তাঁর প্রতি রাজি। আমি তাঁদের জন্যে জান্নাত রেখেছি, তাঁরা সেখানেই চিরকাল বসবাস করবেন।[১]

আমারই খাতিরে জ্বিহাদে অংশগ্রহণকারী মানুষেরা যারা কষ্ট স্বীকার করেন কিংবা শাহাদাত বরণ করেন, তাঁদের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করা হবে।

এই বইয়ের ১৬তম অধ্যায়ের শেষে উদ্ধৃত হাদিসে সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পবিত্র সোহবত হযরত আমীরে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে খোদায়ী আযাব হতে রক্ষা করবে।

হযরত আমীরে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)'র প্রতি অপবাদদাতা চক্র যেহেতু ওপরে উদ্ধৃত কুরআনের আয়াত ও হাদিস শরীফগুলোর সরাসরি বিরোধিতা করতে পারে না, সেহেতু তারা বলে যে ওতে বর্ণিত শুভ সংবাদের উদ্দিষ্টদের মাঝে তিনি অন্তর্ভুক্ত নন। তারা আরো বলে, তিনি হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর প্রতি জুলূম-অত্যাচার করার দরুন কাফের তথা অবিশ্বাসী হয়ে গিয়েছিলেন। তাদের অভিযোগের পক্ষে তারা নিচের দুটো হাদিস শরীফ পেশ করে থাকে:

مَنْ آذَى عَلِيًّا فَقَدْ آذَانِي.

> –যে ব্যক্তি আলীকে কষ্ট দেয়, সে প্রকৃতপক্ষে আমাকেই কষ্ট দেয়।[২]

فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ، اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ.

> –হে আল্লাহ্! আপনি তার বন্ধু হোন যে আলীর বন্ধু হয় এবং তার শত্রু হোন, যে আলীর শত্রু হয়।[৩]

[১]. আল কুরআন : সূরা তাওবা, ৯:১০০।
[২]. আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাকু আমর ইবনে শা'আশ, ৩২:১৫৭, হাদিস নং : ১৫৩৯৪।
[৩]. ক) তাবারানি : মু'জামউল আওসাত, ২:৫৭৬, হাদিস নং ১৯৮৭।

যে ব্যক্তি আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর প্রতি জুলুম করে, সে প্রকৃতপক্ষে আমারই প্রতি অত্যাচার করে।" এবং "যে ব্যক্তি তোমাকে (আলী-কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু) নারাজ করে, সে প্রকৃতপক্ষে আমাকেই নারাজ করে।

মওলানা আবদুল আযীয দেহেলভী প্রণীত *'তোহফা-এ-এসনা আশারিয়্যা'* পুস্তকে এই বক্তব্যের খণ্ডনে লেখা হয়েছে:

> সিফফীন ও উটের যুদ্ধের ঘটনাগুলো কখনোই হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর প্রতি শত্রুতার জের ধরে সংঘটিত হয়নি। তাঁরা তাঁকে আঘাত করার কথা চিন্তাও করেননি। এসব যুদ্ধের আসল কারণ সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ আছে কালামশাস্ত্রের এবং ইসলামী ইতিহাসের বইপত্রে।[১]

শিয়া পণ্ডিত নাসিরুদ্দীন তুসী নিজের 'তাজরিদ' পুস্তকে বলেন, "আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-কে অমান্য করা পাপ; তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কুফর (অবিশ্বাস)।" অতঃপর তিনি আরো যোগ করেন, "যে ব্যক্তি তাঁর ইমামত (ধর্মীয় নেতৃত্ব) অস্বীকার করে, সে কাফের হবে না।" কেননা, হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর নাতিবৃন্দ একে অপরকে অস্বীকার করেছিলেন। তাঁরই এক পুত্র মুহাম্মদ বিন হানাফিয়্যা (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) ইমাম হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)'র পুত্র ইমাম যাইনুল আবেদীন (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)'র ইমামতকে অস্বীকার করেন। মুখতার কর্তৃক তাঁর কাছে প্রেরিত গনীমতের মালামাল হতে কিছুই তিনি ইমাম সাহেব (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)-কে দেননি। স্বঘোষিত ইমাম যায়দ-এ-শাহেদ ইমাম মুহাম্মদ বাক্বের (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর ইমামতকে প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁর শাহাদাতের পরে তাঁরই পুত্র ইয়াহইয়া ও মুতাওয়াক্কিল ইমাম জাফর সাদেক (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর সন্তানদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখেননি। এই ইয়াহইয়া, যিনি হযরত সাইয়্যেদাতুন্ নাফেসা (রাহমাতুল্লাহি আলাইহা)-এর চাচা ছিলেন, তিনি ১২৫ হিজরী সালে (খলীফা) ওয়ালীদের সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে এক যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। অধিকন্তু, ইমাম জাফর সাদেক (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর সন্তানেরা ইমামত নিয়ে একে অপরের সাথে সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন। আবদুল্লাহ

খ) হায়সামী : মাজমাউজ জাওয়াইদ, ১:১০৬।
গ) ইবন আসাকির : তারিখ দিমাসক আল-কবীর, ৪৫:১৫৭-১৫৮।
ঘ) হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১৩:১৫৭ হাদিস নং : ৩৬৪৮৫।

১. আমরা তা ১৬তম অধ্যায়ে সংক্ষিপ্ত আকারে ব্যাখ্যা করেছি– লেখক হুসাইন হিলমী।

আফতাহ ও ইসহাক্ব বিন জা'ফরের মধ্যে সংঘটিত ঘটনাগুলো ছিল দুঃখজনক। হযরত হাসান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর পুত্রদের মধ্যে ইমামত নিয়ে সংগ্রাম সম্পর্কে যদি আমরা লিখতে যাই, তাহলে আলাদা আরেকটি বই প্রকাশিত হবে। মুহাম্মদ মাহদী বিন আব্দিল্লাহ বিন হাসান মুসান্না যিনি *'নাফস-এ-যাকিয়্যা'* নামে সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন, তিনি ১৪৫ হিজরী সালে অন্যান্য ইমামকে অস্বীকার করে মদীনায় নিজের ইমামত ঘোষণা করেন। (খলীফা) মনসূরের বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে তিনিও শাহাদাত বরণ করেন। নবুওয়্যত অস্বীকারের মতো যদি ইমামত অস্বীকারও কুফরী হতো, তাহলে এসকল ইমামকে অবশ্যম্ভাবীরূপে কাফের বলেই ডাকতে হতো। কই, তারা (ওপরোল্লিখিত কুৎসা রটনাকারী চক্র) তো এ কথা বলতে পারেনি, "হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর পৌত্রবৃন্দ একে অপরের ইমামত অস্বীকার করলে কাফের হবেন না, কিন্তু অন্যরা তাঁদের ইমামত অস্বীকার করলে কাফের হয়ে যাবে।" তবে অস্বীকৃতি যুদ্ধের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। আরেক কথায়, (এসব) যুদ্ধ অস্বীকৃতির ফলশ্রুতিতেই সংঘটিত হয়। কেননা, বৈধ ইমাম যখনই তাঁর কর্তৃত্ব প্রয়োগ করতে চেয়েছেন, তৎক্ষণাৎ অপরাপর পক্ষগুলো তা পছন্দ করেনি বা মেনে নেয়নি। এমতাবস্থায় যুদ্ধ বেধে যায়। (আমাদের) এ যুক্তির উত্তর দিতে না পেরে কুৎসা রটনাকারীরা বলতে বাধ্য হয়েছে, "ইমাম হিসেবে অস্বীকৃত কারো সাথে যুদ্ধ করা কুফরী নয়, কিন্তু হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর সাথে যারা যুদ্ধ করেছিল তাদের ক্ষেত্রে একই রকম (ফায়সালা) হবে না।" তারা এ কথার পক্ষে নিচে উদ্ধৃত হাদিস শরীফটি পেশ করে থাকে– "তোমার সাথে লড়াই হচ্ছে আমারই সাথে লড়াই।"
অথচ হাদিস শরীফটির মানে হচ্ছে "তোমার সাথে যুদ্ধ করা আমার সাথে যুদ্ধ করার মতোই।"
স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর সাথে যুদ্ধ করার মানে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে যুদ্ধ করা নয়। এই হাদিস শরীফ ইঙ্গিত করে যে হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর সাথে লড়াই করা একটি মন্দ ও অপরাধমূলক কাজ। কিন্তু এর মানে এই নয় যে সেটি কুফর (অবিশ্বাস)। দুটি বস্তুর পারস্পরিক তুলনা অবশ্যম্ভাবীরূপে সেগুলোর সবদিক দিয়ে সাযুজ্যপূর্ণ হওয়াকে বোঝায় না। বস্তুতঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই হাদিসটি অন্যান্য সাহাবা-এ-কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-কেও বলেছিলেন; এমন কি বনূ

আসলাম ও বনূ গিফার গোত্রগুলো সম্পর্কেও উচ্চারণ করেছিলেন। অথচ সর্বসম্মত বর্ণনানুযায়ী, তাঁদের সাথে যুদ্ধ কুফর বলে সাব্যস্ত হয়নি।

অনুরূপভাবে, এই হাদিস শরীফের অর্থ হচ্ছে–

> "কোনো ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়া স্রেফ শত্রুতাবশতঃ তোমার (হযরত আলীর) সাথে যুদ্ধ করার মানে আমারই সাথে লড়াই করা।"

খলীফা উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর হত্যাকারীদের মাঝে হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু) থাকাকালীন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মানে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে যুদ্ধ নয়। ধরুন, কেউ একজন আরেকজনকে বললো, "তোমার শত্রু আমারও শত্রু।" এদিকে, দ্বিতীয় ব্যক্তিটি যে দলের সাথে কোনো একটি বিষয় নিয়ে জড়িত, সে দলের সাথে তৃতীয় কোনো ব্যক্তির বিরোধ চলছে। এমতাবস্থায় তৃতীয় ব্যক্তিটি অবশ্যম্ভাবীরূপে প্রথম ব্যক্তির শত্রু নয়। জামাল (উট) ও সিফফীনের ঘটনাগুলোতে হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)'র বিরোধিতাকারী কোনো সাহাবী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-এরই তাঁর সাথে যুদ্ধে জড়াবার উদ্দেশ্য ছিল না। তাঁরা শুধু খলীফা উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর হত্যাকারীদের ব্যাপারেই প্রতিবিধান দাবি করেছিলেন। হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর চারপাশে ওই হত্যাকারীরা অবস্থান করছিল বলেই যুদ্ধ করতে হয়েছিল।

"তোমার সাথে বৈরিতা আমার সাথে বৈরিতার মতোই"– এই হাদিস শরীফটির অর্থ হলো, "তোমার প্রতি বৈরিতা প্রকৃতপ্রস্তাবে আমারই প্রতি বৈরিতা।" এটি স্পষ্ট যে সিফফীন ও জামালের যুদ্ধে যাঁরা অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের কেউই হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর প্রতি বৈরী মনোভাব পোষণ করেননি। তাঁরা তাঁর প্রতি শত্রুতার বশবর্তী হয়ে যুদ্ধ করেননি। তাঁরা যা চেয়েছিলেন তা ছিল কেবল-ই মুসলমানদের মাঝে জাগ্রত ফিতনার অবসান এবং ধর্মীয় প্রতিবিধান (কেসাস) নিশ্চিতকরণে দায়িত্ব পালন। কিন্তু এর পরিণতি হয় যুদ্ধে। স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কর্ম কারো নিয়্যত তথা উদ্দেশ্য ও স্বাধীন ইচ্ছা দ্বারাই সংঘটিত হয়। কোনো কর্মের ভালো অথবা মন্দ হওয়ার বিষয়টি, উদ্দেশ্যটি ভালো না মন্দ তার ওপরেই নির্ভর করে। উদাহরণস্বরূপ, কোনো ব্যক্তি যদি বলে, "এই পাত্র যে ব্যক্তি ভাঙ্গবে আমি তাকে প্রহার করবো।" এমতাবস্থায় অপর কোনো ব্যক্তি যদি ওই পাত্রের পাশ দিয়ে হেঁটে যাবার সময় পা পিছলে পড়ে যায় এবং পাত্রটি এতে ভেঙ্গে যায়, তাহলে প্রথমোক্ত ব্যক্তির

পক্ষে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে মারধর করা যথোচিত হবে না। হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুর বিরুদ্ধে যাঁরা যুদ্ধ করেছিলেন, তাঁদের বিষয়টি এই দৃষ্টান্তেরই অনুরূপ।

তর্কের খাতিরে যদি আমরা ধরেও নেই যে হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর সাথে দ্বন্দ্বে জড়ানো খোদ মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে দ্বন্দ্বে জড়ানোরই শামিল, তাহলে সবসময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে দ্বন্দ্ব করা কুফর (অবিশ্বাস) হবে না। হ্যাঁ, তা কুফর হবে যদি ওই দ্বন্দ্ব তাঁরই নুবুওয়্যতকে অস্বীকার করার উদ্দেশ্যে করা হয়। কিন্তু ধনসম্পদ/ সম্পত্তি লাভের মতো দুনিয়াবী (পার্থিব) স্বার্থে তা করলে সেটি কুফর হবে না। কেননা, আল-কুরআন রাহাজানি-ডাকাতদের উদ্দেশ্য করে একটি আয়াতে করীমায় ব্যক্ত করে,

> –তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত এবং দুনিয়ার বুকে ফিতনা জাগ্রত করতে সংগ্রামরত।

পক্ষান্তরে, এ কথা সর্বসম্মতভাবে বর্ণিত হয়েছে যে রাহাজানি-ডাকাতদল অবশ্যম্ভাবীরূপে কাফের নয়। উক্ত আয়াতে "আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত" কথাটি ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু অন্যদিকে হাদিস শরীফটিতে 'রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে দ্বন্দ্বের কথাই কেবল বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হওয়া যেখানে কুফর নয় (রাহাজানি-ডাকাতদের ক্ষেত্রে), সেখানে শুধু রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হওয়া কীভাবে কুফর হতে পারে? হ্যাঁ, এটি অবশ্যই কুফর হবে যদি মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিয়ে আসা ধর্মকে অস্বীকারের লক্ষ্যে এবং অবমাননার উদ্দেশ্যে তা করা হয়। কিন্তু এই ধরনের উদ্দেশ্য ভিন্ন অন্য যে কোনো দ্বন্দ্ব অবিশ্বাস (কুফর) হবে না। পয়গাম্বর মূসা (আলাইহিস্ সালাম) কর্তৃক রাগে (তাঁর ভাই) পয়গাম্বর হারূন (আলাইহিস্ সালাম)-এর চুল ও দাড়ি ধরা এক ধরনের দ্বন্দ্ব ছিল। এধরনের ঘটনা যুদ্ধাবস্থায় ঘটতেই পারে। এমতাবস্থায় কী উত্তর দেবেন যদি কেউ এগিয়ে এসে এই সংঘাতময় পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে নিচের হাদিসটি পেশ করে:

"আমার সাথে তোমার (হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুর) সম্পর্ক হলো পয়গাম্বর মূসা (আলাইহিস্ সালাম)-এর সাথে পয়গাম্বর হারূন (আলাইহিস্ সালাম)-এর মতোই" [মানে ওই দ্বন্দ্ব অবস্থাকেও এই হাদিসের আলোকে বিবেচনায় নিতে হবে তখন– বঙ্গানুবাদক]। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পবিত্র স্ত্রী হযরত মা আয়েশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) অভিমত পোষণ করেন যে হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু) (খলীফা উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর) হত্যাকারীদের ব্যাপারে উদাসীন এবং তাদের প্রতি কেসাস বা ধর্মীয় প্রতিবিধান নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে শিথিল ছিলেন। এতে তিনি অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। একইভাবে, হযরত মূসা (আলাইহিস্ সালাম) যখন দেখতে পান যে তাঁরই ভাই পয়গাম্বর হযরত হারূন (আলাইহিস্ সালাম) গো-বৎস পূজারী লোকদের ব্যাপারে উদাসীন এবং তাদেরকে শাস্তি দেয়ার ক্ষেত্রে শিথিল, তখন তিনি তাঁর ভাইকে আঘাত করেন। যদি কোনো পয়গাম্বরের সাথে দ্বন্দ্বে জড়ানো কুফর-ই হতো, তাহলে হযরত মূসা (আলাইহিস্ সালাম) তাঁর পয়গাম্বর ভাইয়ের সাথে তা করে তৎক্ষণাৎ কাফের হয়ে যেতেন (আল্লাহ আমাদেরকে এরকম কথা উচ্চারণ করা হতে রক্ষা করুন, আমীন)! একই ধরনের ঘটনা ছিল পয়গাম্বর হযরত ইউসূফ (আলাইহিস্ সালাম)-এর ভাইদের দ্বারা তাঁর প্রতি সর্বজনজ্ঞাত সেই অন্যায়টি করার মাধ্যমে তাঁদেরই বাবা পয়গাম্বর হযরত ইয়াকুব (আলাইহিস্ সালাম)-কে আঘাত দেয়ার বিষয়টি। এটি সংঘাতে লিপ্ত হওয়ার চেয়ে কোনো অংশে কম অন্যায়পূর্ণ আচরণ ছিল না। অতএব, ওই মহান বুযূর্গদের বিষয়ে কথা বলার সময় আমাদের সবাইকেই সুবিবেচনাশীল হতে হবে।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর স্ত্রী এবং মুসলমানদের মা। আল-কুরআনে বিবৃত হয়েছে যে তিনি হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর মায়ের তুল্য মর্যাদাবতী। কোনো মা তাঁর সন্তানকে বকাঝকা করলে বা আঘাত করলে তাঁর এ আচরণ যদি অন্যায্যও হয়, তবু সন্তানের জন্যে তার প্রতিবাদ করা কি ন্যায়সঙ্গত হবে? বস্তুত কেউই পয়গাম্বর মূসা (আলাইহিস্ সালাম) বা পয়গাম্বর ইউসূফ (আলাইহিস্ সালাম)-এর ভাইদের সমালোচনা (আজ পর্যন্ত) করেননি। অধিকন্তু, ভাইদের মধ্যকার সম্পর্ক মায়ের সাথে তাঁর পুত্রের সম্পর্কের সমতুল্য নয়। একটি প্রবাদ আছে:

'যে ব্যক্তি মূল্যবোধ রক্ষায় ব্যর্থ, সে গোমরাহ-পথভ্রষ্ট!'

অতএব, এটি পরিদৃষ্ট হয়েছে যে "তোমার সাথে যুদ্ধ করা আমার সাথে যুদ্ধ করার মতোই"– এই হাদিস শরীফটি আসহাব-এ-কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-কে কাফের/অবিশ্বাসী বলার সমর্থনে দলিল হিসেবে পেশ করা যায় না। এটি ইসলামী পন্থা নয়, যুক্তির সাথেও সঙ্গতিপূর্ণ নয়। যাঁরা হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর সাথে সমরে যুজেছিলেন, তাঁরা তা করার দরুন ঈমানহারা হননি বা তাঁদের নেক আমলও বরবাদ হয়নি। তাঁদের ঈমানদারী, আমলদারী, সাহাবী হওয়ার মর্যাদা, কুরআনের আয়াতসমূহে এবং হাদিস শরীফে বর্ণিত উচ্চসিত প্রশংসা, এসব উপাদানই তাঁদের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন হওয়া থেকে এবং তাঁদের অভিসম্পাত দেয়া হতে আমাদেরকে বাদ সাধছে। শিয়া পণ্ডিত কাযী নূরুল্লাহ শুশতারী যিনি এই সূক্ষ্ম বিষয়গুলো অনুধাবন করতে পেরেছিলেন, তিনি তাঁর *'মাজালিস-উল-মু'মেনীন'* পুস্তকে বলেন, "শিয়াপন্থীরা তিন খলীফা (সর্ব-হযরত আবূ বকর, উমর ও উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-কে লা'নত তথা অভিসম্পাত দেন না। অজ্ঞ শিয়াদের দ্বারা দেয়া অভিসম্পাতের কোনো গুরুত্বই নেই।"

আমরা এখানে আরো যোগ করবো যে, আবদুল্লাহ মাশহাদী ও অন্যান্য কতিপয় শিয়া পণ্ডিত এই বিষয়ে সুন্নী ও শিয়া মতাদর্শভিত্তিক বইপত্রের গভীর গবেষণার মাধ্যমে ও যুক্তিসঙ্গত বিচার-বিবেচনার সাহায্যে এই সিদ্ধান্ত নেন: "হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর বিরুদ্ধে যাঁরা যুদ্ধ করেছিলেন, তাঁরা কাফের (অবিশ্বাসী) হয়ে যাননি। তাঁরা কেবল গুনাহগার হন। কেননা, তাঁরা হাদিস শরীফটি অস্বীকার করেননি, বরং (ভিন্নতর) ব্যাখ্যা দেন।" যেহেতু শিয়া সম্প্রদায় নাসিরুদ্দীন তুসীকে একজন বড় বিদ্বান বলে মানেন, সেহেতু তাদেরকে এই আলেমের এবং এরই মতো শিয়া পণ্ডিতদের মন্তব্য ব্যাখ্যা করতে হয়। তারা বলেন, "এই হাদিস শরীফে বর্ণিত 'তোমার সাথে যুদ্ধ করা আমার সাথে যুদ্ধ করার মতোই'- ভাষ্যটি অনুযায়ী হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর বিরুদ্ধে লড়াই করা কুফর। তবে যাঁরা তাঁর বিরুদ্ধে লড়েছিলেন, তাঁরা তা পরিকল্পনা করেননি বলে কাফের হননি। পক্ষান্তরে, যুগের ইমামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা কুফর নয়, বরং পাপ। যদি তা কোনো সন্দেহ বা ভুল ব্যাখ্যার ফলশ্রুতিতে ঘটে থাকে, তবে তা পাপও নয়, বরং ইজতেহাদী (গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্তে) ভুল।"

এ যাবত আমরা শিয়া পণ্ডিতদেরকেই শুধু উদ্ধৃত করেছি। এক্ষণে আমরা আহলুস্ সুন্নাহ'র উলামাদের উদ্ধৃতি দেবো:

ফিক্হশাস্ত্রবিষয়ক শিক্ষাসমূহে হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর ইজতেহাদের সাথে (সাহাবীদের) ভিন্নমত পোষণ করা কখনোই কুফরী হতে পারে না। এমন কি তা পাপও নয়। কেননা, হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু) সকল আসহাব-এ-কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর মতোই একজন মুজতাহিদ ছিলেন। যেসব ধর্মীয় শিক্ষায় ইজতেহাদের প্রয়োজন হয়, সেগুলোতে মুজতাহিদবৃন্দের একে অপরের সাথে ভিন্নমত পোষণ করার অনুমতি রয়েছে; আর এক্ষেত্রে প্রত্যেক মুজতাহিদ-ই একটি করে সওয়াব পাবেন। কিন্তু যে ব্যক্তি (অন্তরে লালিত) শত্রুতাবশতঃ যুদ্ধে জড়াবে, সে অবশ্যঅবশ্য কাফের হয়ে যাবে। বস্তুতঃ কতিপয় সুন্নী আলেম এই নীতিমালার আলোকে খারেজীদেরকে "কাফের" আখ্যায়িত করেন। "তোমার সাথে যুদ্ধ করা আমার সাথে যুদ্ধ করার মতোই"– এই হাদিস শরীফটি খারেজীদের উদ্দেশ্যেই ইরশাদ হয়েছিল। সত্য কথা হলো, এসব লোককে 'নিশ্চিতভাবে বেঈমান' বলা যায় না। কেননা, তারা যে লড়াই করেছিল, তাতে কুফরীর স্বীকারোক্তিকে উদ্দেশ্য করা হয়নি। এই কারণেই তাদেরকে মুরতাদ বা ধর্মদ্রোহী বলা যায় না। তথাপিও তাদের সন্দেহ ছিল আহাম্মকিপূর্ণ, আর যেহেতু তারা সুস্পষ্ট অর্থবোধক আয়াতে করীমা ও হাদিস শরীফের সাথে দ্বিমত পোষণ করেছিল, সেহেতু তাদের মাফ নেই। কেননা, প্রকাশ্য অর্থসম্বলিত আয়াতের ভিন্নতর ব্যাখ্যা দেয়ার কোনো অনুমতি-ই নেই। আহলে সুন্নাতের মতানুযায়ী, খারেজী সম্প্রদায় কাফেরদের সাথেই চিরকাল দোযখবাসী হবে। তাদের জন্যে ক্ষমা চেয়ে দোয়া করার অনুমতি নেই, নামাযে জানাযা পড়ারও কোনো অনুমতি নেই। জঙ্গে জামাল ও জঙ্গে সিফফীনে অংশগ্রহণকারী সাহাবী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-দের বেলায় কিন্তু একই অবস্থা বিরাজ করবে না। তাঁরা হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর সাথে লড়াই করেছিলেন শরয়ী ব্যাখ্যাগত মতপার্থক্যের ফলশ্রুতিতেই। তাঁদের এই ভুল যেহেতু ইজতেহাদ-সংক্রান্ত, সেহেতু তাঁরা কাফের হবেন না। তাঁদেরকে এর সূত্র ধরে দোষারোপও করা যাবে না। কেননা, বিভিন্ন আয়াতে করীমা ও হাদিস শরীফে তাঁদের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে। এই মহান সিদ্ধপুরুষবৃন্দ তাঁদের নিজেদের নফসের চাহিদা মেটানোর জন্যে এ সংগ্রাম করেননি, বরং আল্লাহ তা'আলার রেযামন্দি হাসিলের খাতিরেই তা করেছিলেন। যে ব্যক্তি এ বাস্তবতাকে স্বীকার করে না,

তার উচিত অন্তত নিজ জিহ্বাকে সংযত রাখা এবং চুপ থাকা। তাঁদের সাহাবা-এ-কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) ও মুজাহিদীনে ইসলাম হওয়ার কথা বিবেচনা করে তাঁদের প্রতি অবমাননামূলক আচরণ বর্জন করাই তার জন্যে করণীয় হবে। বস্তুতঃ বিভিন্ন আয়াতে করীমা ও হাদিস শরীফ সকল ঈমানদারকেই প্রশংসা করেছে। শাফায়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার ক্ষমাপ্রাপ্তি ও নাজাত লাভের প্রত্যাশার মধ্যে সমস্ত ঈমানদারই অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। জামাল ও সিফফীনের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কোনো দামেস্কীয় লোক যদি নিশ্চিতভাবে হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর প্রতি বৈরীভাবাপন্ন হয়, তাঁকে কাফের আখ্যা অথবা লা'নত (অভিসম্পাত) দেয়, তাহলে আমরা ওই লোককে কাফের (বেঈমান) বলবো। তবু এ যাবতকালে কেউই এরকম করেছেন বলে বর্ণিত হয়নি। অজ্ঞ লোকদের কথাবার্তা জ্ঞানভিত্তিক বা প্রামাণিক দলিল হতে পারে না। যেহেতু ওই সাহাবা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-বৃন্দ নিশ্চিতভাবে (ইসলামের) সূচনালগ্ন থেকেই ঈমানদার হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিলেন, সেহেতু আমাদেরকে সেভাবেই তাঁদের সম্পর্কে উত্তম ধারণা পোষণ করতে হবে। কোনো লোক যদি অবিশ্বাস করে যে চার খলীফা বেহেস্তী হবেন, কিংবা যদি বলে যে তাঁদের মধ্যে কেউ একজন খলীফা হওয়ার যোগ্য নন, অথবা তাঁর জ্ঞান, ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচার বা তাক্বওয়াকে যদি সে অস্বীকার করে, তাহলে ওই লোক কাফের হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে, যদি কেউ নিজের নফসানী খায়েশ বা ধনসম্পদ ও সম্পত্তি লাভের মতো দুনিয়াবী স্বার্থ চরিতার্থ করার মানসে, অথবা সন্দেহের বশবর্তী হয়ে কিংবা অস্পষ্ট/ দ্ব্যর্থবোধক আয়াত ও হাদিসের ভুল ব্যাখ্যার কারণে এসব মহান ও আশীর্বাদধন্য পুণ্যাত্মার সাথে দ্বন্দ্ব-সংঘাতে জড়িয়ে যায়, তাহলে সে কাফের হবে না; বরঞ্চ সে একজন পাপী হবে।

সর্ব-হযরত আমীরে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) ও আমর বিন আস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-এর সাথে ইমামে আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর দ্বন্দ্ব কখনোই হীন দুনিয়াবী স্বার্থে বা হিংসা-বিদ্বেষ হতে সৃষ্ট হয়নি। হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর বিরোধিতাকারী সাহাবা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-বৃন্দ এই মত পোষণ করতেন যে খলীফা উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর হন্তাদেরকে আটক করে বদলা নিতে হবে। আর তাঁরা স্বীকারও করতেন যে হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু) তাঁদের চেয়ে শ্রেয়তর ও বেশি পুণ্যবান ছিলেন। তাঁরা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ অবধি যা অনুশীলন করেছিলেন, তার সবই সুদৃঢ় ঈমানদারির ইঙ্গিতবহ ছিল। তাঁদের সমস্ত চিন্তাভাবনা ও সাধনাই ছিল আল্লাহর ওয়াস্তে,

ইসলামেরই খাতিরে। মওলানা শাহ ওলীউল্লাহ দেহেলভী প্রণীত *'ইযালাতুল খাফা'* পুস্তকের ৪৯৪ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হাদিসগুলোতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে উভয় পক্ষ একই উদ্দেশ্যে লড়াই করেছিলেন।

[৪২]

আহলে সুন্নাতের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা ও মওদূদীর মতো গোমরাহদের খণ্ডন

ইমাম মুহাম্মদ বিরগিউয়ী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর প্রণীত *'তরীকত-এ-মুহাম্মদীয়া'* শীর্ষক গ্রন্থে এবং এর দুটি ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থ 'বারিক্বা' ও 'হাদিক্বা'য় বিবৃত হয়েছে, সর্ব-ইমাম বুখারী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) ও মুসলিম (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিসে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ ফরমান,

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي مَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَى أُمَّهُ عَلَانِيَةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوا وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي.

–নিশ্চয় এমন এক সময় আসবে যখন আমার উম্মত ইসরাইল সন্তান (ইহুদী ও খৃষ্টান)-দের মতো হবে। তারা দেখতে এক জোড়া জুতোর মতোই হবে, যা একে অপরের অনুরূপ; এর (এই সাযুজ্যের) মাত্রা এমনই হবে যে তাদের (ইহুদী ও খৃষ্টানদের) কেউ যদি মায়ের সাথে যেনা করে, তাহলে আমার উম্মতের মধ্যেও কিছু লোক তা সংঘটন করবে। বনী ইসরাইল বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছে; আমার উম্মত তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে। বাহাত্তরটি (বদ আকীদার কারণে) জাহান্নামে যাবে, শুধু একটি দলই নাজাত পাবে। তাঁকে যখন জিজ্ঞেস করা হয় নাজাতপ্রাপ্ত দলটি কারা, তখন তিনি উত্তর দেন, এরা আমার এবং আমার সাহাবাদের অনুসারী।[১]

[১]. ক) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু মা জা'আ ফী ইফতিরাকি হাযিহিল উম্মাহ, ৯:২৩৫, হাদিস নং : ২৫৬৫।

'মিলাল ওয়ান্ নিহাল' পুস্তকে লেখা আছে যে পয়গাম্বর মূসা (আলাইহিস্ সালাম)-এর পরে বনী ইসরাইল ৭১টি দলে এবং পয়গাম্বর ঈসা (আলাইহিস্ সালাম)-এর পরে ৭২টি দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। (হাদিসটিতে উল্লেখিত) এই অনন্য দলটি, যেটি তাঁদের সঠিক আকীদা-বিশ্বাসের কারণে জাহান্নামী হওয়া থেকে নিরাপদ থাকবেন, তাঁদেরকে আহল্ আস্-সুন্নাত ওয়াল-জামা'আত-এর মাযহাব (পথ) বলা হয়। বাহাত্তরটি ভ্রান্ত দলের প্রত্যেকটিই নিজেদেরকে আহলে সুন্নাহ বলে দাবি করবে এবং ধারণা করবে যে তারা বেহেশতী হবে। কিন্তু এটি এমন কোনো বিষয় নয় যা কেবল কথা বা ধারণা দ্বারা বিচার-বিশ্লেষণ করা যায়; বরং তা এমন কথা ও কর্ম দ্বারা বিচার করা যায় যেগুলো কুরআনের আয়াত ও হাদিস শরীফের দ্বারা সমর্থিত বা তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

আহলে সুন্নাত (সুন্নী মুসলমান সমাজ) মা'তুরিদী ও আশআরী নামের দুটি উপদলে বিভক্ত হন। কিন্তু যেহেতু এঁদের মূল একই এবং এঁরা একে অপরের সমালোচনা করেন না, সেহেতু বলা যায় যে তাঁরা একই দলভুক্ত। অপরদিকে, আহলে সুন্নাতের অনুসারীরা ইবাদত ও আমলের বিষয়ে চারটি মাযহাবে বিভক্ত হয়েছেন। চার মাযহাবের আকীদা-বিশ্বাস একই; বস্তুত তাঁরা একটি মাযহাব (পথ)-এরই অন্তর্গত। যেসব বিষয় সম্পর্কে আয়াতে করীমায় ও হাদিস শরীফে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা বিদ্যমান নেই, সেগুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেই চার মাযহাব একে অপরের সাথে ভিন্নমত পোষণ করেছে। তাঁরা সবাই এসব বিষয় বোঝার উদ্দেশ্যে ইজতেহাদ (গবেষণালব্ধ রায়) প্রয়োগ করেছেন এবং সর্বাত্মক প্রচেষ্টার মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। কুরআন ও হাদিসে সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যাকৃত বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে তাঁরা ভিন্নমত পোষণ করেননি। বস্তুতঃ সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন অর্থসম্বলিত কুরআনের আয়াত বা হাদিস শরীফের বেলায় ইজতেহাদ প্রয়োগ করা হয় না। ঈমান তথা বিশ্বাসের নীতিমালাসংক্রান্ত স্পষ্টভাবে ঘোষিত নয় এমন আয়াত বা হাদিসের ক্ষেত্রে কেউ ইজতেহাদ প্রয়োগ করলে তাকে ক্ষমা করা হবে না। (এভাবে) ভ্রান্ত ইজতেহাদের ফলশ্রুতিতে সঠিক পথ হতে বিচ্যুত বাহাত্তরটি দলকে বেদআতী বা গোমরাহ (দালালাত-সম্পন্ন সম্প্রদায়) বলা হয়। তবে এসব লোককে কাফের বা অবিশ্বাসী বলে ডাকা যাবে না। যদি কেউ ইসলামে সুস্পষ্টভাবে ঘোষিত

খ) তাবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবুল ই'তিসাম বিল কিতাব ওয়াস্ সুন্নাহ, পৃ. ৩৭, হাদিস নং : ১৭১।
গ) হাকেম : মুসতাদ্‌রাক আলাস্ সহীহাইন, বাবু আম্মা হাদিসি আবদিল্লাহ ইবনে ওমর, ১:৪৩০, হাদিস নং : ৪০৮।

আকীদা-বিশ্বাসসংক্রান্ত নীতিমালার যে কোনো একটিকে অস্বীকার করে, তবেই সে বেঈমান হয়ে যাবে এবং কাফেরে পরিণত হবে। ভ্রান্ত ইজতেহাদ প্রয়োগের দরুন যেসব লোক বেঈমান হয়, তাদেরকে মুলহিদ বলা হয়। *'রাদ্দুল মোখতার'* ও *'নে'মাতুল ইসলাম'* পুস্তকগুলোতে লিপিবদ্ধ আছে যে বাহাত্তরটি ভ্রান্ত দলের মাঝে বাতেনী, মুজাসসিমা, মুশাব্বিহা, ওহাবী ও এবাহী নামের দলগুলো হচ্ছে মুলহিদ।

অতএব, ওপরে উদ্ধৃত হাদিস শরীফে এটি প্রতীয়মান যে কোনো ব্যক্তি হয় মুসলমান, না হয় কাফের। আর কোনো মুসলমান হয় সুন্নী জামা'আতভুক্ত, না হয় বেদআতী; অর্থাৎ, গোমরাহ-পথভ্রষ্ট। এর মানে এই দাঁড়ায় যে, কেউ যদি আহলে সুন্নাতের মাযহাবভুক্ত না হয়, অর্থাৎ, (চার মাযহাবের মধ্যে) কোনো নির্দিষ্ট মাযহাবের অন্তর্ভুক্ত না হয়, তাহলে সে হয় গোমরাহ, না হয় কাফের।

ঈমানের অর্থ নিঃশঙ্ক হওয়া এবং ইসলামের মানে আত্মসমর্পণ ও পরিত্রাণ লাভ। তবু ইসলাম ধর্মে ঈমান ও ইসলামের অর্থ একই। আল্লাহ তা'আলার কাছ থেকে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রাপ্ত ওহীর মাধ্যমে প্রকাশিত যাবতীয় বিষয় ও তথ্য সম্পর্কে অন্তরে বিশ্বাস পোষণ করাই হচ্ছে 'ঈমান' ও 'ইসলাম'। এসব তথ্য (ঈমানের) ছয়টি মূলনীতিতে সংক্ষিপ্ত আকারে বিবৃত হয়েছে। যে ব্যক্তি এই ছয়টি মূলনীতিতে বিশ্বাস করেন, তিনি সমস্ত বিষয়ে ঈমান এনেছেন বলে সাব্যস্ত হন। এই ছয়টি মৌলনীতি ব্যক্ত হয়েছে 'আমানতু' শীর্ষক মতবিশ্বাসে। প্রত্যেক মুসলমানকেই 'আমানতু' মুখস্থ করতে হবে এবং তাঁর সন্তানদেরকেও মুখস্থ করিয়ে এর উদ্দেশ্যকৃত অর্থ শিক্ষা দিতে হবে। এই লক্ষ্যে তাঁর সন্তানদেরকে কুরআন মজীদের (সুন্নী জামা'আত) অনুমোদিত শিক্ষা-কোর্সে ভর্তি করা আবশ্যক। 'আমানতু'র মানে কী, তা বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে তুর্কী ভাষায় রচিত *'হেরকিজ লাযিম ওলান ইমান'* (Herkese Lazim Olan Iman) পুস্তকে। যে ব্যক্তি এই (ছয়টি) মূলনীতিতে বিশ্বাস করেন, তাঁকে 'মু'মিন' (বিশ্বাসী) কিংবা 'মুসলিম' বলা হয়। সকল আদিষ্ট ইবাদত-বন্দেগী পালন এবং হারাম (তথা ইসলামে নিষিদ্ধ সব ধরনের কাজ, আচরণ, চিন্তা ও কথা) বর্জনকে বলা হয় ইসলামের প্রতি আনুগত্য। যে মুসলমানবৃন্দ ইসলাম ধর্মকে (পূর্ণভাবে) মানেন, তাঁদেরকে বলা হয় 'সালিহ' (পুণ্যবান) ও 'আদিল' (ন্যায়পরায়ণ)। সকল সাহাবা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-ই সালিহ ও আদিল মুসলমান ছিলেন। আলস্যবশতঃ যে ব্যক্তি

ইসলাম অমান্য করে, তাকে বলা হয় 'ফাসিক্ব' (পাপী/গুনাহগার)। তবে ফাসিক্ব ব্যক্তিও মুসলমান। আরেক কথায়, কোনো মুসলমান পাপ সংঘটন করে বা আমল পালন না করেও ঈমান হারাবেন না। কিন্তু যদি কেউ ইবাদত ও পাপ সংক্রান্ত বিশ্বাসকে অবজ্ঞা করে, অর্থাৎ, যদি সে ইসলামকে যথাযথ পন্থায় সম্মান প্রদর্শন না করে, তাহলে সে তার ঈমান হারাবে। আর যে ব্যক্তি বেঈমান, সে মুসলমান নয়, বরং 'কাফের' (অবিশ্বাসী)। অধিকন্তু, যে ব্যক্তি আহলুস্ সুন্নাহ'র কোনো মাযহাবের অন্তর্ভুক্ত নয়, তাকে 'লা-মাযহাবী' (মাযহাব-বিহীন) বলা হয়। কোনো নির্দিষ্ট মাযহাবের অন্তর্গত নয় এমন ব্যক্তি হয় গোমরাহ (পথভ্রষ্ট), না হয় অবিশ্বাসী।

কাজীজাদা আহমদ আফেন্দী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) *'অসীয়তনামা-এ-ইমাম-এ-বিরগিউয়ী'* শীর্ষক ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থের ৪৪ পৃষ্ঠার প্রারম্ভে নিম্নের বর্ণনাটি লিপিবদ্ধ করেন, যা'তে ব্যক্ত হয়: আমরা এই সত্যে বিশ্বাস করি যে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার বুকে বশরী তথা মানব সুরতে পয়গাম্বরবৃন্দকে প্রেরণ করেছেন। সকল আম্বিয়া (আলাইহিমুস্ সালাম)-ই তাঁদের নিজ নিজ জমানার মানুষদেরকে 'আহকাম' তথা আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক ওহী বহনকারী ফেরেস্তার মাধ্যমে তাঁরই পয়গাম্বরবৃন্দের কাছে প্রকাশিত ঐশী আদেশ-নিষেধ/বিধি-বিধান শিক্ষা দিয়েছেন। কোনো পয়গাম্বরের যুগে বসবাসকারী মানুষ-জন, যাঁদেরকে তিনি শিক্ষা দিয়েছেন, তাঁদেরকে তাঁর 'উম্মত' বলা হয়। যেসব মানুষ কোনো নবী (আলাইহিমুস্ সালাম)-কে বিশ্বাস করেন, তাঁরা 'উম্মতে ইজাবাত' হিসেবে পরিচিত; আর যারা তাঁকে বিশ্বাস করে না, তারা 'উম্মতে দা'ওয়াত' নামে পরিচিত। সর্বশেষ নবী হলেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাঁর পরে আর কোনো নবী-রাসূল আগমন করবেন না। তিনি সর্বকালের, সর্বস্থানের সমস্ত মানুষ, জাতি-গোষ্ঠী এবং জ্বিন সম্প্রদায়ের জন্যেও প্রেরিত রাসূল। সবাইকেই তাঁর প্রতি ঈমান আনতে হবে।

কোনো নতুন ধর্মীয় ব্যবস্থা যে পয়গম্বর নিয়ে আসেন, তাঁকে বলা হয় রাসূল। পক্ষান্তরে, যে পয়গাম্বর তাঁর পূর্ববর্তী পয়গাম্বরের নিয়ে আসা ধর্মীয় ব্যবস্থার বিধান মানতে মানুষদেরকে আহ্বান জানান, তাঁকে বলা হয় নবী। প্রত্যেক রাসূল একই সাথে নবীও; প্রত্যেক নবী কিন্তু রাসূল নন। কতিপয় উলামার মতে, রাসূল (আলাইহিমুস্ সালাম)-বৃন্দের সংখ্যা ৩১৩জন। তবে সামগ্রিকভাবে আম্বিয়াবৃন্দের সংখ্যা অজ্ঞাত। খবরে ওয়াহিদ হিসেবে আখ্যায়িত

একটি হাদিস শরীফে বিবৃত হয়েছে যে তাঁদের সংখ্যা ১২৪০০০ (এক লাখ চব্বিশ) হাজার। যে হাদিস শুধু একজন (হাদিসবেত্তা) বর্ণনা করেছেন, তা অনুমাননির্ভর হতে পারে *[এতে মতান্তর বিদ্যমান– বঙ্গানুবাদক]*। তাই পয়গাম্বর (আলাইহিমুস্ সালাম)-বৃন্দের সংখ্যা সম্পর্কে মন্তব্য না করাই অধিক যুক্তিযুক্ত হবে। ইমাম মা'সূম ফারূকী সেরহিন্দী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) কৃত *'মকতুবাত'* গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ৩৬তম পত্রের শেষে এবং এছাড়াও প্রশংসাস্তুতিমূলক পুস্তক *'কাসীদা-এ-আমালী'* এবং *'বারিক্বা'*, *'আকায়েদে নাসাফিয়্যা'* ও *'হাদীক্বা'* গ্রন্থগুলোতে বিবৃত হয়েছে যে পয়গাম্বর (আলাইহিমুস্ সলাম)-এর সংখ্যা (নিশ্চিতভাবে) বলার অর্থ হতে পারে নবী নন এমন কাউকে নবী বানানো কিংবা আম্বিয়া (আলাইহিমুস্ সালাম)-বৃন্দের মধ্যে কারো নবুওয়্যতকে অস্বীকার করা, যার পরিণতি নির্ঘাত কুফরী (অবিশ্বাস)। কেননা, সকল ইসলামী বইপত্রে লিপিবদ্ধ আছে যে কোনো একজন নবী (আলাইহিমুস্ সালাম)-কে অস্বীকার করার মানে হচ্ছে সকল পয়গাম্বর (আলাইহিমুস্ সালাম)-কেই অস্বীকার করা। অধিকন্তু, *'কাসীদা-এ-আমালী'* শীর্ষক প্রশংসাস্তুতিমূলক পুস্তকের ব্যাখ্যাকারী গ্রন্থে এবং *'বারিক্বা'* গ্রন্থের ৩১৯ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ আছে, "কোনো ওলী-ই নবুওয়্যত অর্জনে সক্ষম নন। কোনো পয়গাম্বর (আলাইহিমুস্ সালাম)-কে হেয় প্রতিপন্ন (বা বিষোদগার) করা কুফরী ও গোমরাহী (পথভ্রষ্টতা)।"

পাকিস্তানের আবূল আলা মওদূদী (মৃত্যুঃ ১৩৯৯ হিজরী/ ১৯৭৯ খৃষ্টাব্দ) নিজ *'ইসলামী সভ্যতা'* শীর্ষক পুস্তকে সূরা ফাতিরের ২৪তম আয়াতের ব্যাখ্যায় লেখেঃ

"ব্যতিক্রম ছাড়া প্রতিটি উম্মাহ'র মাঝেই একজন 'নাযীর' তথা সতর্ককারী পয়গাম্বর (আলাইহিমুস্ সালাম) আগমন করেন।" এরপর মওদূদী আরো যোগ করে, "প্রত্যেকটি উম্মাহ'র জন্যেই একজন পয়গাম্বর (আলাইহিস্ সালাম) এসেছেন। 'এক লাখ চব্বিশ হাজার পয়গাম্বর আগমন করেন' মর্মে হাদিস শরীফটি এই বিষয়টিকে নিশ্চিত করেছে। অতীতের কতিপয় পয়গাম্বর সম্পর্কে আংশিক জানা যায়। তাঁদের দেশ সম্পর্কে জানাও বেশ ভালোভাবে সম্ভব। যেমন সর্ব-হযরত ইবরাহীম (আলাইহিস্ সালাম), মূসা (আলাইহিস্ সালাম), কনফিউসিয়াস, যোরোয়াস্তর (যারাতুস্তরা) ও কৃষ্ণ। তাঁদের প্রত্যেককেই আপন

আপন গোত্রের মাঝে প্রেরণ করা হয়েছিল। তাঁদের কেউই নিজের নবুওয়্যতকে সর্বজনীন বলে দাবি করেননি।"

তাফসীরে বায়দাবী শরীফ ও *মাওয়াকিব* এবং অন্যান্য তাফসীরগ্রন্থে লেখা হয়েছে যে আয়াতোল্লিখিত 'নাযীর' তথা 'সতর্ককারী' শব্দটি পয়গাম্বর ও উলামাদেরকে উদ্দেশ্য করেছে, শুধু আম্বিয়া (আলাইহিমুস্ সালাম)-দেরকে নয়। এই লোকটি (মওদূদী) একটি দুর্বল হাদিসবলে আয়াতটির অপব্যাখ্যা করতে অপচেষ্টারত *[মুফতী আহমদ এয়ার খান সাহেব 'তাফসীরে নূরুল এরফান' গ্রন্থেও এ আয়াতের তাফসীরে 'আম্বিয়া ও সাধারণ নসীহতকারী' উভয়ই লিখেছেন– বঙ্গানুবাদক]*। কোনো ইসলামী আলেমই এই দুর্বল হাদিসকে প্রামাণিক দলিল হিসেবে পেশ করেননি। উপরন্তু, কনফিউসিয়াস, যোরোয়াস্তর ও কৃষ্ণের মতো ভিন্ন ধর্মের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের নাম যোগ করে মওদূদী এদেরকে পয়গাম্বর হিসেবে চিত্রায়নের মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মের মনে রেখাপাত করার ধোকাপূর্ণ কৌশল অবলম্বন করেছে। আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক পয়গাম্বর (আলাইহিমুস্ সালাম)-বৃন্দের কাছে প্রকাশিত সকল সত্য ধর্মীয় ব্যবস্থার (তাওরাত, ইনজিল, জাবুর ইত্যাদির) মধ্যে বিকৃতি সাধনের কারণেই ধর্মে ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা দিয়েছে। অনুরূপভাবে, কনফিউসিয়াস (মৃত্যুঃ ৪৭৯ খৃষ্ট-পূর্বাব্দ) তাঁর উপাসনা ও নৈতিক মূল্যবোধের মতো ধারণাগুলোর কারণে বিখ্যাত হন; তবে তিনি এসব ধারণা প্রাচীন আমলের চীনে বিদ্যমান সনাতনী ধর্মের অবশিষ্ট থেকে যাওয়া বিধিবিধান হতে নিয়েছিলেন। ফলশ্রুতিতে তাঁর দর্শন একটি সম্প্রদায়ের জন্ম দেয়। তাঁর এই মতবাদ প্রচারকারী বইপত্র বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়। এগুলোর একটি হচ্ছে জার্মান ভাষায় লিখিত *'ওর্টে ডেস কনফিউজিস' (Worte des Konfuzius) (Statements of Confucius/কনফিউসিয়াসের ভাষণ)* শীর্ষক পুস্তক। এ বইটি ঈমানের ছয়টি মৌলনীতি, যা সকল আসমানী কিতাবে শেখানো হয়েছে, তা হতেই কেবল শূন্য নয়, বরং এতে এমন অনেক কথা আছে যা স্রেফ কুফরী। যে ব্যক্তির কুফরী স্পষ্ট, তাকে তো মুসলমান বলা যায় না; আর পয়গাম্বর বলা তো কোনোক্রমেই যায় না। ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হিন্দু ব্রাহ্মণদের দেবতার নাম কৃষ্ণ। ইতিপূর্বে তারা একই নামের একটি জলধারার পূজো-অর্চনা করতেন। পরবর্তীকালে তারা এই ব্যক্তিকে পূজো করা আরম্ভ করেন। তাঁর সম্পর্কে অনেক কিংবদন্তি রয়েছে।

'বারিক্বা' শীর্ষক গ্রন্থটিতে লিপিবদ্ধ আছে, "আম্বিয়া (সালাওয়াতুল্লাহি তা'আলা আলাইহিম আজমাঈন)-বৃন্দের সংখ্যা নিশ্চিতভাবে জ্ঞাত নয়। কেননা, তাঁদের সংখ্যা এক লক্ষ চব্বিশ হাজার কিংবা দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার মর্মে হাদিসটির বর্ণনাকারী মাত্র একজন। অধিকন্তু, এটি সহীহ হাদিস (শ্রেণিভুক্ত) কি না, তা-ও জ্ঞাত নয়। যদি পয়গাম্বর (আলাইহিমুস্ সালাম)-বৃন্দের সংখ্যা নির্দিষ্ট করে বলা হয়, তাহলে যেসব মানুষ পয়গাম্বর নন, তাদেরকেও পয়গাম্বর বানানো হতে পারে; অথবা পয়গাম্বর (আলাইহিমুস্ সালাম)-বৃন্দের কয়েকজনকে অস্বীকারও করা হতে পারে। উভয় ক্ষেত্রেই কুফরী (অবিশ্বাস) সংঘটিত হবে। এই হাদিস যদি সহীহও হয়, তথাপিও এটি অনুমাননির্ভর। ঈমানী তথা আকীদা-বিশ্বাস সংক্রান্ত বিষয়গুলোতে অনুমান করার বা ধরে নেয়ার কোনো মূল্যই নেই, বিশেষ করে এ ধরনের ক্ষেত্রগুলোতে যেখানে দুটো বিকল্প বর্ণনা এসেছে।"

অবিশ্বাসীরা প্রধানতঃ দুটো দলে বিভক্ত: (১) কিতাব (ঐশীগ্রন্থ)-সম্পন্ন অবিশ্বাসী; এবং (২) কিতাববিহীন অবিশ্বাসী। যেসব অবিশ্বাসী কোনো নির্দিষ্ট পয়গাম্বর (আলাইহিমুস্ সালাম)-কে এবং তাঁর প্রতি অবতীর্ণ ঐশীগ্রন্থকে বিশ্বাস করেন, তাদেরকে 'আহলে কিতাব' তথা কিতাবসম্পন্ন অবিশ্বাসী বলা হয়। যদিও তাদের আসমানী কিতাব দূষণীয় ও বিকৃত হয়েছে, তবুও তাদের ওই কিতাবে বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী আল্লাহর নামে গলা কেটে জবেহকৃত (ইসলামে বৈধ) পশুর গোস্ত খাওয়া যেতে পারে, তবে এর ব্যতিক্রম হলো শূকরের মাংস যা কোনোক্রমেই খাওয়া যাবে না। কোনো মুসলমান পুরুষ তাদের কন্যাদের বিয়ে করতে পারেন, কিন্তু কোনো মুসলমান নারীর জন্যে তা হারাম (অবৈধ)। আজকের ইহুদী ও খৃষ্টানদের মধ্যে যারা নিজেদের পরিবর্তনকৃত ধর্ম মানেন, তারা সবাই আহলে কিতাব।

যেসব অবিশ্বাসী কোনো নির্দিষ্ট পয়গাম্বর (আলাইহিমুস্ সালাম)-কে বা তাঁর নিয়ে আসা আসমানী কিতাবকে মানেন না, তাদের বলা হয় 'কিতাববিহীন অবিশ্বাসী।' এদের দ্বারা সংহারকৃত পশুর গোস্ত খাওয়া একেবারেই হারাম। এদের কন্যাদের বিয়ে করাও হারাম; মুসলমান নারীদের জন্যেও এদের পুরুষদের বিয়ে করা হারাম। মুশরিক (বহু উপাস্যে বিশ্বাসী), নাস্তিক, মূর্তিপূজারী, অগ্নি-উপাসক, ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী, মুলহিদ (গোমরাহ-পথভ্রষ্ট মুসলমান), যিনদিক্ব (অন্তর্ঘাতী শত্রু/মোনাফিক), ইসলামদ্রোহী মুসলমান গং

কিতাববিহীন অবিশ্বাসী। আল্লাহ ভিন্ন অন্য সত্তার পূজারী মানুষদেরকে বলা হয় 'মুশরিক'। এরা দুই ধরনের: (১) ঐশীগুণে বিশ্বাসী মুশরিক; এবং (২) অর্চনাকারী মুশরিক। ঐশীগুণে বিশ্বাসী মুশরিকদের একটি দল হচ্ছে অগ্নি উপাসকেরা (মজুসিউন)। এরা অগ্নিকে খোদা মনে করে সেটির পূজো করে। তারা বলে, "স্রষ্টা দুইজন; ইয়াযদান (কিংবা আহুরা মাযদা= ওরমাযদ্) হলো সমস্ত ভালোর স্রষ্টা। অপরজনের নাম আহরিমান, সে মন্দের স্রষ্টা।" প্রাচীন প্রকৃতিবাদীরা বলতেন যে প্রকৃতি নিজেই সব কিছুর স্রষ্টা। উপাসনার ক্ষেত্রে মুশরিকবর্গ হচ্ছেন মূর্তি পূজারী, যারা নিজেদেরই বানানো মূর্তির আরাধনা করেন। তারা বিশ্বাস করেন যে এসব মূর্তি তাদের পক্ষ হয়ে আল্লাহর কাছে শাফা'য়াত তথা সুপারিশ করবে। অধিকাংশ খৃষ্টানই ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসী, যে ধর্মীয় দর্শন তিন খোদার ধারণা দেয়। তাদের অনেকেই পয়গাম্বর ঈসা (আলাইহিস্ সালাম)-কে খোদায়ী সত্তা মনে করেন। পক্ষান্তরে, ইহুদীদের একটি অংশ বলেন, "পয়গাম্বর উযায়র (আলাইহিস্ সালাম) হলেন খোদার পুত্র।" এরা সবাই মুশরিক। তবে এরা বিশ্বাস করেন যে এদের কিতাবখানা আসমানী। কমিউনিস্ট, ফ্রী-মেইসন (যিনদিক গোষ্ঠী) ও আধুনিক জমানার অজ্ঞ নাস্তিকেরা সবাই কিতাববিহীন অবিশ্বাসী। যে ব্যক্তি মুসলমান ঘরে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও মুসলমান নয়, সে একজন 'মুরতাদ্দ' (ধর্মত্যাগী)। যে ব্যক্তি মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর রেসালাতে বিশ্বাস করে না কিন্তু দুনিয়াবী স্বার্থে মুসলমানদের মধ্যে অবস্থান করে মুসলমান হওয়ার ভান করে, তাকে মোনাফেক বলা হয়। মোনাফেক অন্য কোনো ধর্মে বিশ্বাসী হতে পারে। তবে সে যখন মুসলমানদের মাঝে অবস্থান করে, তখন তাঁদের মতোই ইবাদত-বন্দেগী পালন করে, আল্লাহর নাম সর্বদা উচ্চারণ করে এবং নিজের ভ্রান্ত ধর্মমত গোপন রাখে। যে ব্যক্তি মুসলমান নয় কিন্তু মুসলমান হওয়ার ভান করে এবং ইসলামের মধ্যে পরিবর্তন সাধন করতে চায়, আর ইসলামের নামে অধার্মিকতার প্রসার ঘটাতে চেষ্টা করে, তাকে বলা হয় 'যিনদিক্ব'। যিনদিক দাবি করে সে আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নবুওয়্যতেও ঈমান রাখে, আর কুরআন-হাদিসও মানে। অথচ সে ওই দুটি ধর্মশাস্ত্রলিপির অপব্যাখ্যা করে থাকে নিজস্ব মূর্খতা ও অদূরদৃষ্টি দ্বারাই। ইসলামের নামে সে নিজের বিকৃত ব্যাখ্যা চালিয়ে দিতে চায়। আহলুস্ সুন্নাতের উলামাবৃন্দের সঠিক বিশ্লেষণমূলক বক্তব্যকে সে অপছন্দ করে, আর তাঁদেরকেই সে মূর্খ বলে ডাকে। আজকালকার লোকেরা এসব যিনদিক্বকেই

'ধর্মের জ্ঞানী-গুণীজন', 'মুজাদ্দেদ' ও 'ধর্ম-সংস্কারক' বলে অভিহিত করে থাকে। এসব যিনদিক্বদেরকে তথা ধর্মের অভ্যন্তরে ভুয়া লোকদেরকে বিশ্বাস করা এবং তাদের বইপত্র ও ম্যাগাজিন পাঠ করা কখনোই আমাদের উচিত হবে না।

যে ব্যক্তি বলেন তিনি মুসলমান এবং যিনি কলেমা-এ-শাহাদাত বাক্যটি উচ্চারণ করেন, তাঁকে শুধু সন্দেহের বশবর্তী হয়ে কাফের তথা অবিশ্বাসী আখ্যা দেয়া যায় না। ইমাম ইবনে আবেদীন (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর *'খুলাসা'* বইয়ের ৩য় খণ্ডে এবং অন্যান্য বইয়েও মুরতাদ বা ধর্মত্যাগীসম্পর্কিত আলোচনায় যেমনটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে, "কোনো ব্যক্তি নিজেকে মুসলমান দাবি করলে যদি তার কথা বা কর্মের কোনো একটিতে কুফরী তথা অবিশ্বাসের অসংখ্য আলামত পাওয়া যায় অথচ ঈমানের স্রেফ একটি উপাদান বিদ্যমান থাকে কিংবা তা অন্তত নিশ্চিত কুফরী বলে প্রতীয়মান না হয়, তবে এই ব্যক্তিকে কাফের অভিহিত করা উচিত হবে না। কেননা, কোনো মুসলমান সম্পর্কে আমাদের সুধারণা রাখা কর্তব্য।" 'বাযযাযিয়্যা' ফতোওয়ার কিতাবটিতে আরো যুক্ত রয়েছে, "এটি স্পষ্টভাবে বোঝা উচিত যে এই ব্যক্তি ইচ্ছেকৃতভাবে কুফরী সৃষ্টিকর কোনো কথা বললে বা কাজ করলে সে কাফের হয়ে যাবে। আমাদের দ্বারা তার কথা বা কাজটিকে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হবে বৃথা।"

'দ্বীন' শব্দটির আভিধানিক অর্থ হচ্ছে পথ, কাজ ও পুরস্কার। অপরদিকে, 'মিল্লাত' শব্দটির মানে 'লেখা বা লিপিবদ্ধ করা।' কোনো পয়গাম্বর (আলাইহিমুস্ সালাম) কর্তৃক আল্লাহ তা'আলা হতে আনা ধর্মবিশ্বাসকে দ্বীন ও মিল্লাত, কিংবা উসূলে দ্বীন বলা হয়। এই অর্থে প্রত্যেক পয়গাম্বর (আলাইহিস্ সালাম) একই দ্বীন ও মিল্লাত নিয়ে এসেছিলেন। দ্বীনের মানে হলো পানির উৎস। কোনো নবী (আলাইহিমুস্ সালাম) কর্তৃক জারিকৃত ঐশী আদেশ-নিষেধকে 'আহকাম-এ-শরীয়্যা' বা 'ফুরূ'ই দ্বীন' বলে। এই অর্থে প্রত্যেক পয়গাম্বরেরই আলাদা আলাদা ধর্ম রয়েছে [আরেক কথায়, প্রত্যেক নবী (আলাইহিমুস্ সালাম)-ই পৃথক পৃথক আজ্ঞা ও নিষেধাজ্ঞার বিধান এনেছেন]। বর্তমানে দ্বীন শব্দটি ঈমান ও ইসলাম সংক্রান্ত নীতিমালার পুরোটুকুই ধারণ করে। হযরতে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধর্মকে দ্বীন ইসলাম অথবা ইসলাম বলা হয়।

প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে ঈমানের মূলনীতি শিক্ষা করা এবং সেই অনুযায়ী বিশ্বাস করা ওয়াজিব (বাধ্যতামূলক)। যে ব্যক্তি সর্বান্তকরণে তা বিশ্বাস করেন, তিনি প্রকৃত ঈমানদারে পরিণত হন। তবুও তিনি পাপী হতে পারেন, যদি তিনি সেগুলোর কারণ শিক্ষা না করেন। পক্ষান্তরে, শরীয়তের আদেশ-নিষেধগুলোর দলিল ও কারণ জানা ইসলামী কোনো আজ্ঞা নয়। সেগুলোর কারণ না জানা পাপ নয়।

যে ব্যক্তি মহাপাপ সংঘটন করেন, তিনি ঈমানহারা হন না। তবে তিনি হারামকে হালাল বললে ঈমানহারা হবেন। গুনাহ বা পাপ দুই ধরনের:

(১) মহাপাপ যাকে বলা হয় 'কাবাইর'। মহাপাপ সাতটি হচ্ছে–
- (ক) আল্লাহর সাথে শরীক করা। এটিকে শিরক বলা হয়, যা সর্বনিকৃষ্ট প্রকারের কুফরী;
- (খ) হত্যা বা আত্মহত্যা;
- (গ) জাদু, বাণ, টোনা ইত্যাদির চর্চা;
- (ঘ) ইয়াতিমের সম্পদ আত্মসাৎ;
- (ঙ) সুদ গ্রহণ বা বিতরণ;
- (চ) জ্বিহাদে শত্রুর মুখোমুখি অবস্থায় যুদ্ধের ময়দান ত্যাগ এবং
- (ছ) কাযফ তথা কোনো সতী নারীর প্রতি অশুচিতার অপবাদ দেয়ার অপরাধ।

যে কোনো পাপই মহা বা গুরুতর আকার ধারণ করতে পারে। তাই সব ধরনের পাপকে এড়িয়ে চলা অত্যাবশ্যক।

(২) 'সগীরা' বা ছোট গুনাহ বারবার সংঘটন করলে তা মহাপাপে পরিণত হতে পারে। পাপী তাওবা তথা ক্ষমা প্রার্থনা করলে মহাপাপ মাফ হবে। তাওবা না করে গুনাহগার ব্যক্তি মারা গেলে আল্লাহ তা'আলা আপন কোনো পয়গাম্বর (আলাইহিমুস্ সালাম) কিংবা প্রিয় বান্দার মাধ্যমে/সুপারিশে তাকে মাফ করতে পারেন, আবার বিনা সুপারিশেও ক্ষমা করতে পারেন। এটি একান্তই তাঁর ইচ্ছের ওপর নির্ভরশীল। তবে পাপীকে ক্ষমা করা না হলে সে জাহান্নামে যাবে।

দ্বীন ইসলামে পবিত্র বলে গৃহীত কোনো বিষয়কে ঘৃণা করা, কিংবা যে বস্তুকে আমাদের ধর্ম অপছন্দ করে তাকে সম্মান প্রদর্শন করা, যেমন 'যুন্নার' নামের পুরোহিতদের কোমরে পরিধেয় রশি বা অনুরূপ বস্তু, অথবা প্রতিমা ও মূর্তিকে

সম্মান প্রদর্শন করা, ধর্মীয় বইপত্রকে ঘৃণা ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা, আলেম-উলামাকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা এবং কুফরী তথা অবিশ্বাস সৃষ্টিকর বাক্য উচ্চারণ করা সবই কুফর (অবিশ্বাস)। এগুলো ইসলাম ধর্মকে অস্বীকার করার আলামত ব্যক্ত করে। তাই এগুলো অবিশ্বাসের লক্ষণ।

আল্লাহ তা'আলা সেসব মুসলমানকে পছন্দ করেন যাঁরা তাওবা করেন। তিনি তাঁদেরকে ক্ষমা করে দেন। তাওবাকারী গুনাহগার ব্যক্তি আবারো পাপ সংঘটন করলে তাঁর তাওবা নাকচ হবে না; তবে তাঁকে আবার তাওবা করতে হবে। যদি কেউ কোনো গুনাহের জন্যে তাওবা করা সত্ত্বেও আনন্দের সাথে ওই পাপকর্মের কথা স্মরণ করেন, তাহলে তাঁকে আবারো তাওবা করতে হবে। মানুষের ঋণ পরিশোধ করা, কারো গীবত বা অসাক্ষাতে নিন্দা করে থাকলে তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা, আর ওয়াক্তিয়া নামায কাযা হয়ে থাকলে তা আদায় করা ফরয। তবে এসব বিষয় খোদ তাওবা নয়, বরং তাওবার শর্তাবলী। একটি টাকাও ওর মালিকের কাছে ফেরত দেয়া এক হাজার বছরের নফল ইবাদত অথবা সত্তরবার নফল হজ্জের চেয়ে উত্তম। পুনরায় পাপ সংঘটনের দরুন তাওবা বাতিল হবে, এই ভয়ে কেউ তাওবা না করা মারাত্মক ভুল। এটি স্রেফ অজ্ঞতা, যা শয়তানী ওয়াসওয়াসা (কুমন্ত্রণা)-ও। কেননা, প্রতিটি পাপের পরে তাওবা করা ফরয। তাওবা এক ঘণ্টা বিলম্বিত হলে পাপের মাত্রা দ্বিগুণ হয়। এর মানে হলো, নামায তরককারী মানুষেরা যেসব নামায কাযা পড়তে দেরি করেন, প্রতিটি অতিরিক্ত ওয়াক্ত অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে কাযা নামাযের পরিমাণও দ্বিগুণ হয়।

কেউ তাওবা করার কথা বললেই তাওবা হয়ে যায় না (কিংবা নিজের পাপের ব্যাপারে অনুশোচনা হলেই তাওবা হয় না)। তিনটি শর্ত পূরণের ওপর তাওবার গ্রহণযোগ্যতার বিষয়টি নির্ভর করে:

১. পাপীকে পাপ সংঘটন বাদ দিতে হবে;
২. আল্লাহর ভয় অন্তরে পোষণ করে গুনাহগারকে কৃত পাপের ব্যাপারে লজ্জাবোধ করতে হবে; এবং
৩. পাপীকে আন্তরিকভাবে অঙ্গীকার করতে হবে যে কৃত পাপ আর সংঘটন করবেন না। আল্লাহ তা'আলা প্রতিশ্রুতি দেন যে যথাযথভাবে ও শর্তগুলো পূরণ করে কৃত তাওবা তিনি কবূল করবেন।

অভ্যেসের পরিবর্তন হতে পারে। সৎ অভ্যেস গড়ে তুলতে সবারই সর্বাত্মক চেষ্টা করা উচিত।

কোনো মুসলমান-ব্যক্তি ঈমানদার হিসেবে পুনরুত্থিত হবেন কি না, তার নিশ্চয়তা নির্ভর করে তাঁরই খাতেমা তথা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের মুহূর্তের ওপর। কোনো ব্যক্তি ৬০ বছর যাবত অবিশ্বাসী হিসেবে জীবনযাপন করে তাঁর ইন্তেকালের কিছুকাল আগে মুসলমান হলে তিনি পরকালে ঈমানদার হিসেবেই পুনরুত্থিত হবেন। একমাত্র আম্বিয়া (আলাইহিমুস্ সালাম) ও আল্লাহ তাআলার ওয়াদাপ্রাপ্ত কতিপয় আশীর্বাদধন্য প্রিয় বান্দা ছাড়া আর কারো ব্যাপারেই এ কথা নিশ্চিত বলা যাবে না যে তাঁরা 'বেহেস্তী'। কেননা, কার খাতেমা কেমন হবে তা আগাম বলা যায় না।

পরবর্তী জগতে গমনকারী কোনো মো'মিন মুসলমান চিরস্থায়ী পুণ্যের ফসল (সদকায়ে জারিয়্যা), কিংবা উপকারী বইপত্র, অথবা তাঁর জন্যে দোয়া করার মতো পরহেযগার সন্তান দুনিয়াতে রেখে গেলে তিনি পরকালে তার সওয়াব পেতে থাকবেন। মানুষ যখন ইন্তেকাল করেন, তখন তাঁর সাওয়াব বা গুনাহ লিপিবদ্ধ করার খাতাটি বন্ধ হয়ে যায় না। জনৈক সাহাবী হযরত সা'আদ ইবনে আবূ উবাদা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে একবার জিজ্ঞেস করেন,

يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنَّ أُمَّ سَعْدٍ مَاتَتْ فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ الْمَاءُ.

–ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! সা'দের মা ইন্তেকাল করেছেন। আমি কীভাবে এখনো তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারি? প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ ফরমান, 'পানি দান করা উত্তম হবে'।[১]

দোয়া করার সময় সকল মো'মিন মুসলমানের রূহের প্রতি তা বখশিয়ে দেয়া উচিত। এতে তাঁদের সবাই সে আশীর্বাদ পাবেন। দোয়া বিপদ-আপদ দূর করে। দান-সদকাহ আল্লাহর গযব (রাগ)-কে প্রশমিত করে, বালা-মসিবত হতে মানুষকে রক্ষা করে, আর মৃত্যুপথযাত্রী নন এমন রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে

[১]. ক) আবু দাউদ : আস্ সুনান, বাবু ফযলি সাকিয়ুল মা'আ, ৪:৪৯৭, হাদিস নং : ১৪৩১।
খ) তাবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবু ফযলিস্ সদকা, ১ম পরিচ্ছেদ, পৃ. ৪৩১, হাদিস নং : ১৯১২।

আহলে বায়ত এর প্রতি-১৩

আরোগ্য লাভে সহায়তা করে। যে ব্যক্তি দোয়া করে না, তাকে আল্লাহ পাক পছন্দ করেন না।

প্রত্যেক মুসলমানকে নিজের ধর্মীয় সম্প্রদায়গত মাযহাব সম্পর্কে এবং আমল তথা ধর্মের অনুশীলনমূলক (কর্মের) মাযহাব সম্পর্কে জানতে ও শিখতে হবে। মাযহাব মানে পথ বা রাস্তা। ইজতেহাদ নামের অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রমভিত্তিক ও জ্ঞাননির্ভর পদ্ধতি দ্বারা মুজতাহিদ হিসেবে অভিহিত গভীর জ্ঞানী আলেমবৃন্দ কুরআনুল করীম ও হাদিস শরীফে গোপনে ব্যক্ত ইসলামী শিক্ষাসমূহকে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। আমাদের ধর্মীয় সম্প্রদায়গত মাযহাবের নাম হচ্ছে আহল্ আস্-সুন্নাত ওয়াল্-জামাআত। আহল আস্-সুন্নাত ওয়াল-জামাআতের মাযহাব বলতে বোঝায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আসহাব-এ-কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) এবং তাঁদের জামা'আতের (অর্থাৎ, তাঁদের অনুসারীবৃন্দের) ধর্মীয় আকীদা-বিশ্বাস। প্রত্যেক সাহাবী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-ই মুজতাহিদ ছিলেন, ইসলাম ধর্মের আলোকবর্তিকা ছিলেন। বস্তুত তাঁরাই মুসলমানদের ইমাম তথা নেতৃবৃন্দ, পথপ্রদর্শক ও প্রামাণ্য দলিল। যে ব্যক্তি তাঁদের প্রদর্শিত পথ হতে বিচ্যুত হয়, তার গন্তব্যস্থল জাহান্নাম। আহল আস্-সুন্নাহ দলটির (আকীদাগত মাযহাবের) ইমাম দুজনঃ এঁদের একজন **হযরত আবু মনসূর মা'তুরিদী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)**। তিনি ইমাম আবূ হানিফা (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর মাযহাবে গড়ে ওঠা এক মহাজ্ঞানী আলেম ছিলেন। হানাফী মাযহাবের উলামাবৃন্দ সবাই তাঁরই (আকীদার) মাযহাবের অনুসারী। অপর ইমামের নাম **হযরত আবুল হাসান আশআরী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)**। তিনি শাফেঈ মাযহাবের অন্যতম সেরা একজন আলেম; মহা বিদ্বান ব্যক্তি। এই দুটি (আকীদাবিষয়ক) মাযহাবের মধ্যকার পার্থক্য অতি নগণ্য।

বর্তমানে এমন কোনো গভীর জ্ঞানী আলেম নেই যিনি ইজতেহাদ প্রয়োগ করতে সক্ষম। প্রত্যেক মুসলমানকে তাই চার মাযহাবের যে কোনো একটি সম্পর্কে জানতে সেই মাযহাবের ইলম আল-হাল নামের বইপত্র পড়তে হবে, যে বইগুলো মাযহাবের প্রয়োজনসমূহ শিক্ষা দেয়; অতঃপর তাঁকে ওই মাযহাবের সাথে নিজের আকীদা-বিশ্বাস ও আমলের সমন্বয় সাধন করতে হবে। কেবল এরকম করতে পারলেই তিনি ওই মাযহাবের সাথে সংশ্লিষ্ট হতে পারবেন। চার মাযহাবের কোনো একটির মধ্যে দাখিল না হওয়া পর্যন্ত কেউই

সুন্নী মুসলমান হতে পারে না। ওই রকম লোক লা-মাযহাবী (আহলে হাদিস) হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি লা-মাযহাবী, সে হয় বাহাত্তরটি পথভ্রষ্ট দলের কোনো একটির অনুসারী, না হয় অবিশ্বাসী। পবিত্র কুরআন মজীদের সূরা কাহাফের ২৪তম আয়াতের ব্যাখ্যায় 'তাফসীরে সাবী' গ্রন্থটিতে নিম্নোক্ত বর্ণনা প্রদান করা হয়ঃ

"চার মাযহাবের কোনো একটির অন্তর্গত নয় এমন কাউকে অনুসরণ করার কোনো অনুমতিই নেই, যদিও তার কথাবার্তা আসহাব-এ-কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-এর বাণী অথবা সহীহ হাদিস কিংবা আয়াতে করীমার সাথে মিলে যায়। চার মাযহাবের কোনো একটির অন্তর্ভুক্ত নয় এমন ব্যক্তি গোমরাহ-পথভ্রষ্ট। সে অন্যান্যদেরও পথভ্রষ্ট করবে। চার মাযহাব হতে বিচ্যুতি মানুষকে অবিশ্বাসী বানিয়ে দেবে। অবিশ্বাসীদের রীতি হচ্ছে মুতাশাবিহাত নামের গূঢ় রহস্যপূর্ণ (অথচ দ্ব্যর্থবোধক) কুরআনের আয়াতগুলোকে সেগুলোর বাহ্যিক অর্থ আরোপ করা।" ধর্মীয় পদে সমাসীন কোনো ব্যক্তি যদি বলেন যে তিনি আহলে সুন্নাতের মাযহাবের অন্তর্গত এবং যদি তিনি তাঁর মাযহাবের শিক্ষাসমূহ প্রচার-প্রসার করেন, তবে তাঁর বক্তব্য ও বইপত্র মূল্যবান বলে বিবেচিত হবে। যাঁরা সেগুলো পাঠ করবেন, তাঁরা উপকার পাবেন। কিন্তু লা-মাযহাবী লোকদের লেখা ধর্মীয় বইপত্র মারাত্মক ক্ষতিকর। যারা সেগুলো পড়বে, তাদের ঈমান-আকীদাহ বরবাদ হবে। আমাদের দ্বীনী ভাই ও বোনদের প্রতি আমাদের উপদেশ হলো, আহলে সুন্নাতের মাযহাব সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করতে সচেষ্ট হোন এবং নিজেদের সন্তানদেরকে তা শিক্ষা দিন! আমাদের (হাকীকত কিতাবেভী'র) বইপত্রের শেষ পাতায় তালিকাবদ্ধ প্রতিটি কিতাবই আহলে সুন্নাতের মহান আলেম-উলামার লিখিত গ্রন্থের অনুবাদ (বা মূল রচনা)। আপনাদের এসব বই কিনে পড়তে হবে, আর আপনাদের পরিচিতজনদের এ সম্পর্কে জানাতে হবে এবং সকল মুসলমানের কাছে তা পৌঁছে দেয়ার চেষ্টাও করতে হবে যাতে তাঁরা পড়েন। এভাবে আপনারা জ্বিহাদের সওয়াব অর্জন করতে সক্ষম হবেন।

জ্বিহাদ মানে সশস্ত্র বিদ্রোহ করে ক্ষমতা দখল (ক্যু'দেতা) নয়, নিজেদের আদেশদাতাবৃন্দের কথা অমান্য করাও নয়; সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাও নয়; অথবা মারধর, ধ্বংস সাধন, ভাংচুর, বা লা'নত তথা অভিসম্পাত দান করাও নয়। এধরনের কাজে ফিতনা জাগ্রত হওয়া ছাড়া কোনো উপকার নিহিত

নেই। আরেক কথায়, এসব কাজ বিচ্ছিন্নতাবাদের অর্থ বহন করবে। এটি মুসলমানদেরকে নির্যাতন-নিপীড়নের শিকারে পরিণত করবে, আর ধর্ম ও ঈমান সংক্রান্ত শিক্ষাসমূহের প্রসারে বাধা সৃষ্টি করবে। আমাদের মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফিতনা জাগ্রতকারী লোকদেরকে অভিসম্পাত দিয়েছেন। কোনো মুসলমানের কাছে বন্দিত্ব সম্মানজনক হিসেবে কাম্য হতে পারে না। মুসলমানের কাছে যে সম্মান কাম্য তা হলো, দ্বীন-ইসলামে আদিষ্ট সুন্দর নৈতিক গুণাবলী দ্বারা নিজেকে বিভূষিত করা, মানুষের উপকার বা কল্যাণ সাধন করা, ইসলামের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়া, আর সকল সৃষ্টির কল্যাণ সাধন করা। নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত করা চরম আহাম্মকি, আর তা পাপপূর্ণ আচরণও বটে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা এরশাদ ফরমান, "তোমরা নিজেদেরকে (বিপদের মুখোমুখি করে) ক্ষতিগ্রস্ত করো না!"

জ্বিহাদ অর্থ আল্লাহ তা'আলার জন্মগত বান্দাদের কাছে তাঁরই ধর্মের (দ্বীন-ইসলামের) বাণী পৌঁছে দেয়া। এটি পরিচালনার পন্থা তিনটি: প্রথমটি হলো যেসব নিষ্ঠুর স্বৈরাচারী শাসক জনগণকে গোলামিতে বাধ্য করে শোষণ করে এবং দ্বীন-ইসলাম সম্পর্কে জানতে বাধা দিয়ে তাঁদের প্রতি নির্যাতন-নিপীড়ন করে, তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে তাদেরকে পরাভূত ও নির্মূল করে মানুষকে দ্বীন-ইসলাম সম্পর্কে জানতে সহায়তা করা। জনসাধারণ একবার ইসলাম সম্পর্কে জানলে তা গ্রহণ করা বা না করা তাঁদেরই ইচ্ছাধীন। তাঁরা স্বাধীনভাবে নিজেদের পছন্দানুযায়ী মুসলমান হতে পারেন, কিংবা তাঁদের নিজেদের (পূর্ববর্তী) ধর্ম অনুসারে পূজা-অর্চনা অব্যাহত রাখতে পারেন; তবে শর্ত এই যে তাঁদেরকে ইসলামের (রাষ্ট্রীয়) আইন-কানুন মেনে চলতে হবে। এ ধরনের সশস্ত্র জ্বিহাদ শুধু (ইসলামী) সরকারই পরিচালনা করতে পারে (যদি তার অস্তিত্ব কোথাও থেকে থাকে)। ওই রাষ্ট্রের সেনাবাহিনী এ কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত। সকল মুসলমানই রাষ্ট্রের আরোপিত এতদসংক্রান্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সর্বাত্মক চেষ্টা করবেন এবং জ্বিহাদের সাওয়াব হাসিল করবেন। রাষ্ট্রপক্ষ জ্বিহাদ পরিচালনা করে দ্বীন-ইসলাম ও উম্মতে মুহাম্মদীয়্যাকে অবিশ্বাসীদের আক্রমণ থেকে হেফাযত করবে; এর পাশাপাশি চক্রান্তকারী ইসলামের অন্তর্ঘাতী গোমরাহ-পথভ্রষ্ট শত্রুদের বিরুদ্ধেও জ্বিহাদ পরিচালনা করবে। (এরকম ইসলামী) সরকারের খেদমত দ্বারা সকল মুসলমানই জ্বিহাদের সাওয়াব হাসিল করবেন।

জ্বিহাদের দ্বিতীয় কিসিম হচ্ছে ইসলামী শিক্ষা, এর দ্বারা সঞ্চারিত সুন্দর নৈতিক গুণাবলী এবং ওয়ায-নসীহত, বইপত্র ও রেডিও-টিভিতে অনুষ্ঠান সম্প্রচারের মাধ্যমে বিশ্ব সভ্যতায় যে মানবিক অধিকার ও স্বাধীনতা ইসলাম নিশ্চিত করেছে, তা প্রচার-প্রসার করা।

জ্বিহাদের তৃতীয় ধরন হচ্ছে প্রথম দুই কিসিমের জ্বিহাদ যাঁরা পরিচালনা করেন, তাঁদের জন্যে দোয়া করে তাঁদেরকে সমর্থন করা। ইসলামের প্রচার-প্রসারে সশস্ত্র জ্বিহাদ পরিচালনা করা হচ্ছে 'ফরযে কেফায়া' [দ্বীনের সুস্পষ্ট আদেশকে 'ফরয' বলে। এটি যখন সকল মুসলমানের ওপর বর্তায়, তখন একে বলা হয় ফরযে আইন। তবে এসব আদেশের মধ্যে এমন কতোগুলো আছে, যেগুলো হতে অন্যান্য সবাই মওকুফ বা নিষ্কৃতি পাবেন– যদি কোনো একজন মুসলমান বা মুসলমানের দল তা পালন করেন, এসব আজ্ঞাকে 'ফরযে কেফায়া' বলে।– আল্লামা হুসাইন হিলমী]। তবে শত্রুপক্ষ আক্রমণ করলে প্রত্যেক মুসলমান পুরুষের জন্যে তা (জ্বিহাদ) ফরযে আইন হয়ে দাঁড়ায়; এমন কি নারী ও শিশুদের জন্যেও তা-ই হয়– যদি পুরুষের সংখ্যা অপর্যাপ্ত থাকে। তাঁরা এরপরও শত্রুদের মোকাবেলা করতে না পারলে সারা বিশ্বের মুসলমানদের জন্যে তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে জ্বিহাদ পরিচালনা করা ফরযে আইন হয়। দ্বিতীয় ধরনের জ্বিহাদ সেসব মুসলমানেরই প্রতি ফরযে আইন হয় যাঁরা তা পরিচালনা করতে সক্ষম; আর তৃতীয় কিসিমের জ্বিহাদ সবার জন্যে সবসময়েই ফরযে আইন। দ্বিতীয় ধরনের জ্বিহাদ পরিচালনার জন্যে (রাষ্ট্রীয়) আইনসম্মত উপায়ে আহলুস্ সুন্নাহ'র বইপত্র প্রচার-প্রসারের চেষ্টা করা জরুরি। আমরা জাগতিক উন্নতির জন্যে নিরন্তর কাজ করে চলেছি। প্রত্যেক মুসলমানের উচিত পারলৌকিক উন্নতির জন্যেও অব্যাহতভাবে কাজ করা। ইসলামের শত্রুরা দ্বীনের ধ্বংস সাধনে সর্বাত্মক চেষ্টা চালাচ্ছে। তাদের আক্রমণ থেকে বাঁচতে মুসলমানদেরকে দুটো কাজ করতে হবে: প্রথমতঃ তাঁরা নিজ নিজ সন্তানদেরকে কুরআন মজীদ শিক্ষা কোর্সে পাঠাবেন। দ্বিতীয়তঃ আহলে সুন্নাতের উলামাবৃন্দ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম আজমাঈনের লিখিত বইপত্র প্রচার-প্রসার করতে হবে। 'ফতোওয়া-এ-হিন্দীয়্যা' গ্রন্থের ওয়াকফ অধ্যায়ের চৌদ্দতম প্যারাগ্রাফে লিপিবদ্ধ আছে:

> "যেসব মানুষ দান-সদকাহ'র মতো পুণ্যদায়ক কাজ করতে ইচ্ছুক, (তাঁদের জন্যে) গোলাম আজাদ বা মুক্ত করার চেয়ে শ্রেয়তর হবে সর্বসাধারণের জন্যে উপকারী ইমারত নির্মাণ করা। (ইসলামী শিক্ষা,

নৈতিকতা ও জ্ঞানসম্বলিত) বইপত্র প্রকাশ হচ্ছে সবসেরা। ফিক্‌হ-বিষয়ক পুস্তকের রচনা ও প্রকাশনা নফল ইবাদত-বন্দেগীর অনুশীলন হতে শ্রেয়তর।"

[৪৩]

মিসরীয় মুহাম্মদ কুতুব, আবদুহু, রশীদ রেযা গংয়ের রদ

ইসলাম ধর্মের ভিত্তিমূলে ধূর্ত উপায়ে আঘাতকারী এবং মুসলমান সন্তানদেরকে বিভ্রান্তকারী অপর এক অন্তর্ঘাতী শত্রু হচ্ছে মিসরীয় মুহাম্মদ কুতুব। দেখুন কী রকম বাজে কথা সে তার 'বিচ্যুতির সীমারেখা' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেঃ

"ইসলামের ভিত্তিস্তম্ভে প্রথম ফাটল দেখা দেয় প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক খাতে উমাইয়া শাসকদের নীতির ক্ষেত্রে। কেননা, 'মালিক-এ-আদুদ' একটি বংশীয় রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিষ্ঠুরতার এক ক্রমধারা চালু করেন। সুলতান ও প্রাদেশিক শাসনকর্তাবর্গের আত্মীয়স্বজন এক ধরনের সামন্ততান্ত্রিক দলপ্রধানে পরিণত হয়।

"অতঃপর সূচনা হয় আব্বাসীয় যুগের। খেলাফত ও প্রাদেশিক শাসনকর্তাবর্গের ইমারতগুলো জনসেবার পরিবর্তে মদ্যপান ও অবৈধ যৌনাচারের আস্তানায় রূপান্তরিত হয়। তারা সেখানে সঙ্গীতের আসর বসিয়ে 'বেলী' নর্তকীদের জলসার আয়োজন করে এবং সর্বনিকৃষ্ট পর্যায়ের অন্যায় সংঘটন ও নফসানীয়্যাত বা অহংবাদের চর্চা করে।"

'তোহফা' গ্রন্থটি মাযহাব-বিহীন লোকদের বানোয়াট ৭০তম মিথ্যের জবাবে বিবৃত করেঃ "কোনো ব্যক্তির খেলাফত যদি নস তথা কুরআন ও হাদিসের শরয়ী প্রামাণ্য দলিল দ্বারা সুস্পষ্টভাবে ঘোষিত হয়, তবে এ ধরনের খেলাফতকে বলা হয় 'খেলাফত-এ-রাশেদা'। এই কারণেই মহান চার খলীফাকে 'খুলাফা-এ-রাশেদীন' নামে অভিহিত করা হয়। যদি কোনো ব্যক্তির খেলাফতকে যুক্তি ও বিচার-বিবেচনা এবং নসের সাহায্যে নির্ধারণ করা হয়, তাহলে তার খেলাফতকে 'খেলাফত-এ-'আদিলা' বলা হয়। আর যদি কারো খেলাফত না নসে স্পষ্টভাবে ঘোষিত, না যুক্তি দ্বারা নির্ধারিত হয়, বরঞ্চ সে জোরপূর্বক ক্ষমতাসীন হয়, তবে তার খেলাফতকে বলা হয় 'খেলাফত-এ-জায়েরা'; আর এ ধরনের খলীফাকে 'মালিক-এ-আদুদ' অভিহিত করা হয় ।"

শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দীসে দেহেলভীর *'ইযালাত-উল-খাফা'* শীর্ষক গ্রন্থের ৫২৮ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ একটি হাদিসে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ ফরমান,

–আমরা এ কাজ নবুওয়্যত ও আল্লাহ তা'আলার রহমত-বরকত দ্বারা আরম্ভ করেছি। এ সময়ের পরে সূচিত হবে খেলাফতের যুগ এবং আল্লাহর করুণা বর্ষিত হতে থাকবে। অতঃপর আবির্ভূত হবে মালিক-এ-আদুদ (-এর যমানা)। তার পরবর্তী সময়ে দেখা দেবে আমার উম্মতের মাঝে অন্যায়-অবিচার, নিষ্ঠুরতা ও ফিতনা-ফাসাদ। রেশমের বস্ত্র পরিধান, মদ্যপান ও যেনা (অবৈধ যৌনাচার)-কে হালাল করা হবে এবং এই অবস্থাকে অনেক লোকই সমর্থন করবে। পৃথিবীর শেষলগ্ন অবধি এভাবেই চলবে।

এই হাদিস শরীফটি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে যে হযরত আমীরে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) শক্তিবলে ক্ষমতা গ্রহণ করবেন এবং তাঁর শাসনকালের পরবর্তী সময়েই কেবল নিষ্ঠুরতা ও ফিতনা-ফাসাদ দেখা দেবে, তাঁর শাসনামলে তা হবে না। আব্বাসীয় রাষ্ট্রের গোড়াপত্তনের সময় ফিতনা-ফাসাদ ও নিষ্ঠুরতার সূত্রপাত হওয়ার কথা লিখে শাহ ওলীউল্লাহ দেহেলভী সাহেব মুহাম্মদ কুতুবের কুৎসাকে সমূলে উৎপাটন করেছেন।

বিভিন্ন হাদিস শরীফে ইঙ্গিত করা হয়েছিল যে আমীরে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) একদিন শাসক হবেন। অতএব, ইমাম হাসান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) যখন তাঁর কাছে খেলাফত হস্তান্তর করে নিজ পদ থেকে সরে দাঁড়ান এবং সাহাবা-এ-কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) তাঁকে খলীফা নির্বাচন করেন, তখন তিনি খলীফা-এ-আ'দিল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। এই মহান সাহাবী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে তাই 'মালিক-এ-আদুদ' আখ্যায়িত করা এক মস্ত বড় কুৎসা হবে, আর এই খেতাবের প্রতি নিষ্ঠুর শাসক, অবিশ্বাসী ইত্যাদি ভুল অর্থ আরোপ করাও হবে এক বড় ধরনের অপবাদ। অধিকন্তু, যে ব্যক্তি এই শব্দটিকে 'রাজা' হিসেবে অনুবাদ করবে, সে অবশ্যঅবশ্য ইসলাম সম্পর্কে একেবারেই অনবধান বলে প্রতীয়মান হবে।

অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের রাজ্যে শাসকদেরকে 'রাজা' বলা হয়। ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, বুলগেরিয়া ইত্যাদি দেশের রাজাবৃন্দ হলেন এই ধরনের উদাহরণ। কিন্তু কোনো মুসলমান 'মালিক'কে 'রাজা' বলা মুসলমানদের কাছে প্রিয় ও সম্মানিত এবং

খলীফা হিসেবে আখ্যায়িত কোনো আশীর্বাদধন্য ব্যক্তিকে হেয় প্রতিপন্ন করারই শামিল এবং ওই মালিক (শাসক)-কে ও তাঁর প্রজা সাধারণ সবাইকেই অবিশ্বাসী অভিহিত করার নামান্তর। আমাদের আক্বা ও মাওলা হযরত রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আমীরে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে 'মালিক' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। আর কোটি কোটি মুসলমান তাঁকে মালিক ও খলীফা বলে ডাকেন। কেউই এই মহান সাহাবী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর প্রতি, ইসলামের এই বিখ্যাত মুজাহিদের প্রতি নিষ্ঠুরতার অপবাদ আরোপ করেননি। কেননা, আমীরে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-ই সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তিবৃন্দের একজন, যিনি হাদিস শরীফে প্রশংসিত ও হুযূর পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দোয়ার বিষয়বস্তু হয়েছিলেন, আর যিনি বিভিন্ন আয়াতে করীমার মর্মানুযায়ী ক্ষমাপ্রাপ্ত ও বেহেস্তী সাব্যস্ত হয়েছিলেন। ইসলামের এই বীর মুজাহিদবৃন্দের, হাদিস শরীফে প্রশংসিত স্বর্ণযুগের সিংহদের সাথে ইউরোপের নিষ্ঠুর ও অবিশ্বাসী সামন্ততান্ত্রিক রাজন্যবর্গের তুলনা দেয়ার মানে হলো ইসলামের আত্মায় ছুরিকাঘাত করা। নিম্নবর্ণিত হাদিস শরীফগুলো সর্বজনবিদিত:

"আখেরাতে কাফেরদেরকে শাস্তি দেয়ার আগে আযাবের ফেরেশতাবৃন্দ সেসব ধর্মীয় পদে সমাসীন ব্যক্তিদেরকেই শাস্তি দেবেন যাদের ইলম তথা জ্ঞান ছিল অর্থহীন" *[মানে গোমরাহীপূর্ণ– বঙ্গানুবাদক]* এবং "আখেরাতে সবচেয়ে মন্দ শাস্তি সেই ধর্মীয় পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরই ওপর পতিত হবে, যার জ্ঞান ছিল অর্থহীন (গোমরাহীপূর্ণ)।"

এই হাদিসগুলো তরুণ প্রজন্মগুলোকে সতর্ক করে থাকে। এগুলো বিবৃত করে যে ভুয়া ধর্মীয় ম্যাগাজিনে ও পত্রপত্রিকায় (বা টিভি চ্যানেলে– বঙ্গানুবাদক) ধর্মীয় পণ্ডিত হিসেবে উপস্থাপিত ব্যক্তিবর্গ ঈমান-আকীদার চোর এবং আখেরাতে চরম শাস্তিপ্রাপ্ত পাপাত্মা ।

ওপরে যা লেখা হয়েছে, তা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার কুখ্যাত বৃটিশ গুপ্তচর লরেন্স (অফ এরাবিয়া)-এর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এই নিখুঁত আরবি ভাষা রপ্তকারী শ্মশ্রুমণ্ডিত বৃটিশ গুপ্তচর (আলেম-উলামার মতোই) পাগড়ি ও লম্বা জুব্বা পরতো এবং ইসলামী জ্ঞান বিশারদ হওয়ার ভান করে আহলে সুন্নাতের আলেম-উলামার কুৎসা রটনা করতো। আসহাবে কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু), ইসলামী খলীফাবৃন্দ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ও উসমানীয় তুর্কীদের প্রতি কলঙ্ক

লেপন করে সে লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে গোমরাহ-পথভ্রষ্ট করেছিল। এভাবে সে ইসলামের মধ্যে পরিবর্তন সাধনে অপচেষ্টারত ও দ্বীনকে হেয় প্রতিপন্নকারী লোকদের সহায়তা করে, যাতে তারা তুর্কীদের থেকে আলাদা হয়ে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে পারে। প্রকৃত মুসলমানদেরকে ওহাবী মতবাদের বইপত্রে 'মুশরিক' তথা মূর্তি পূজারী আখ্যায়িত করা হয়েছে। তারা আমাদের, অর্থাৎ, সুন্নী মুসলমানদের, কাফের বা অবিশ্বাসী হিসেবে কলঙ্কচিহ্নিত করে থাকে। গুপ্তচর লরেন্স এখন আর নেই, সে জাহান্নামে গিয়েছে। কিন্তু শত্রুরা বর্তমানে তার স্থলে তাদেরই মতবাদে দীক্ষিত দেশীয় চরদেরকে কাজে লাগাচ্ছে। সহস্র সহস্র স্বর্ণমুদ্রা ব্যয়ে বিভিন্ন দেশে তারা এদের প্রশংসায় ভরা বইপত্র ও ম্যাগাজিন ছেপে প্রচার করছে। তাদের এসব পুস্তকে তারা আহলে সুন্নাতের হক্কানী আলেম-উলামা (রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম)'র সমালোচনা করে চলেছে। তবে ইসলামী জ্ঞান বিশারদমণ্ডলী সর্বসম্মতভাবে ওই সকল ইমাম (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর উচ্চ মর্যাদার বর্ণনা দিয়েছিলেন এবং এই বিষয়টির চূড়ান্ত মীমাংসা করেছিলেন, যার দরুন পরবর্তী প্রজন্মগুলোর জন্যে এতদসংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনার বিন্দু পরিমাণ সুযোগও আর অবশিষ্ট নেই। ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিপূর্বে আলোচিত, মতৈক্য-প্রতিষ্ঠিত ও মীমাংসিত অতীতের ঘটনাকে খুঁচিয়ে বের করে আনার অপপ্রয়াসের মধ্যে ক্ষতি সাধনের মনোভাবই প্রকাশ পায়, খেদমত বা সেবার মনোভাব প্রকাশ পায় না। এটি অমঙ্গল-কামনার ইঙ্গিতবহ।

উমাইয়া, আব্বাসীয় ও উসমানীয় সকল খলীফা-ই ঈমানদার, সচ্চরিত্রবান, ন্যায়পরায়ণ ও আশীর্বাদধন্য মানুষ ছিলেন। তবু তাঁদের মধ্যে সামান্য কয়েকজন নফসানী খায়েশ ও শয়তানের প্রলোভনে পড়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু এঁরা দ্বীন-ইসলামের ক্ষতি সাধন করেননি, বরঞ্চ নিজেদের আত্মার প্রতি অন্যায় করেছিলেন। এঁদের মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট জন সুন্নী পথ ছেড়ে মো'তাযিলী হয়েছিলেন। আর তা-ও ঘটেছিল ধর্মীয় পদে সমাসীন গোমরাহ লোকদের কারণে। খলীফাদেরকে ভ্রান্ত পথে যেসব শয়তান নিয়ে গিয়েছিল, তারা চির অভিশপ্ত শয়তানের বংশধর না হলেও মানবজাতির মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট অধঃপতিত লোক। ইমাম-এ-রব্বানী মোজাদ্দেদে আলফে সানী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) নিজ 'মকতুবাত' গ্রন্থে বলেন, "মুসলমান সর্বসাধারণ ও রাষ্ট্রপ্রধানদের সঠিক পথ হতে বিচ্যুতি বিদ্বেষপরায়ণ আলেম-উলেমাবর্গের দ্বারাই সাধিত হয়েছে।" অনৈতিক একটি নিকৃষ্ট কাজ হচ্ছে খলীফাদের বৈধ ব্যক্তিগত হারেম-জীবন

সম্পর্কে বইপত্রে ও ম্যাগাজিনে আজে-বাজে কথা লিখে তাঁদেরকে নৈতিকতাহীন ও অধার্মিক ব্যক্তি হিসেবে কলঙ্কচিহ্নিত করার অপচেষ্টা চালানো। এটি এমন এক বিষয় যা সৎ মানুষদের অন্তরে আঘাত দেয় এবং তাঁদেরকে উত্তেজিত করে। কোনো ব্যক্তি হয়তো ইউরোপীয় ইতিহাস পুস্তকে বা কতিপয় পাদ্রী-পুরোহিত ও ফ্রী-মেইসন গোষ্ঠীর লেখা বইপত্রে সন্নিবেশিত মিথ্যে ও কুৎসাসমূহ পাঠ করে তা বিশ্বাস করতে পারেন। আমরা তাঁদের সুপারিশ করবো, তাঁরা যেন কিছু ইসলামের ইতিহাসগ্রন্থ ও আহলে সুন্নাতের উলামাদের লিখিত বইপত্রও পাঠ করেন। এতে তাঁরা সত্য সম্পর্কে জানতে সক্ষম হবেন। বস্তুতঃ যে প্রবন্ধটি কোনো প্রামাণ্য ঘটনা বা দলিল ছাড়া স্রেফ এক গুচ্ছ মতামতের ভিত্তিতে লিখিত হয়েছে, তা অবশ্যঅবশ্য এমন কারোরই হবে যার কোনো ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষা নেই। এসব লোক লিখে থাকে যে উমাইয়া, আব্বাসীয় ও উসমানীয় তুর্কী আমলে মানুষেরা ইসলাম ধর্ম যথাযথভাবে পালন করতেন। এতেই প্রতীয়মান হয় যে ওই সময়কার রাষ্ট্রবিদবৃন্দ ঈমানদার ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। কেননা, আমাদের মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ ফরমান, "জনগণের ধর্ম হচ্ছে তাদের রাষ্ট্রপ্রধানের ধর্মের মতোই।"

সমগ্র ইতিহাসজুড়ে আমরা মুসলমান সম্প্রদায় মিথ্যেবাদী ও কুৎসা রটনাকারী ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গ হতে সাবধানতা অবলম্বন করে আসছি। এক সময় ইবনে তাইমিয়া মধ্যপ্রাচ্যে ঈমান বিনষ্ট করার পাঁয়তারা করেছিল। আহলে সুন্নাতের উলামাবৃন্দ তাকে উচিত শিক্ষা দেন। তার সমর্থন-অযোগ্য ধ্যান-ধারণাকে খণ্ডন করতে সহস্র সহস্র বই প্রণীত হয় এবং এতে সে বেইজ্জতও হয়। পরবর্তীকালে মিসরের আবদুহু নামের আরেকজন ফ্রী-মেইসন গোষ্ঠীর সাথে সহযোগিতা করে। খৃষ্টধর্মে যেমন প্রটেস্টান্ট নামের সঙ্কর জাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছিল, তেমনি এই গোমরাহ লোকটি তারই ঘৃণিত আহলে সুন্নাতকে নিশ্চিহ্ন করার অপচেষ্টা চালায় এবং ইসলামের মধ্যে পশ্চিমা অধার্মিক দর্শন সন্নিবেশিত করার অপপ্রয়াস পায়। এই লোককেও তার প্রাপ্য জবাব দেয়া হয়। তবু লজ্জাজনক ব্যাপার এই যে, কায়রোর ফ্রী-মেইসন গোষ্ঠীর প্রধানকর্তা আবদুহের বিষাক্ত ধ্যান-ধারণা জামেউল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়েও সংক্রামিত হয়। ফলে বেশ কিছু ধর্ম সংস্কারকের আবির্ভাব হয় মিসরে। তাদের মধ্যে কয়েকজন হলো রশীদ রেযা, মাদ্রাসাত আল-আযহারের শিক্ষক মোস্তফা মারাগী, কায়রোর মুফতী আবদুল মাজীদ সেলিম, মাহমূদ শালতুত, তানতাউয়ী জওহারী, আবদুর রাযেক

পাশা, যাকী মুবারক, ফারীদ ওয়াজদী, আব্বাস আক্কাদ, আহমদ আমিন, ডাক্তার তোয়াহা হুসাইন পাশা ও কাসিম আমিন। অপর পক্ষে, তাদের শিক্ষক আবদুহের মতো এসব লোককেও আধুনিক ইসলামী বিদ্বান হিসেবে উপস্থাপন করা হয় এবং তাদের বইপত্র তুর্কী ভাষায় অনূদিত হয়, যার ফলশ্রুতিতে অনেক ধর্মীয় পদে সমাসীন ব্যক্তি সঠিক পথ হতে বিচ্যুত হয়।

মহান ইসলামী আলেম ও হিজরী চৌদ্দ শতকের মোজাদ্দেদ সাইয়্যেদ আবদুল হাকীম আফেন্দী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, "কায়রোর মুফতী আবদুহু ইসলামী আলেম-উলেমাবৃন্দের মাহাত্ম্য স্বীকার করতো না, আর সে ধর্মের শত্রুদের কাছে বিক্রিও হয়ে গিয়েছিল। অবশেষে সে একজন ফ্রী-মেইসন বনে যায়, আর সেসব লাগামহীন অবিশ্বাসীদের দলে ভিড়ে যায় যারা ইসলামের মধ্যে অন্তর্ঘাতমূলক অপতৎপরতায় ছিল জড়িত। ইযমির এলাকার ইসমাইল হাক্কী, উমর রেযা দোগরুল, হামদী আকসেকী, সরফউদ্দীন ইয়ালতকায়া, শামসউদ্দীন গুনালতায়, মুস্তফা ফয়েযী, কোনিয়া অঞ্চলের ওয়াহবী, মুহাম্মদ আকিফ এবং ধর্মীয় কর্তৃত্বসম্পন্ন আরো অনেক লোক ওইসব ফ্রী-মেইসনের বইপত্র পড়ে তাদের মন্দ প্রভাবে পতিত হয় এবং বিভিন্ন পথের দিকে বিচ্যুত হয়।"

আবদুহু ও তার মতো কুফরী বা গোমরাহীর দিকে ধাবিত লোকেরা ধর্মীয় পদে সমাসীন তরুণ প্রজন্মগুলোকে বিচ্যুত করতে একে অপরের সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়, যার দরুন সেই দুর্যোগ বয়ে আনায় পথিকৃৎ হয় তারা, যে দুর্যোগ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল হাদিস শরীফে, "আমার উম্মতের ওপর বিভিন্ন দুর্যোগ নেমে আসবে ধর্মীয় কর্তৃত্বসম্পন্ন গোমরাহ লোকদের মাধ্যমে।"

ইত্যবসরে আবদুহের শিষ্যবর্গ কিন্তু বসে ছিল না। তারা অনেকগুলো ক্ষতিকর বইপত্র প্রকাশ করে, যেগুলোর প্রকৃতি খোদায়ী গযব ও শাস্তি টেনে আনে। এগুলোর একটি হলো রশীদ রেযার 'মুহাওয়ারাত' পুস্তকটি, যেটি হামদী আকসেকী কর্তৃক তুর্কী ভাষায় 'Islamda Birlik' (ইসলামে ঐক্য) শিরোনামে অনূদিত হয় এবং ১৩৩২ হিজরী মোতাবেক ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ইস্তাম্বুলে প্রকাশিত হয়। এই বইতে সে তার শিক্ষকের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সুন্নী চার মাযহাবকে আক্রমণ করে; আর মাযহাবগুলো মতপার্থক্য হতে সৃষ্ট মনে করে এবং সেগুলোর পৃথক পৃথক পদ্ধতি ও শর্তাবলীকে বিতর্কিত ধর্মীয় একগুঁয়েমি

হিসেবে উপস্থাপন করে সে এতোদূর বিচ্যুতিতে পৌঁছে যে এগুলোর প্রতি সে "ইসলামী ঐক্যে ফাটল সৃষ্টি" করার অভিযোগ উত্থাপন করে। তার এই মনোভাবের মানে হচ্ছে গত চৌদ্দ'শ বছর যাবত আগত কোটি কোটি প্রকৃত মুসলমান যাঁরা চার মাযহাবের কোনো একটি অনুযায়ী আমল পালন করেছিলেন, তাঁদের সবাইকে হেয় প্রতিপন্ন করা এবং ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়াও; আর যুগের হাওয়া অনুযায়ী ঈমান ও ইসলামকে পরিবর্তন করার উপায়েরও খোঁজ করা। ধর্ম সংস্কারকদের মাঝে যে বিষয়টি সার্বিক তা হলো, তারা নিজেদেরকে অতি জ্ঞানী ইসলামী পণ্ডিত হিসেবে যাহের করে, যারা প্রকৃত ইসলামকে উপলব্ধি করতে পেরেছে এবং সময়ের চাহিদা সম্পর্কেও জানে; অপরদিকে তারা সেসব প্রকৃত পুণ্যবান মুসলমান যাঁরা ইসলামী বইপত্র পড়েছেন ও শিক্ষা করেছেন এবং "তাদের যুগই সেরা (জমানা)" শীর্ষক হাদিস শরীফে প্রশংসিত আহলে সুন্নাতের ইমামবৃন্দ ও উলামামণ্ডলীর অনুসরণ করেছেন, তাঁদেরকে 'অনুকরণশীল গড্ডালিকা প্রবাহ' বলে অভিহিত করে থাকে। কিন্তু এসব 'ধর্ম সংস্কারক'-ই যে ইসলামের আকীদা-বিশ্বাসগত ও বিশেষায়িত শিক্ষাগুলো সম্পর্কে অনবহিত নিরেট গণ্ডমূর্খ লোক, তা তাদের মৌখিক বক্তব্য ও লেখনীতে সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে। এই বিষয়টি খোলাসা করতে আমরা নিম্নবর্ণিত হাদিসগুলোতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কী বলেছেন, তা প্রত্যক্ষ করবো:

إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِن عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ.

–(সেরা মানুষ হলেন) ঈমানদার আলেম-উলামা, যাঁরা খোদাভীরু।[১]

الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ.

–উলামা (-এ-হক্কানী/রব্বানী) হলেন আম্বিয়া (আলাইহিমুস্ সালাম)-এর উত্তরাধিকারী।[২]

عِلْمُ الْقَلْبِ بِاطِّلَاعِ الرَّبِّ.

–অন্তরের (আধ্যাত্মিক) জ্ঞান আল্লাহরই এক রহস্য।[৩]

---

১. তাবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, পৃ. ৭৫, হাদিস নং : ২১৪।
২. তাবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, পৃ. ৭৪, হাদিস নং : ২১২।
৩. হক্কী : তাফসীর-ই হক্কী, ১৫:৩৩৭।

نَوْمُ الْعَالِمِ عِبَادَةٌ.

–আলেমের ঘুমও এক (প্রকারের) ইবাদত।[১]

عُلَمَاءُ أُمَّتِي كَالنُّجُومِ بِهَا يَهْتَدِي فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ.

–আমার উম্মতের উলামাদের সম্মান করো! তাঁরা পৃথিবীর বুকে তারকাসদৃশ।[২]

–উলামাবৃন্দ আখেরাতে শাফায়াত (তথা সুপারিশ) করবেন।

–ফকীহ উলামা উচ্চস্তরের; তাঁদের সাহচর্যে থাকাও এক (ধরনের) ইবাদত।

–কোনো বুযুর্গ আলেম তাঁর শিষ্যদের (মুরীদবৃন্দের) মাঝে সেরকম (হেদায়াতকারী), যেমনটি কোনো নবী (আলাইহিস্ সালাম) তাঁরই উম্মতের মাঝে।

এসব হাদিস শরীফ কাদের প্রশংসা করে? এগুলো কি গত চৌদ্দ'শ বছর যাবত ইসলাম শিক্ষাদানকারী আহলে সুন্নাতের আলেম-উলামার প্রশংসা করে, নাকি আবদুহু ও তার শিষ্যদের মতো সাম্প্রতিককালের ভুঁইফোড় ধর্ম সংস্কারকদের? এই প্রশ্নটির উত্তরও স্বয়ং মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)ই দিয়েছেন,

"প্রতিটি (আগমনকারী) শতাব্দী-ই তার পূর্ববর্তী শতাব্দীর চেয়ে মন্দ হবে। এ অবস্থা জগতের শেষ সময় পর্যন্ত চলবে।"

অন্যত্র এরশাদ ফরমান,

"দুনিয়ার অন্তিম লগ্নে ধর্মীয় কর্তৃত্বসম্পন্ন লোকেরা গাধার পচনশীল মরদেহের চেয়েও পচা হবে।"

এসব হাদিস শরীফ *'তাযকিরায়ে কুরতুবী'* শীর্ষক গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রশংসিত ও আউলিয়া (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)-বৃন্দের সমর্থিত ইসলামী উলামা-এ-কেরামের সর্বসম্মত ভাষ্যানুযায়ী, মুসলমানদের মধ্যে জাহান্নাম হতে নাজাতপ্রাপ্ত একমাত্র দলটি হচ্ছে আহল্ আস্-সুন্নাত ওয়াল-জামা'আত নামের উলামাবৃন্দের

---

১. হক্কী : তাফসীর-ই হক্কী, ১৪:১৮৩।
২. হক্কী : তাফসীর-ই হক্কী, ১৪:২৯০।

মাযহাবটি। সুন্নী এই দলের বাইরে যারা থাকবে, তারা জাহান্নামে যাবে। উলামাবৃন্দ আরেকটি বাস্তবতা যেটি সর্বসম্মতভাবে তুলে ধরেছেন, সেটি হচ্ছে (ফিক্‌হ'র) মাযহাবগুলোর একীভবন বা সংমিশ্রণ করা মহা ভ্রান্তি। আরেক কথায়, ওপরোক্ত হক্কানী উলামা ও আউলিয়ামণ্ডলী সর্বসম্মতভাবে বলেন যে চার মাযহাবের সহজ পদ্ধতি বা পন্থাগুলো একত্রিত করে স্বতন্ত্র একটি মাযহাব দাঁড় করানোর চেষ্টা করা অন্যায্য ও উদ্ভট একটি কাজ।

ওপরে প্রদত্ত তথ্য সম্পর্কে আরো বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে তুর্কী 'ফাইডেলি বিলগিলার' (Faideli Bilgiler) গ্রন্থে। এক্ষণে প্রশ্ন হলো, একজন জ্ঞানী মানুষ কোনটি পছন্দ করবেন: সহস্রাধিক বছর যাবত ইসলামী উলামাবৃন্দের সর্বসম্মতিক্রমে সমর্থিত আহলে সুন্নাতের মাযহাবের অনুসরণ? নাকি সাম্প্রতিক শতাব্দীগুলোর এসব তথাকথিত সংস্কৃতিবান (!), আধুনিক ও ধর্মীয় জ্ঞানে অজ্ঞ ভুঁইফোড় লোকদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন? হাদিস শরীফে ভবিষ্যদ্বাণীকৃত বাহাত্তরটি জাহান্নামী ফেরকা'র মধ্যে সবচেয়ে নেতৃস্থানীয় ও বাচাল লোকেরা সর্বদা আহলে সুন্নাতের উলামাবৃন্দকে আক্রমণ এবং এসব আশীর্বাদধন্য মুসলমানের প্রতি কলঙ্ক লেপনের চেষ্টা করে এসেছে। কিন্তু কুরআনের আয়াত ও হাদিস শরীফের দালিলিক প্রমাণ প্রদর্শন করে প্রতিবারই তাদেরকে খণ্ডন ও বেইজ্জত করা হয়েছে। তাদের ভয়ঙ্কর লক্ষ্য জ্ঞান ও যুক্তি দ্বারা অর্জন করা সম্ভব নয় দেখে তারা গুণ্ডামি ও সহিংসতার বেছে নেয়। ফলশ্রুতিতে প্রতিটি শতাব্দীতেই তারা অসংখ্য মুসলমানের রক্ত ঝরাতে সক্ষম হয়। পক্ষান্তরে, চার মাযহাবের অনুসারী মুসলমানবৃন্দ সবসময়ই পরস্পর পরস্পরকে ভাইয়ের মতো ভালোবেসেছেন এবং (একই) সমাজে বসবাস করেছেন।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ ফরমান যে, (ইবাদত ও আমলের ক্ষেত্রে) মুসলমানদের বিভিন্ন মাযহাবে বিভক্ত হওয়া তাঁদের প্রতি আল্লাহ তা'আলারই এক রহমত বা করুণাবিশেষ। তবে রশীদ রেযা, যার জন্ম ১২৮২ হিজরী (১৮৬৫ খৃষ্টাব্দ) সালে এবং আকস্মিক মৃত্যু ১৩৫৪ হিজরী (১৯৩৫ খৃষ্টাব্দ) সালে, তার মতো ধর্ম সংস্কারকবর্গ দাবি করে থাকে যে তারা মাযহাবগুলোকে একত্রিত করে ইসলামী ঐক্য প্রতিষ্ঠা করবে। বস্তুতঃ মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সারা বিশ্বের সমস্ত মুসলমানকেই এক ঈমান বা ধর্মবিশ্বাসের ওপর একতাবদ্ধ হতে আদেশ করেছিলেন, যে ঈমানী পথের

দিশারী ছিলেন ইসলামের চার খলীফা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)। ইসলামী উলামা-মণ্ডলী হাতে হাত মিলিয়ে গবেষণা করে চার খলীফা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-এর শিক্ষাদানকৃত এই ঈমানী পথকে চিহ্নিত করেন এবং তাঁদের বইপত্রে লিপিবদ্ধ করেন, আর মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক আদিষ্ট এই পথের নাম দেন 'আহল্ আস্-সুন্নাহ ওয়াল-জামা'আ'। আহলুস্ সুন্নাহ নামের এই দলের পতাকাতলে সারা মুসলিম জাহানের সকল মুসলিমকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। ইসলামী ঐক্যের প্রতি আকাঙ্ক্ষী হওয়ার দাবিদার লোকেরা তাদের দাবির প্রতি একনিষ্ঠ হলে এই ইতোমধ্যে বিরাজমান ঐক্যবদ্ধ দলের সাথে যোগ দেয়া উচিত।

তবে এটি অত্যন্ত লজ্জাজনক যে রশীদ রেযার বইটি, যেটির একমাত্র দূরভিসন্ধি মুসলমানদের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি ও অন্তর্ঘাতমূলক অপতৎপরতা দ্বারা ইসলামের বিনাশ সাধন, সেটি ধর্মীয় পদে সমাসীন তরুণ প্রজন্মগুলোকে পথভ্রষ্ট করার উদ্দেশ্যে ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ে অনুপ্রবেশকারী কতিপয় দুর্বৃত্ত কর্তৃক Islamda Birlik ve Fikh Mezhebleri (ইসলামে ঐক্য ও ফিক্‌হ'র মাযহাবসমূহ) শিরোনামে ছাপা হয়, যার প্রকাশনা নং ১৩৯৪ (১৯৭৪ খৃষ্টাব্দ)। আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া (কৃতজ্ঞতা) যে এসব লা-মাযহাবী (আহলে হাদিস) লোকদের কবল থেকে ধর্ম মন্ত্রণালয়কে মুক্ত করা হয়েছে এবং তাদের জায়গায় যুক্তিসঙ্গত চিন্তাধারাসম্পন্ন, নির্মল আত্মাবিশিষ্ট ও জ্ঞানী বিদ্বান ব্যক্তিবৃন্দ অধিষ্ঠিত হয়েছেন। এঁরা নিজেদের বইপত্রে তরুণ প্রজন্মকে ওইসব দুর্বৃত্ত প্রকাশনা সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। এ ধরনের একটি বইয়ের দৃষ্টান্ত হলো Islam Dinini Tehdid Eden En Korkunc Fitne Mezhebsizlikdir (ইসলামের প্রতি সবচেয়ে বড় হুমকি হলো লা-মাযহাবী ফিতনা), যেটি লিখেছেন তুরস্কের কোনিয়ায় অবস্থিত Islam Enstitusu প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকমণ্ডলীর জনৈক সদস্য জনাব দুরমুস আলী কায়াপিনার। এটি কোনিয়ায় ১৯৭৬ সালে ছাপা হয়। যিনদিক্ব গোষ্ঠী সবসময়ই মিথ্যে কথার বেসাতি দ্বারা মুসলমানদের ধোকা দিয়েছে এবং ঐক্যের মুখোশ পরে ইসলামী ঐক্যে ফাটল সৃষ্টি করতে অপতৎপর হয়েছে। আরো বিস্তারিত জানতে পাঠকমণ্ডলী তুর্কী 'Faideli Bilgiler' (উপকারী তথ্য) শীর্ষক বইটি দেখুন। বিভিন্ন ধর্মীয় নাম ও পদবীর আড়ালে যিনদিক্ব চক্র ইসলামের বিনাশ সাধনে অন্তর্ঘাতমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছে। যদিও জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তিক সামর্থ্যের বিচারে

তারা একেবারেই নিষ্ফল (মানে মেধাশূন্য), তথাপিও ধর্মের ভাড়াটে বাহিনী হিসেবে তারা খ্যাতি অর্জনের অবস্থায় পৌঁছেছে শুধু প্রচুর অর্থবলের কারণেই।

সমাপ্ত

আমাদের প্রকাশিত
কাজী সাইফুদ্দিন হোসেন অনূদিত বইসমূহ

- **মাযহাব অমান্যকারীদের খণ্ডন**
  ইমাম ইবনে রজব হাম্বলী রহমাতুল্লাহি আলাইহি
- **আহলে হাদিসের মতবাদ খণ্ডন**
  আল্লামা হুসাইন হিলমী ইশীক তুর্কী রহমাতুল্লাহি আলাইহি
- **ওহাবীদের প্রতি নসিহত**
  আল্লামা হুসাইন হিলমী ইশীক তুর্কী রহমাতুল্লাহি আলাইহি
- **মহানবী হাযের ও নাযের**
  ড. জি.এফ হাদ্দাস দামেশকী
- **ইমাম আহমদ রেযার উপর আরোপিত মিথ্যা অপবাদের দাঁতভাঙ্গা জবাব**
  প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মাসউদ আহমদ
- **তাসাউফসমগ্র**
  কাজী সাইফুদ্দিন হোসেন
- **ঈদে মিলাদুন্নবী একটি প্রামাণ্য দলিল**
  কাজী সাইফুদ্দিন হোসেন
- **ওহাবীদের প্রতি সংশয়**
  কাজী সাইফুদ্দিন হোসেন
- **আহলে বায়াত ও সাহাবায়ে কিরামের ভক্তিতে মুক্তি**
  আল্লামা হুসাইন হিলমী ইশীক তুর্কী রহমাতুল্লাহি আলাইহি